নটী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪
মে, ১৯৫৭

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

যুবনাশ্বকে

ন দাবায়া জের য়ে চমন্ উন্‌হেঁ
ন দি' গোর্ য়ো কাফন্ উন্‌হেঁ।
কিয়া কিস্‌নে জের দাফন্ উন্‌হেঁ
য়ে ঠিকানা উন্‌কো মজার হ্যায়ঁ ॥

ওদের কপালে জুটল না কুসুমের আস্তরণ।
না মিলল গোর, না এল কোন কাফন্।
কে ওদের কবর দিলে শুধু মৃত্তিকায়?
সেই মাটিই, দেখ, হয়ে উঠেছে এক পবিত্র সমাধি-
ওদের আসল ঠিকানা।

শেষ মোগল—বাহাদুর শাহ্

নটী

একশ' কুড়ি বছর আগেকার কথা। গোয়ালিয়ার শহরের রাজপথে রং-বাহারী মিছিল বেরিয়েছে।

বড় বড় হাতি, সুদৃশ্য আরবী ঘোড়া আর উটের পায়ে পায়ে জলুস এগিয়ে আসছে। ধাবমান জনস্রোতের মাঝখানে থেকে থেকে নকিবের কণ্ঠ চিৎকার করে ফেটে পড়ছে, তফাত যাও তফাত যাও।

রাস্তাঘাট ধুলোয় ধুলোয় সমাচ্ছন্ন, দৃষ্টি ঝাপসা। দোকানের আলোগুলো সেই মিহি মসলিনের আড়ালে চোখে পড়ছে আবছা আবছা, অজস্র চুমকিদার বুটির মতো।

মিছিলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ঝকঝকে পিতলের কলসীতে দুধ আর ঘি নিয়ে চলেছে গুজারী মেয়েরা। চাকভাঙা মধু, মিঠাই আর রাবড়ি ফেরি করছে কাঞ্জীর মেয়ের দল। ফুলওয়ালীরা তারই মধ্যে ডাকছে—কমল! কমল! চম্পা-বেলী-চামেলী কি গুঞ্জা! তরমুজ বিক্রেতা সবুজ তরমুজের গায়ে ছুরি চালিয়ে আধখানা তুলে ধরে চেঁচাচ্ছে,—মাটিতে পয়দা হলেও স্বাদে গন্ধে এ ফল স্বর্গের।

পেয়ারার টুকরি মাথায় মুসলমান বিক্রেতা হেঁকে যাচ্ছে—আমরুদ! আমরুদ! চামড়ার মশককাঁধে ভিস্তিওয়ালা পথ ভিজিয়ে যাচ্ছে জল ছিটিয়ে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়া চৌবাচ্চায় নাক ডুবিয়ে জল খাচ্ছে। ঠাণ্ডা আরামে তার গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠছে। চোখ পাকিয়ে সে-ও একবার আড়চোখে জলুস দেখে হ্রেষাধ্বনিতে তারিফ করে ওঠে। দরদী সহিসের বয়স হলেও মেজাজে আজ সে-ও শরীফ। ঘোড়ার পিঠে চাপড় মেরে বলে, হাঁ বেটা পহ্‌লে পিয়াস পুরাকে পী লে……।

ভীলসা হয়ে, শিপ্‌রী হয়ে, ঢোলপুরের পথে, আগ্রা থেকে দলে দলে মানুষ গোয়ালিয়ারের মিছিলে জমায়েত হচ্ছে।

আজ তানসেনের সম্বাৎসরিক উর্স। তাঁর সমাধি-প্রাঙ্গণে বিরাট জলসা হবে। গায়ক গায়িকারা ঊষার প্রথম প্রহরে সঙ্গীতগুরুর সমাধিতে এসে শ্রদ্ধা জানাবেন। আশীর্বাদ লাভে সার্থক হবে ভক্তজন।

হাতির পিঠে হাওদা চড়িয়ে আসছেন রাজরাজড়ার সভাগায়করা। তাঞ্জাম, পালকি ও মেণায় আসছেন কাশী, লক্ষ্ণৌ, ফিরোজপুর, ঢোলপুর, রামনগর ও আগ্রার সুন্দরী শীষমহলওয়ালীরা। কেউ গানের জন্য বিখ্যাত, কারো কালো চোখের বাঁকা চাহনি আর নৃত্যপরা ঘুঙুর-বাঁধা পায়ের তালে কোন নবাব কয়েদ হয়ে আছেন। কেউ বা শুধু রূপসী বলেই খ্যাত, তাঁর হাতের ঢালা সরাব না পেলে কাশীর বড় বড় ঘরানার ছেলেদের সন্ধ্যেটাই মিথ্যে হয়ে যায়। পাঁচিল-ঘেরা মস্ত আঙিনায় মিঞা তানসেন ও গুরু মহম্মদ ঘৌসের সমাধির এক পাশে এসে বসছেন তাঁরা। সন্ধ্যার আলোয় ঝলমল করছে তানসেনের মক্‌বরা।

মাটিতে মস্ত দুটো মশাল পুঁতে সামনে দাঁড়িয়ে খবরদারি করছেন সিন্ধিয়া দফ্‌তরের কোন কর্মচারী। উর্স-এ এসে সকলে যাতে গহনাগাঁটি টাকাপত্র সাবধানে রাখেন সেজন্য তারস্বরে মিনতি জানিয়ে চলেছেন।

লাল রেশমের টোপ লাগানো বড় বড় তাঁবু পড়েছে এক পাশে। তাঁবু পড়েছে পাঁচিলের বাইরেও। সেখানে দাসদাসীরা এসে ছুটোছুটি করে গরমজল ও গরমদুধ যোগাড় করছে মনিবদের পথশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে।

মনিব মনিবে দেখা হলে ঘন-ঘন 'রহিম রহিম! রাম রহিম! রাম রাম!' শোনা যাচ্ছে। এক মনিব কানের হীরেতে ঝিলিক দিয়ে অন্য জনকে শুধোচ্ছেন,—খাঁ সাহেব এবার রাগহিন্দোল নিয়ে ফয়সালাটা হয়ে যাবে না কি? সে মনিবও অন্যমনে গলার সাচ্চা মুক্তোর মালাটা 'তস্‌বী'র মতো ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, কেন নয় মিশিরজী! তবে আজই হায়দরাবাদে চলে যেতে হচ্ছে কিনা রাণা সাহেবের সঙ্গে!

দু'জনে দু'জনকে টক্কর দিচ্ছেন আর শিকারীর মতো গোঁফের আড়ে আড়ে হাসছেন।

কোন তাঁবুতে মান করে বসেছেন কোন অভিমানিনী। বিব্রত শেঠ করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মান দুস্তর—গত বছর আর এ বছর একই হীরের গহনা পরে তিনি গাইতে পারবেন না—কাশীর কমল যখন বছর বছর নতুন গহনা পরে আসছে।

শেঠ সাহেব মিনতি করে বলছেন—দেবী যদি প্রসন্ন হন, তবে তিনি নিবেদন করতে পারেন যে, বিজাপুরের শ্রেষ্ঠ মণিকার অম্মলচাঁদ, এবার আসল হীরে-পান্নার এক প্রস্ত গহনা নিয়ে এসেছে—শুধু কেনবার অপেক্ষা।

কোন কোন তাঁবুতে ধূপের ধোঁয়া উঠছে মৃদু মৃদু। বিলম্বিত বেণী, শুভ্র স্বচ্ছ থান পরিহিতা মাল্‌কিন বীণা কোলে বসে মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিচ্ছেন, আর—

মুরলিয়া নাহি বোল শ্যাম নাম—

এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করছে রাগিণীপটমঞ্জরী। মনে হচ্ছে সমস্ত রজনী সাধনা করলে হয়তো রাগিণী রূপ পরিগ্রহ করবেন সাধিকার ধ্যানে—

কান্তবিরহে শীর্ণা, উজ্জ্বল কাঞ্চনবর্ণা, প্রিয়বিরহে অধীরা পটমঞ্জরী হয়তো আশীর্বাদ করবেন তাঁকে।

আবার কোন তাঁবু থেকে টুকরো টুকরো গানের বোলি ছড়িয়ে পড়ছে ফুলঝুরির মতো। গায়কের রেশমের জামা ঘামে ভিজে গিয়েছে, মুখে হাসি, আঙুলের আংটি থেকে আলো ঝিলিক দিচ্ছে, মুক্তোর মালা ওঠানামা করছে—সারেঙ্গী ও তবলা সঙ্গতকার মুগ্ধ হয়ে তারিফ দিচ্ছেন থেকে থেকে। কুশলী গায়ক, সুর ও কথাকে অবহেলে তালে তালে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন কখনো, আবার নতুন কৌশলে তাকে ধরছেন।

চন্দেরী শাড়ি, হীরামোতি, গালিচা, চন্দনকাঠের আসবাব—এই সব নিয়ে আনাগোনা করছে বানিয়ারা বড় বড় তাঁবুর সামনে, গত বছর প্রসন্ন ছিলেন বাঈজীসাহেবা, কয় হাজার টাকার বিক্রি হয়েছিল। এবার যদি একবার নজর করেন তবে কিছু আসল জিনিস দেখাতে পারে তারা।

এই জমজমাট ছেড়ে ওদিকেও কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। তার অধিবাসিনীদের বেশ দীন হীন, চেহারা মলিন, সুখস্মৃতি যা

সবই অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তাদের কাছে একই রকম আঁধার।

কাশী, ফিরোজপুর, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রাতে একদা তাদের নাম ছিল। শেঠ ও নবাব বাড়িতে তারা বাঁধা ছিল। নবীন যৌবন মালিকের টাকার বিনিময়ে তারা মুজরো করত শীষ ঘরে বসে, নাচত, গাইত, সরাব ঢালত কাঁচের পেয়ালায় আর মিঠে মিঠে কাজলাদিঠি ছুঁড়ে দিতো। যৌবন ফুরিয়ে গেলে, বা মালিকের মর্জি বদলালে তাদের দিন ফুরিয়ে যেতো। তখন ভাঙা নৌকোর মতো, ঘাট খুঁজে খুঁজে ফিরত তারা। এই ছিল তাদের নসিব। যে নসিব নাকি দুনিয়ার মালিকও বদলাতে পারেন না।

বছরে বছরে তারাও তানসেনের উর্স-এ আসে। সম্রাটের সভার গায়ক মিঞা তানসেন, তাঁর নামেই যাদু আছে। গান ছিল তাঁর প্রাণ, আর প্রেম ছিল বিলাস, সারাজীবনে রাগরাগিণীরা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তাঁর ধ্যানে। ধ্যানভঙ্গে চকিতে সরে গিয়েছে তারা মরীচিকার মতো। ধ্যানের জগতের মায়াময়ীকে বাস্তবে ধরতে পারেননি বলেই হয়তো তানসেনের ব্যক্তিগত প্রেমও ছিল খাপছাড়া, খেয়ালী আর দুর্বার। সঙ্গীতসাধকের গুরু তানসেন, তাঁর সমাধি তীর্থস্থান। সেই তীর্থে বছর বছর এসে মেলে বিগতযৌবনা হতভাগিনীরা। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সসম্ভ্রম প্রণতি জানায়, আর সমাগতদের মনোরঞ্জনের প্রয়াসে এ তাঁবু থেকে সে তাঁবু ফেরে।

এমনি এক তাঁবুর ভেতরে ধুঁয়ো-ওঠা একটা বাতি জ্বলছে। তার মলিন ছায়ায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে রোশান। শীর্ণ বাহু এলিয়ে পড়েছে। তিনজন সঙ্গিনী মৃদুস্বরে ফাতেহা পড়ছে, কোরাণের অমৃতবাণী শোনাচ্ছে মৃত্যুপথ-যাত্রিনীকে। রোশানের পাশে একমুঠো জুঁইফুলের মতো শুয়ে আছে মোতি। রোশানের দুই বছরের মেয়ে। এতখানি চরম দুর্ভাগ্যের ডালা তার মাথায়, তবু সে এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে যে, দেখলে মৃত্যুরও দয়া হবে। বৃদ্ধ হেকিম পাশে বসে আছেন টুল পেতে।

মৃত্যুর কোন ধারণা তখন রোশানের চেতনায় নেই। তার

দুই চোখ জুড়ে এক তরুণ যুবকের সপ্রেম চাহনি—কানে বহুদূর থেকে পরিচিত কণ্ঠে কার আকুতি—

এক নজুর দিখা যাতা তো তেরা কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজারোঁসে গুজারনে বালে—

দিল্লীর নাচওয়ালীদের মধ্যে রোশান ছিল অন্যতমা। তার রক্তে ছিল ভরা পূর্ণিমার সমুদ্রের আকুলতা। প্রেমের আহ্বানে দেওয়ানা হয়ে যৌবনে তার মা ঘর ছেড়েছিল। ফিরোজপুরের নবাবসাহেবের ঘরে তার মুজরো বাঁধা ছিল। অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে সবে উনবিংশ শতকে পড়েছে সে যুগ। তখন রাজারাজড়া নবাব-বাদশাদের রাজত্ব। নাচওয়ালীদের তখন বড় কদর। সে যুগটারই রম্‌রমা অন্যরকম। রাজপথে ঘোড়ার খুরের সঙ্গে টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে জোয়ান রক্ত, তলোয়ারে তলোয়ারে, বর্শায় বর্শায় লড়াই লেগে যায়। গোলাপ-চামেলী-বেলীর গন্ধ-সুবাসিত সন্ধ্যা নামে, কাঁচের ঝাড়ে আলো ঝল্‌মল করে—মখ্‌মলের তাকিয়া হেলান দিয়ে বিশ্রাম করে প্রান্তযৌবন সামন্ততন্ত্র, আর ঘুঙুরের রুণুঝুণুর সঙ্গে রঙিন পেশোয়াজে দোল খেলিয়ে মিঠে গলায় নিক্কণ তোলে নাচওয়ালী—

তিরছি নজরেসে ম্যয় কয়েদী বনী হুঁ—

এই আবহাওয়া থেকে প্রাণরস আহরণ করে লতার মতো মঞ্জরিত হয়ে উঠল রোশান। যৌবনভারে ঈষৎ আনমিত হলো দেহ, কালো চোখে অতল রহস্য নামল, প্রবালের মতো ওষ্ঠাধরের হাসিতে মিঠে সুর লাগল, রোশানের মা-কে সবাই বললো, এবার মেয়ের দৌলতে মা রাণী হয়ে যাবে।

কিন্তু অদৃশ্যে দেবতার হাতে ভাগ্যের পাশায় নতুন দান পড়ে। রোশানের জীবনে এল প্রেম।

সাতপুরুষের নাচওয়ালী, হৃদয় নিয়ে বেসাতি করা পেশা, কিন্তু রক্তে তার ছিল ভালোবেসে দেওয়ানা হবার আকুলতা। প্রেম এল দুর্বার হয়ে—সমুদ্রের মতো ভাসিয়ে নিলো তাকে—অসহ বেদনা, অপূর্ব আনন্দে রক্ত-গোলাপের মতো ফুটে উঠল রোশান একজনের মুখ,চেয়ে। কিন্তু তার প্রেমিকের হৃদয় ছিল না।

ফিরোজপুরের তরুণ নবাব সামসুদ্দীন, সুপুরুষ, দুঃসাহসী, বেপরোয়া। রোশানের সাথে তার প্রথম দেখা ভরা জলসায়। মা আর মেয়ে নাচের শেষে মোহর কুড়োতে ব্যস্ত। সেই সময়ে কেমন করে যেন রোশানের নজর পড়েছিল তরুণ নবাবজাদার ওপরে, মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল রোশান।

দুরন্ত যৌবন। মাঝরাতে উটের গাড়ির পাশ থেকে রোশানকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নবাব। বলেছিলেন,—তোমার প্রেমের কারাগারে আমি বন্দী—

এক নজর দিখা যাতা তো তেরা কেয়া যাতা
য়ো গরীবোঁকে মজারোঁসে গুজারনে বালে—

অস্ফুট চাঁদের আলোয় প্রেমাস্পদের আবেগ-টলমল চোখে যুগযুগান্তের কোন লয়লার স্বপ্নের চরিতার্থতা দেখেছিল রোশান। মনে হয়েছিল মরুতে মরুতে বালির উপরে এই মজনুকেই ডেকে ফিরেছে তার পিয়াসী মন। তাই নিশ্চিন্ত নির্ভরে ভৃঙ্গারের মতো মুখ তুলে ধরেছিল সে—আর তাকে একচুমুকে পান করেছিলেন সামসুদ্দীন।

বুড়ী মা তাকে বারণ করেছিল, বলেছিল,—বেটি ভালোবেসেই আমাদের জাত মরে, ওরা শুধু ভোমরার মতো উড়ে চলে যায় অন্য বাগিচায়, অন্য ফুলে। কোন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধলি না কেন বেটি, কেন ভুল করলি ?

রোশান মায়ের কথা মানেনি। নর্তকীর প্রেমে আকুল আত্মসমর্পণের বাসনা, সব বিলিয়ে না দিলে তার তৃপ্তি নেই। রোশানের মনে হতো চাঁদ অফুরান, গুলবাগিচার বুলবুলের গানও অফুরান—

কিন্তু একদিন রজনী প্রভাত হলো। সহসা সামসুদ্দীন ত্যাগ করলেন শহর। একটি কথা বলবার ছিল রোশানের—একটি কথা বলতে সে ছুটে গেল। তার আগের দিনই চলে গিয়েছেন নবাব। আগ্রায় নাকি এসেছে কাশ্মীরের গুল্—উনিশ বছরের উর্বশী।

এই জীবন এক পানপাত্র, নর্তকী তাতে সিরাজ। পিপাসিত এসে তাকে গ্রহণ করে, সার্থক হয় তার যৌবন। তৃষ্ণা মিটে গেলে, যদি দাম ফেলে দিয়ে চলে যায় তৃপ্তজন, তবে নতুন করে

কাজল পর, বেণীতে মোতির ফুল গাঁথ, হীরের ঝিলিক ঠিক্‌রে উঠুক্‌ কঙ্কণে, রেশমী গাড়ারার প্রান্তে জরিতে ঢেউ খেলে যাক। এই জীবনদর্শন মানতে চাইল না রোশানের মন। যৌবনের উন্মেষে মন আর প্রাণ নিঃশেষ করে নিয়েছে একজন, কখনো আকুল আবেগে মনে হয়েছে তারাই দু'জন লয়লা আর মজনু। মরুভূমিতে দুরন্ত যাযাবর জীবনের পটভূমিকায় যে প্রেম সার্থক হলো না, যার বেদনা বুকে বয়ে কবি বার বার ছন্দে ছন্দে মৃত্যুহীন গান গাইল, সে প্রেম তাদেরই। সে-ই সেদিনের লয়লা আর সামসুদ্দীন তার প্রেমে পাগল হতভাগ্য মজনু। কখনো গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। চোখের জলে উপাধান সিক্ত করে ভেবেছে তারাই দু'জন শিরী ফরহাদ্‌। তার চোখের জল পলকে মুছে নিয়ে প্রেমিক বলেছে,—তোমার গালের একটি তিলের জন্যে—। পৃথিবীর প্রথম অনুভূতি প্রেম। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাস। শুধু কি বিশ্বাস? প্রিয়জনকে সমস্ত গুণ আরোপ করে, তাকে সমস্ত ভালোবাসা দিয়েও তৃপ্তি হয় না—এ-ও প্রেমেরই ধর্ম।

তাই রোশান অনুযোগ করল না। মায়ের সহস্র অভিযোগ মাথায় নিয়ে, সে তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ালো। দেখা করতে গিয়ে লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরল। শিকার থেকে ফিরবার পথে, অপেক্ষমান রোশানকে দেখে ভ্রূকুটি করলেন সামসুদ্দীন। বললেন,—কে একে ঢুকতে দিয়েছে?

সেই রূঢ়কণ্ঠ রোশানের মর্মে গিয়ে বিঁধল। মুহূর্তে স্থানত্যাগ করল সে। ছি ছি সে কি ভিক্ষা করতে গিয়েছিল? দয়া চেয়েছিল আর দীন ও মলিন বেশে তাকে দেখেই কি লজ্জা পেলেন নবাব? ঘরে ফিরে এসে সে চিঠি লিখল। চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়ে সেই দিনই ফিরোজপুর ছেড়ে চলে গেল। নবাব খুলে দেখলেন—তাতে লেখা আছে,—তোমার প্রেম, হে প্রিয়, একদিন ভূষণ বলে মাথায় পরেছিলাম, আজ সেই প্রেমকে তুমি ফেলে দিয়েছ, কিন্তু আমি তো ফেলতে পারি না, তাই তাকে তিলক করে পরে ভিখারিণী হয়েছি—তাতে কি তোমার লজ্জা?

সেই রাতের স্মৃতি রোশানের চোখে বুঝি আবার ভেসে উঠল। একবার মনে হয়েছিল ঝাঁপিয়ে পড়বে যমুনার জলে। বর্ষায় যমুনা

উত্তাল হয়ে কলকণ্ঠে হাত তুলে লক্ষ ঢেউয়ে নাচছে। সেই ঢেউয়ে বুঝি কার হাতছানি দেখেছিল রোশান। কিন্তু সে তো একা নয়, হৃদয়মন্থন করে চলে গিয়েছে রূঢ় আঘাত দিয়ে এক বে-দরদী, আর সেই বেদনার অতলে তখনি একটি মধুর সম্ভাবনা অঙ্কুর হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিন সেই অঙ্কুরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। তারই মুখ চেয়ে আত্মসংবরণ করেছিল রোশান। বড় সুন্দর পরিবেশ। বড় মধুর প্রলোভন। সামনে উত্তাল তরঙ্গময়ী কালো যমুনা। তারার অস্পষ্ট আলোতে পাহাড় ও প্রান্তরের রেখাগুলি আরো কালো—দূরে জনকোলাহলমুখর নগরী, সেই রাতে বিশ্বপ্রকৃতির কোলের কাছে একা দাঁড়িয়ে ধীরে মন শান্ত হয়েছিল রোশানের। সঙ্গতি পেয়েছিল খুঁজে, শান্তি পেয়েছিল।

তার পরের ইতিহাস পথেঘাটে ছড়ান। কত শহরই যে ঘুরলো রোশান—পথে পথে কত অনুগ্রহই যে ভিক্ষা করে বাঁচাল নিজেকে—শেষ পর্যন্ত এসে ভিড়ল কাশীতে। সেখানে একদিন এক ফকিরের কুটিরে জন্ম হলো মোতির। নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ সেই শিশুকে দেখে রোশান একবার হাসল, একবার কাঁদল। বুকে তুলে নিয়ে বললো,—মেরি মোতি—মেরি লালী—

বিচার যে কোথায় হয়, আর কে যে বিচার করে, সে বড় আজব কথা। সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে কোন রূপকথাই আশ্চর্য নয়! যৌবনের উদ্ধত গর্বে কত রোশানের প্রেম পদদলিত করেছিলেন সামসুদ্দীন তার হিসেব নেই। ভাইকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে গিয়েই বিবাদ বাধল—আর শৈশবের শুভানুধ্যায়ী ফ্রেজার সাহেবকে খুন করবার জন্য ক্ষেপে উঠলেন সামসুদ্দীন। তরুণ নবাবকে ফ্রেজার বিশ্বাস করতেন ও ভালোবাসতেন। এক অন্ধকার রাতে সামসুদ্দীনের নিযুক্ত ঘাতক তাকে হত্যা করল। ফলে বন্দী হলেন সামসুদ্দীন। বিচারে প্রাণদণ্ড হলো তাঁর।

শহরের খোলা জায়গায় ফাঁসিমঞ্চে উঠতে উঠতে গতজীবনের কথা সামসুদ্দীন একবারও ভেবেছিলেন কিনা কে জানে! তবে কতিপয় নর্তকী তাঁর মৃত্যুতে কেঁদেছিল, আর ফাতেহা পড়েছিল

তাদেরই অনুরোধে মৌলভী। সে কথা শুনে রোশান মর্মাহত হয়েছিল। অশ্রু মোচন করেছিল গোপনে। সেই সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, আয়তনেত্র, প্রশস্ত ললাট—কোথাও কি এ হীন পরিণতির কথা লেখা ছিল ?

কোন নারী মাতা হয়ে সার্থকতা পায়—কারো সার্থকতা প্রেমে। মৃত্যু সামনে নিয়েও রোশানের হত চেতনায় তার জীবনের একমাত্র সুখস্মৃতিই উৎসবের সজ্জায় সেজে উঠলো।

সহসা বড় মধুর অনুভূতি হলো রোশানের, বড় সুন্দর, শান্ত আর গভীর কোন ভালোবাসা যেন তাকে ঘিরে ধরেছে দুই হাতে।

এ আর এক প্রেম। তার প্রেমিকের মতো নিষ্ঠুর চিত্ত নয় এই অতিথি। দেহের সমস্ত বন্ধন অস্বীকার করে সে রোশানকে টেনে নিলো বলিষ্ঠ বাহুতে—, সেই শেষ আত্মসমর্পণের মুহূর্তে সমস্ত চৈতন্য হারিয়ে গেল রোশানের। চোখের কোণে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু।

মোতি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সঙ্গিনীরা যখন রোশানের মুখখানা ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন মোতির ঘুম ভাঙল।

তাকে কোলে তুলে নিলো মন্নু। রোশানের মায়ের আমলের চেনা সারেঙ্গীওয়ালা। বললো,—বেটি আজ থেকে তুমি আমার—, তারপর বললো,—ভাবিস না রোশান, সব ঠিক আছে।

উর্স-এর জন্যে অপেক্ষা না করে পরদিন ভোরেই সে মোতিকে কোলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

পথে পথে জীবন শুরু হয়ে গেল মোতির।

দু ই

'বহিছ নির্মল সলিলে শত তটশালিনী যমুনে'—

শত তটশালিনী যমুনার উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখে কবে বৃন্দাবনের কন্যাদের মন উতলা হতো সে সব পুরনো কথা। সাল ১৮৪৩। পাহাড়ে বর্ষা নামলে যমুনার জল এখনও উথলে ওঠে সত্যি, কিন্তু

সে জলে চাষীর মাঠ ভেজে না। বালির বুকে ক্ষীণ ধারায় চাষীর স্বপ্ন মরে যায় স্রোত না পেয়ে, গ্রীষ্মে ক্ষীণস্রোতা যমুনা আর বর্ষায় তাতে ঢল নামে।

বৃন্দাবনের প্রেমকে গল্পে গানে গাথায় নির্বাসন দিয়ে সম্রাটের প্রেমের মর্মরস্বাক্ষর তীরে বয়ে ধন্য হয়েছে যমুনা। হীরা মুক্তা মাণিক্যের ইন্দ্রজালচ্ছটার দিনও মুখ লুকিয়েছে। আজ যমুনার দুই তীরে গ্রাম আর জনপদ। অধিবাসীরা প্রায়শঃ মুসলমান। সিপাহীগিরি তাদের মনের মতন পেশা। কিন্তু তরবারি হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে রাজারাজড়াকে সেলাম জানাবার ভাগ্য যাদের নেই তারা আজও চাষ করে। জোয়ান হাতে চাষ করে পরের গোলায় ফসল ভরে, আর ঘরে বসে পূর্বপুরুষের জাঁকজমকের গল্প করে ভাগ্যের ছেঁড়া কাঁথাখানার গায়ে রঙ-বেরঙের তালি দেয়। লেখাপড়ার কথা বললে হা হা করে হাসে। বলে—

ভুঁখে সে কহা
দো ঔর দো কেয়া ?
কহা চার রোটিয়াঁ।

এইসব মানুষের বসতিধন্য বিঠৌলি গ্রাম এলাহাবাদের একান্ত সন্নিকটে। গ্রামের উঠতি মানুষ হচ্ছে লালা আর চৌধুরীরা। তাদের বাড়ি সু-উচ্চ মাটির প্রাচীরে ঘেরা, কোঠাঘর কেল্লার মতন দুর্ভেদ্য। আলোবাতাসবিহীন, শাদা রঙ-করা কোঠাঘরে পাকা ছাদ। দাসদাসী ছাগল-মহিষ নিয়ে সে এক সদাগুঞ্জরিত মৌচাক। পালায়, পরবে, দশেরা ও বিয়েতে লালারা জলুস লাগিয়ে হাতি বের করে। ঘোড়ার পিঠে বসে গোলাপী পাগড়ি-বাঁধা সেরস্তী পেতলের পরাত থেকে বিতরণ করে গাঁয়ের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে গুলাবী রেউড়ি, তিলছড়ি আর সোহন হালুয়া। তাদের বাড়ির মানুষ মরলে পাথরের স্তম্ভ ওঠে শ্মশানভূমিতে। কোম্পানীর সাহেবরা কালে-ভদ্রে এলে লালাদের বাড়ি থেকে তাঁবু যায়। খানাপিনার খরচও বহন করে তারাই।

বছরে একবার করে তীর্থে তীর্থে যায় লালাদের বাড়ির লোকেরা। মথুরা, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন,—সর্বত্র মন্দিরে মন্দিরে লালাদের অনেক দান আছে। দান বললে সন্ত্রস্ত হয়ে জিভ কাটে

লালার মা—ছি ছি, মানুষ হয়ে সে কি দেবতাকে দান করতে পারে? এমন কি ভাগ্য তার?

দান সে করে না।, শুধু বিশেষ বিশেষ দিনে বুকে হেঁটে দণ্ডী কেটে মন্দিরে গিয়ে রূপোর তুলসীগাছ আর সোনার শঙ্খ মানত করে আসে।

মানত পুরো হবার পর দিন আগে আগে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দেয়। দেবতার আশীর্বাদ চায় তার পরিবারের ওপর, 'ভাগ ভালা হোয়'।

সে কামনা সার্থক হয়েছে বলা চলে। গাঁয়ের শতকরা নব্বুইজনের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে লালাদের মহাজনী খাতায়। তেজারতী সুদের কারবারের হিসাব সব ছোট ছোট নাগরী হরফে লিখে রেখেছে লালা। খাতাটা বেঁধে রেখেছে তেলচিটে দড়িতে। বকেয়া সুদ মেটাতে জীবন কেটে যায় কিষাণের, ঘরে ঘরে অনটন দেখা দেয়, এদিকে লালাদের গোলা উছলে পড়ে যায়,—মহিষ দুধ দেয় অন্য ঘরের দেড়গুণ, সৌভাগ্যের পসরা সর্বদা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে থাকে।

হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে লালাদের প্রতিপত্তিই বেশি। তাদের ঘর ছেড়ে দু'কদম এগিয়ে গেলে শুরু হবে মৌলভী সাহেবের মস্ত কোঠাবাড়ি। বড় আমীর মানুষ মৌলভী, টাটকা মেহেদি পাতার রঙের তাঁর দাড়ি আর হাতের আঙুল জাফরান। বড় মিঠে গলা মৌলভীর, কথায় কথায় ফারসী তত্ত্বকথা টেনে এনে শ্রোতাকে সমঝে দেবার কায়দা একেবারে পাকা শিকারীর মতন রপ্ত তাঁর।

দিনকাল পালটে যাচ্ছে, একথা প্রায়ই তিনি বলে থাকেন। সাল ১৮৪৩। চারপাশে ইংরেজদের ছাউনি। সুদূর কলকাতায় নাকি তাজ্জব সব ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। তাঁর শৈশবে এমনধারা ছিল না। তখন লোকে মৌলভীর নামে তিনবার সেলাম করত। ফসল, মহিষ, সোনারূপো, কাপড়চোপড় সবই নিত্য ভেট আসত মৌলভীর ঘরে। এখন আর সেদিন নেই।

মৌলভী সাহেবের মক্তবে ফারসী পড়ে কতজন লায়েক হয়ে গেল। প্রথমে ছেলেকে আনবার আগে বাপ এসে লক্ষ সেলাম দিলো। ,পেছনে ছোকরা বয়ে এনে নামাল বড় একটা ডালা।

ঘরে পালা মুরগী-মুরগা, মৌলভীর বিবির জন্যে আসলামা কাপড়, তামা-পিতলের বাসন। ছোট চোখ করে দেখে দেখে মৌলভী অল্প অল্প হাসেন। তারপরে ছেলে আসে পড়তে। চার বছর ধরে মক্তবে ভারে ভারে কত জিনিসই যে আসে! বিকানীরের মিছরি আর লক্ষ্ণৌ-এর চিকনের থান, দিল্লীর নাগরা আর আগ্রার আতর, দেহাতের ঘি, থালা-ভরা সেউ, সীমাই আর ফালুদার নানান উপকরণ।

শেখ মসল হার্দিনসাদীর পন্দ্‌নামা, গুলেস্তাঁ, বুস্তাঁ, জোমে খাঁ'র জামেজল কওয়াসিন, মুন্সী জানমিরের খত্‌, এইসব তুলে তুলে পড়ে ছেলেরা। মাটিতে আঁক কেটে শেখে আলেফ্‌, বে, তে। ফারসী লিখতে শেখে মুক্তোর মতন গোটা গোটা অক্ষরে।

তারপর লায়েক ছেলেকে শহরে নিয়ে যায় বাবা। ভেট লাগায় চেনাপরিচিত এলেমদার সব লোক খুঁজে খুঁজে। সরকারী দফতরে হোক, বা কোনো রাজা আমীরের কাছারিতে হোক, একবার ঢোকাতে পারলে হয়। তখন শুধু আর্জি লেখো, হিসাব লেখো খাতা রাখো। খিড়কি দিয়ে টাকা আসবে সিন্দুকে। জমি খরিদ হবে গাঁয়ে। বিবি পরবে হীরের নথ, ঝাপটা, পায়ে পরবে জরির চটি, বুড়ো বাপ মা হজ করবে বছর বছর।

বড়মানুষ হবার নেশা যাদের তাদেরই এই সব সাজে। এদিক-ওদিকে অনেক মানুষ আছে, যারা দিনমান ক্ষেতে চাষ করছে রোদে পুড়ে, জলে ভিজে। তাদের বিবিদের পর্দা থাকা বড় মুস্কিল। শিকারের মাংস শুকনো করে রেঁধে চাপাটি আর ভাজির সঙ্গে সানকিতে সাজিয়ে মাঠে পাঠায় তারা পুরুষের সঙ্গে। ফসল ঝাড়তে বাছতে, গম ধুয়ে শুকোতে, গম পিষে আটা বানাতে, জ্বালানি কুড়িয়ে উনুন ধরাতে, মুরগী তুলে ঘরে বন্ধ করতে তাদের দিনমান কেটে যায়। সন্ধ্যাবেলা বসে বাতি জ্বেলে রঙিন সুতোর বিনুনি গাঁথে কেশসজ্জার জন্যে। পরবের দিনে রূপোর গয়না ঘষে মেজে পরে তারা, মেহেদি পাতার অঙ্গরাগে রাঙায় হাত, পা, নখ।

তাদের পুরুষদের দীর্ঘ দেহ, চওড়া বুক, গৌরবর্ণ প্রশস্ত কপাল। বাদশাহী আমলটা হচ্ছে তাদের পূর্বপুরুষ। বাদশাদের হয়ে

এখানে সেখানে বেতনভোগী সিপাহী হয়ে লড়ে বেড়াবার পর থেকে ক্রমে স্থানস্থিতি হলো। তলোয়ার খুলে রেখে হাত দু'খানা লাঙল তুলে নিলো। সবই রুজির জন্যে। এ কাজেও হাতে কড়া পড়ল একদা লড়ে লড়ে যেমন পড়েছিল।

এখন চওড়া পাথর-বাঁধাই ইঁদারা থেকে ঘোড়া আর মহিষের সাহায্যে জল তুলে ক্ষেতে ক্ষেতে দেবার কাজ। ছেলের চেয়েও যত্ন করে গমের চারাকে বড় করে তোলার দায়িত্ব। ফসল পাকলে সোনালি-সবুজ গমের খবর নিয়ে বাতাস চলে যায় এদিক ওদিক। তখন হরিণ আর শূয়োর বেরিয়ে আসে আঁধারে আঁধারে। ক্ষেতে মাচার ওপর ঘর বেঁধে রাত কাটায় পুরুষেরা। নজর ঠিক করে নিশানা ধরে নিয়ে অব্যর্থ সন্ধানে ছুঁড়ে দেয় বর্শা আর ভাল্লা। তীব্র আর্তনাদে জানোয়ার পিছু হটে।

কখনো কখনো আঁধারের মধ্যেও আঁধার দিয়ে গড়াদেহ হাতির পাল আসে। ভাবারের জঙ্গল ছাড়িয়ে কুমায়ুনের পাদদেশ দিয়ে জঙ্গল ধরে ধরে তারা নেমে এসেছে। পাকা ফসলে দারুণ লোভ।

এই দুনিয়াতে চোখ মেলবার সময় থেকে খোদার মেপে দেওয়া সাড়ে তিন হাত মাটি নেওয়া পর্যন্ত কতবারই যে লড়তে হয় তাদের! একেবারে শিশুকালের কথাটাই জানা নেই। তারপর মরদ হলে তিনবার লড়তে হবেই হবে। ছেলেবয়সে বাপের সঙ্গে, যৌবনে স্ত্রীর সঙ্গে আর পরে ছেলের সঙ্গে। তা ছাড়াও সারাজীবনে উঠতি পড়তি যে কত তার দিশা কে করে! দুনিয়ার সঙ্গে নিত্য মোকাবিলা করতে গিয়ে কত জখম বুকে করে নিয়ে ঘরে ফেরে পুরুষ কে তার মর্ম বুঝবে? মরদের মতো মরদ হয়ে বাঁচতে হলে দুশমন দুটো একটা আসবেই জীবনে।

আর মোকাবিলাই যদি না হলো তবে জীবনের রঙটা কোথায়! সে কেমন তলোয়ার যাতে চোট লাগে না! সে কেমন জীবন, সংগ্রামে, প্রেমে, জয়ে ও পরাজয়ে যার শতরঞ্চের এক একটা ঘরে এক একটা নতুন নতুন রঙ লাগেনি?

বিশেষ করে এরকম সময়, এমনি ধারা দিন, যখন হিন্দুস্থানের

মানুষের অজান্তেই দেশের ভাগ্যলিপিখানা কিনে নিয়েছে ইংরেজ। এই তো বাঁচবার সময়।

এ এক আশ্চর্য দিন, এ এক অদ্ভুত সময়। সাধারণ মানুষের ভূমিকা ক্রমেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। এসময়টা দেখবার, জানবার আর বাঁচবার। আজকে যারা গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে পাঁকে পা মজিয়ে জাহাজ বোঝাই করে সম্পদ বিলাতে পাঠাচ্ছে, তাদেরও প্রাণের দাম একটা হবেই হবে। সেই সময়ও আসছে। প্রস্তুতি চলেছে দেশব্যাপী রঙ্গমঞ্চে। যতদিন না সময় হচ্ছে ততদিন অবধি লাঙল চালাবে কিষাণ, সাহেবের খিদমতগারি করবে হিন্দুস্থানের জোয়ান।

তি ন

গ্রামের একান্তে আনোয়ারের ঘর। এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে, আনোয়ারকে চেনে না। দেমাকী মানুষ আনোয়ার আর তার ছেলে খুদাবক্স। ছেলেটার বয়স সবে চৌদ্দ হবে কিন্তু চলে মাথা উঁচু করে। গান গায় বেপরোয়া গলায় আর মৌলভীর শাসনকে তিন তুড়ি দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার বাপের এত তেজ এল কি করে ? ভেবে ভেবে অবাক মানে গোকুল দাস। জমি বলতেই বা কতটুকু ! ক্ষেতীর চেহারাই বা কি !

সে কথা বললে দাড়ি চুমরে হা হা করে হাসে আনোয়ার। হাতিকে কুঁদতে শেখাল কে ? শের লড়ে কোন জোরে ? দুনিয়ার মাটিতে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই তেজ তারা নিয়ে জন্মেছে। আনোয়ারের তেজও নাকি ভেতরকার জিনিস। তার বাপের গল্প আজও ঘরে ঘরে চালু।

আনোয়ারের বাপ ইউসুফ ছিল সে সময়কার খেলিয়ে। দীর্ঘ পেশল দেহ। সুঠাম শরীর আর অমিত তেজ দিয়েছিল ভগবান। কিন্তু ধনদৌলত ছাপ্পর ফুঁড়ে দেয়নি। ধনদৌলত সে দিন রাজারাজড়ার ঘরে থাকত। তাই খেলা দেখাত ইউসুফ।

খেলা দেখাতে দেখাতে নিজেই কখন পুতুল হয়ে গেল ভাগ্যের হাতে, আর নতুন খেলা শুরু হলো তার জীবনে। সে বড় আজব কাহিনী, রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত।

আনোয়ার শুনেছে তার বাবা ইউসুফ নাকি বাঘের সঙ্গে লড়ত রাজপুরের রাজবাড়িতে। চব্বিশ বছরের জোয়ান পাঠানের সেই দর্পিত ক্রীড়া দেখে মন টলেছিল রাজাসাহেবের চতুর্দশতমা পত্নী জানকীর।

জানকী যখন লুকিয়ে দেখা করেছিল তখন ইউসুফ বলেছিল, চলো পালাই। ভরসা আছে তো?

নিশ্চয় ভরসা ছিল। ভাঙা মন্দিরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জানকী জোরগলায় বলেছিল ইউসুফকে, হ্যাঁ তার ভরসা আছে।

উনিশ বছরের রাজপুতানী আর চব্বিশ বছরের পাঠান। মরুভূমির পটভূমিকায় প্রেম, জিঘাংসা, হত্যা ও রোমাঞ্চের দুরন্ত উন্মাদনা তাদের রক্তে রক্তে। সেই ঐতিহ্য তাদের বেপরোয়া করল। স্থান, কাল, পরিবেশের কথা ভুলে গেল তারা। মনে হলো দুনিয়া তাদের পায়ের নিচে। ওপরে আকাশ, নিচে জমি, আর মানুষ শুধু তারাই দু'জন।

রক্তে রক্তে দোলা লেগে ঢেউ উঠল উত্তাল হয়ে। সেই ঢেউয়ে নৌকা ভাসিয়ে বে-দিশা ইউসুফ সুন্দরী জানকীর মুখ চেয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসল। প্রেম এল বন্যার মতন। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, বীরাওন আর মুক্তকেশ—বন্দরে বন্দরে সেই বন্যার ধাক্কায় ভেসে বেড়ালো দু'জনে। কিন্তু সেই মুক্ত প্রেমে অভিসম্পাত এল দৈবের রূপ ধরে। দুরন্ত গরমে সেবার যখন সর্বত্র হাহাকার উঠেছে, ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে, কুয়ো শুকিয়ে উঠছে, হিমালয়ের বুকে বরফ গলে তখন ঢল নামল নদীতে। রাতারাতি বন্যা এল দুর্বার হয়ে। ভেসে গেল বীরাওন আর সৌগড়—লক্ষ্ণৌ-এর উত্তরের সমৃদ্ধ জনপদ, আর সেই বন্যায় ভেসে গেল ইউসুফদের ঘর।

উত্তাল জলের মুখে তারা দু'জনেই ভেসে গিয়েছিল। ইউসুফকে বাঁচাতে গিয়ে গোমতীর স্রোতে কোথায় তলিয়ে গেল জানকী, তার একুশ বছরের যৌবন আর হাজারটা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। অচৈতন্য ইউসুফকে জল থেকে তুলেছিল

নবাবের জঙ্গলের ইজারাদার আর তার মেয়ে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়েছিল। সে ঋণ শোধ করবার নয়। তাই ইউসুফ পরে বিয়ে করেছিল তাকে। ঘর বেঁধেছিল ইউসুফ, ক্ষেতী ধরেছিল অনভ্যস্ত হাতে। মাঝরাতে ক্ষেতের ওপর মাচা বেঁধে শূয়োর তাড়াতে বসে তীব্র বাতাসে ভেড়ার কম্বল জড়িয়ে কাঁপত ইউসুফ, আর মনে মনে নাড়াচাড়া দিতো জানকীর কথা। ঘর বেঁধে সে কী অন্যায় করেছে? জানকী কি তাকে দোষ দিচ্ছে? ঘর বাঁধতে জানকীও চেয়েছিল। রাজার রাণী হয়েও ইউসুফের সঙ্গে জাঁতার শব্দে মুখরিত, শিশুর কলকণ্ঠে মধুর, কাঁচের আর রূপোর চুড়ির নিক্কণে মুখর একটি সাধারণ পরিবেশ রচনা করবার কামনা ছিল তার। চাঁদের আলোতে ঘুমন্ত জানকীকে মনে হতো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। মায়াময় তার সৌন্দর্য, ইউসুফের মনে হতো বুঝি আসমানের কোন পরীকেই সে জোর করে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু জানকী তার আশঙ্কাকে দর্পিত ভ্রূকুটিতে পরিহার করত। সে রাজপুতানী, বিশ্বস্ততা তার জাতের ধর্ম। তার দাদী পরদাদী সব 'সোহাগুণা সতী'। 'সোহাগুণা সতী' সেই হয়, যে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করে, অনুমৃতা রমণী 'সোহাগুণা'। 'ইমা নারীরবিধবা—' এই মন্ত্র সে কতবার শুনেছে।

সেই ঐতিহ্য নিয়ে বিধর্মীর সঙ্গে কেমন করে ঘর বাঁধল জানকী? ইউসুফের সাদর প্রশ্নের জবাবে জানকী কৌতুকভরা চোখে হাসত। তার চোখেই যেন জবাব পেতো ইউসুফ। ইউসুফের সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়েছে জানকী, সেখানেও সে তার ধর্মকে মেনেছে। এই ধর্ম যৌবনের। যৌবন অল্প কয়দিনের জন্যে আসে, কিন্তু তার দাবিই কী কম? রাজঅন্তঃপুরে বহুজনের একজন হয়ে কোন্ নারী সুখী হতে পারে? হীরের কঙ্কণ, মোতির মালায় কী সুখ বাঁধা পড়ে? উনবিংশ শতকের বাল্যকাল। মর্মরকোঠায়, মণিকক্ষে নারীদের শুধু প্রিয়া হয়ে বেঁচে থাকবার অধিকার দিয়েছে সামন্ততন্ত্র। সুন্দরী রমণী হবে প্রিয়া এবং বংশধর আনবার জন্যে বিবাহিতা পত্নী হবে জননী।

সে নির্দেশ মেনে নিয়ে এক জীর্ণদেহ শ্লথমুঠি নৃপতির অনুগতা

পত্নী হয়ে চতুর্দশলোক স্বর্গে সুখ ভোগ করবার দুরাশায় যারা সতীর মৃত্যু বরণ করে, তাদের একজন হয়ে থাকতে চাইল না জানকী। সে কোন একজনকে আশ্রয় করে লতার মতো পুষ্পিত হতে চাইল। জীবনের পরমলগ্নে কোন একজনকে বরণ করে তার চোখে অনন্যা হয়ে উঠতে চাইল। কারো জীবনে সে একমাত্র হবে, শ্রেষ্ঠা হবে, প্রেয়সী হবে, এই সত্যকেই সে ধর্ম বলে মানল।

তবু সব ফুরিয়ে গেল। আজ যদি অনেক করেও চায় ইউসুফ কখনো তাকে আর দেখতে পাবে না। আর কখনো গোমতীতে কিস্তি ভাসিয়ে তারা বেয়ে চলে যাবে না বীরাওনের জঙ্গলের পাশের সেই ছোট্ট পাথরের বাড়িতে, মিঠে গলায় জানকী আর গাইবে না—ইয়াদ রাখো যো প্যার নাম সে বুলায়া—

সেই সব বসন্তের দুপুরের মতো উজ্জ্বল, মধুর, আবেশবিহ্বল দিন—বেলী চমেলী সে কোয়েল আশীক্ বনি হ্যায়—। বেলী ও চামেলীর গন্ধ-মত্ত কোকিলের গানের মতো মিঠে গরমের রাত, উর্দু বয়েৎ আর ব্রজবোলির গানে গানে মাতাল প্রেম, এই দুর্লভ স্বর্গ তার জীবনে এনেছিল যে মেয়ে, সে আবার বে-ঠিকানা হয়ে হারিয়ে গেল।

যদি কোন অদৃশ্যলোকে থাকে জানকী তবে সে নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করেছে। ক্ষমা করেছে ঘর বাঁধবার জন্য, সাদী করবার জন্য, শিশু আনোয়ারের জন্য। ইউসুফের অন্য উপায় ছিল না। জানকীই যখন রইল না, তখন নতুন করে জীবনটাকে মাতাল রঙে রঙিন করবার ইচ্ছাই তার চলে গেল। বিচিত্র রঙের কত ইচ্ছাই যে নিয়ে গেল জানকী, কত ইচ্ছাই যে ভেসে গেল সেই সন্ধ্যায় গোমতীর জলে, শুধু মনে মনে চিরন্তন পুরুষের মতো শিশু ও পত্নী নিয়ে একখানা ঘর বাঁধবার সাধারণ ইচ্ছাটাই রয়ে গেল।

সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে সাধারণ জীবন কাটিয়ে যেত ইউসুফ, কিন্তু শিকারীর মৃত্যু তো তেমন করে আসে না। আর আসে না বলেই হয়তো জীবন হয়ে উঠল এক সংগ্রামক্ষেত্র। ইংরেজ সাহেবদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল গাঁয়ে।

সাহেব-ছাউনি ফেলতে এলে জ্বালানি কাঠের জন্যে হামলা

করে ফিরতো তার সেরেস্তাদার। গরীবের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যেত হাঁস মুরগী।

একদিন সেরেস্তাদার কোপ লাগাল ইউসুফের সারা বছরের বন্ধু, ভালো ফলনের আমগাছটায়। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল ইউসুফ। গাছটা তখন আধা কাটা হয়ে গিয়েছে। সেরেস্তাদার বললো,—পাঁচ টাকা তো মিলবেই তোর।

শুনে ক্ষেপে গেল ইউসুফ। টুঁটি ধরে ছিট্‌কে ফেলে দিলো গুজারী দুটোকে, যারা কাঠ কাটছিল। সেরেস্তাদার ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু তার দলে ছিল আট দশজন, আর এদিকে ইউসুফ একা। সেই অসম মারামারিতে চোট লাগল ইউসুফের মাথায়।

গাঁয়ের মানুষ ভেঙে এল। প্রাণ নিয়ে পালালো সেরেস্তাদার, কিন্তু ইউসুফ বাঁচলো না। তিনদিন তিনরাত ধরে শুধু ভুল বকলো সে, এতটুকু জল খেলে না। শেষ সময় অবধি গালাগাল করে গেল সেরেস্তাদারকে।

পরে অবশ্য গোর-কাফনের টাকা দিতে চেয়েছিল সাহেব আর সেরেস্তাদারকেও চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে টাকা আনোয়ারের মা নেয়নি, বলেছিল, ও টাকা তার কাছে হারাম।

এমনি করে মৃত্যুবরণ করেছিল ইউসুফ, যার হিম্মতের কথা আজও গল্প হয়ে আছে। যদিও তার ছেলের বয়সই পঁয়ত্রিশ হতে চললো।

সেই ইউসুফেরই ছেলে আনোয়ার। কিন্তু এক পুরুষেই ভাগ্যের রদবদল হয়ে গিয়েছে। দাদাপরদাদার আমলে নাকি অভাব কাকে বলে তা মানুষ জানতো না। যমুনা জল দিতো, মাটি দিতো ফসল, আর আকাশ থেকে খোদা ঢেলে দিতো সুখ-সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা। সেই দিন কেমন করে বদলে গেল, সেই কথাই ভাবছিল আনোয়ার—উঠোনের আমগাছটার তলায় চারপাই'টা বাঁধতে বাঁধতে।

ফসলের মৌসুম শেষ হলে সাহেব তাঁবু ফেলে ফেলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে। তখন ভেট লাগায় তালুকদার,—জী হুজুর মেহেরবান, জিন্দ্‌গী রাখ্‌নে কা ঔর মারনে কা মালিক,—

কয়দিন গাঁয়ে খুব হৈ চৈ লেগে যায়। ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, দুধ, মধু, ঘি আর কাঠ ভারে ভারে চলে যায় সাহেবের তাঁবুতে। সাহেবের আমীন গোঁফে চাড়া দিয়ে নাগরা জুতো মস্‌মস্‌ করে বীরদর্পে গাঁয়ে টহল দিয়ে ফেরে। ছেলেরা আড়াল থেকে অবাক চোখে দেখে সাহেবকে, আর কুয়ো থেকে জল নিয়ে ফিরতে ফিরতে মেয়েরা আড়চোখে মেম্‌সাহেবকে দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে যায়।

সবই ঠিক ছিল কিন্তু দিনকে দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সব। বদলে যাচ্ছে চুপিসাড়ে। দিনের গতিবিধি ঠিক যেন ধরা যাচ্ছে না।

এমন ধারা তো ছিল না দিন। গত সাত বছরের মধ্যে চার সন গেল অজন্মা,—ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা-রং গম জল না পেয়ে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। অজন্মা গেল তো শুরু হলো প্লাবন, পর পর তিন সনই বন্যা, যমুনা উত্তাল, ক্ষেতী জমি ঘর বাড়ি, সব ভেসে গেল বানের জলে।

বন্ধু নন্দলালের কথা মনে পড়লো আনোয়ারের। এইসব আপদ-বিপদের কথা যখনই ওঠে তখনই তার বন্ধু নন্দলাল কার্যকারণ দিয়ে বলে—কি জানো, দুনিয়া থেকে 'ধরম' জিনিসটা নাশ হয়ে যাচ্ছে, তাই এই বিপত্তি।

হবেও বা। নইলে কত কি-ই যে আজগুবী ঘটে যাচ্ছে তার কূলকিনারা মেলে না কেন?

নন্দলালের দাদা ছগনলাল, একটানা দু'বছর মানসিক করে নর্মদার জলে স্নানদান করতে গিয়েছিল গত বছর। দু'মাস আগে সে ঘরে ফিরে এসেছে। বলেছে,—হিন্দুর শাস্ত্রই বলো আর মুসলমানের কোরাণই বলো, কি নর্মদাগঙ্গার জলধারা কি হেরা পাহাড়ের পুণ্যধারা, সব কিছুর গুরুত্বই কমিয়ে দিয়েছে সরকার,—নতুন অংরেজ সরকার। এখন সাক্ষী মানতে, কি সাহেবের কাছে কথা কইতে, কথায় কথায় সাহেবেরা মানুষদের হলফ খাওয়ায়। ছোট ছোট বিষয়ে, পাপপুণ্য আর স্বার্থের বিচারে বিধর্মী সাহেবের নির্দেশে হলফ খেয়েছে বলেই মাথাহেঁট হয়েছে দুই ধর্মের। তাই বিরূপ হয়েছেন দীন-দুনিয়ার মালিক।

সবচেয়ে বড় অধর্মের কথাটা বলে নন্দলাল নিজেই হতবাক হয়ে যায়। তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, তোমার ধর্মে মানা নেই, তবু সেই মাংস কখনো খেয়েছ?

তোবা! তোবা! বলে, নাক কান মলেছে আনোয়ার। সেই মাংস মানে নিষিদ্ধ গরুর মাংস। কথাটাই মুখে উচ্চারণ করতে পারে না নন্দলাল।

ধর্মে মানা নেই তাই কি?

ধর্ম তো একটা নয়, ধর্ম হাজারটা, ব্যবহারিক জীবনেও ধর্মাচরণ আছে। যে প্রতিবেশীর সঙ্গে শৈশব থেকে হেসে খেলে বড় হয়েছ, তারও মন আছে, বিশ্বাস আছে; তা-ও তুমি ভাঙতে পারো না। তাতেও ধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে। সেইজন্য একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করে দশহরা আর মহরম, হোলি আর ঈদ, নির্বিবাদে পালন করছে মানুষ। নন্দলাল বলে আর মাটিতে চোখ বিঁধিয়ে শোনে আনোয়ার।

নন্দলাল বলে যায়, আজ তো তেমনটি আর থাকছে না। সাহেবেরা নির্বিচারে আজ সেই মাংস সর্বত্র ভোজন করছে।

—সর্বত্র?

—কেন নয়? এখন কি ধরিত্রীতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে সাহেব নেই? এমন কি কোন গ্রাম আছে যেখানে বছরে অন্তত দু'দু'বার সাহেবদের তাঁবু পড়ে না?

—গঙ্গার এপারেই কি আর ও পারেই কি!—গঙ্গা এখানে, দক্ষিণে নর্মদা। গঙ্গা যমুনার জলে স্নানে পুণ্য; জলস্পর্শ হলে তবে পুণ্য আসে। নর্মদা চিরকুমারী, পবিত্রতার মূর্ত প্রকাশ। নর্মদার দর্শনমাত্রে পুণ্যার্থীর পুণ্য হয়। কিন্তু সাহেবদের ব্যভিচারে নর্মদাও আজ বিরূপ। সেখানেও চলেছে বছর বছর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি আর বন্যা,—প্রকৃতির খামখেয়ালী অত্যাচার। একমুষ্ঠি অন্নের স্বপ্ন চোখে নিয়ে সেখানে মাঠের রাজা কিষাণ কিষাণীর হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে পথে। সাগর শহরের রাজপথে তারা কাতার দিয়ে পড়ে মরেছে। মায়ের কোলে মরেছে ছেলে, বুড়ো বাপের অন্ধের লাঠি তার সোহাগী মেয়ে মরেছে পাশাপাশি।

নন্দলালের চোখ রক্তজবা। বলে, ভক্তজনের ওপর দেবতা কি কখনও বিরূপ হয়? তবে কেন হলো এই মহাপাতক? কোন পাপে? কার পাপে?—ঐ সাহেব,—সব করেছে ঐ সাহেবরা।

আনোয়ার ভাবে, নন্দলাল যে কথা বলে আজ অনেকেই সেই কথা বলাবলি করে। সেদিন দরগার ফকির সাহেবের কথায় আনোয়ার জেনেছে, ন্যায়ধর্ম যে জলাঞ্জলি দিয়েছে সে তো মহাপাতক বটেই, কিন্তু সেই মহাপাতক বরদাস্ত করে যারা আজ মুখ বুজে আছে তারাও মহাপাপী। এ-দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি তাই তাদের কপালে চিরকালের মতো বরবাদ। সুতরাং আমি তুমি, সকলেই দোষী। রাজার পাপে নষ্ট হয়েছে রাজ্য, আর সেই রাজ্যের প্রজা হয়ে সাধারণ মানুষেরও দুঃখকষ্টের পরিসীমা নেই আজ।

তাই প্রকৃতি বিমুখ। মানুষের এই নিদারুণ দুঃখের দিনে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে অভিমানে।

এই তো কয়েক বছর অগেকার কথা। কি ফলন আর কি ফসল! সমৃদ্ধির ভারে গাছ লুটিয়ে পড়লো ভুঁয়ে। এলাহাবাদ আর বান্দা জেলার মানুষ বললো, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন ফসল কেউ চোখে দেখেনি। মেহনতি মানুষ জিরোবার ফাঁকে ফাঁকে কত গান বেঁধে বৌ-কে শোনালো, এই ফসল থেকেই তার বৌ-এর হাত-ভরতি চুড়ি হবে, গলায় উঠবে রুপোর হাঁসুলি, ইদ্-উল-ফিতর আর ছট পরবের দিনে নতুন নতুন ঘাঘরা আসবে হাট থেকে। সেই সুখের দিনে পায়ের জিঞ্জরা মল কেমন করে বাজবে! সেই ছন্দে গান গাইল কিষাণ— ; আর কালো ভুরু চাঁদের মতো বাঁকিয়ে পিয়ারা বৌ শাসন করল তাকে দশজনের চোখ এড়িয়ে, ফাঁকে ফাঁকে।

সন্ধ্যাবেলা উঠোনে চারপাই-এ বসে কত কথাই যে মনে এল কিষাণ কিষাণীর। মনে হলো, ভাঙা ঘরে ছাউনি পড়বে, পুরনো ঋণ শোধ হবে, দাওয়াৎ দেবে একদিন বন্ধুজন ডেকে। পরবের দিনে ছেলেমেয়ের হাতে ইচ্ছামতো গুলাবী রেউড়ি, তিলুয়া আর সোহন-হালুয়া কিনে দেবে।

এইসব একান্ত ইচ্ছার সূত্র ধরে দুটি মন কাছে এল, কত সন্ধ্যা

মন্থর হলো ভাষাহারা অনুভূতিতে,—নিত্যকার ব্যবহারে মলিন ভালোবাসা সুখের আশ্বাসে উজ্জ্বল হলো।

ভাব পেলো না ভাষা,—কথা খুঁজে না পেয়ে কিষাণ কিষাণীর হাতে হাত বুলিয়ে ভাবলো, সেই সেদিনের কোমল হাতখানি আজ এমনিধারা শুকিয়ে গেলেও কাল আবার ডৌল ফিরে আসবে। আর কিষাণী-বৌ সগর্বে ভাবলো, গমের ক্ষেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যখন ফসল কাটতে শুরু করবে মানুষ তখন সে দশজনের মধ্যে সেরা। এমন পুরুষ কোন ঘরে আছে ?

কিন্তু ভাগ্য এমন, ফসলে রং-ও ধরলো আর কোথা থেকে বাতাস বয়ে আনলো মৃত্যুর বীজ। গমের শীষে রাতারাতি জাফরান রঙের আবরণ পড়ে গেল। তিন দিনে সেই রং গাঢ় বাদামী হয়ে উঠল, আর ফসল ঝরে পড়লো মাটিতে ফোঁপরা হয়ে যেন ভেতর থেকে কে শুষে নিয়েছে। ফসলের মড়ক। এমনি ধারা নাকি ঘটেছিল অনেক অনেক বছর আগে, যখন 'হেস্টিন' সাহেব অযোধ্যার বেগমদের ওপর জুলুম করেছিল, সেই বছর।

খাটিয়া-বাঁধা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ায় আনোয়ার। পিঠটা সোজা করে হাঁক দেয়,—লাল!

সু-উচ্চ কণ্ঠে ঝংকার দিতে দিতে ঢুকল পরী। জল ভরা তামার সোহ্‌রাইটা দুম্ করে নামিয়ে রাখল ঘরে আর বক বক করে বাতাসকে শোনাতে লাগল,—এই রকম করে সংসার চালানো তাকে দিয়ে হবে না। ঘরে যে মানুষটা আছে, সে তো থাকা না থাকা সমান! এমনই সে বীতস্পৃহ পরীর সম্পর্কে। একটা ছেলে, সে-ও একেবারে অবাধ্য। জ্বালা কি তার কম! এই যে পানি আনতে গিয়ে নিত্যি গোলমাল, কে তার ফয়সালা করে ?

লালার বৌ-এর এত অহংকার যে কুয়োতলা জুড়ে বসেই থাকবে আর গল্পই করবে। কেন পরী কি তার দাসী? তার সংসার নেই, কাজ নেই? যমুনার নানীরই বা কি আক্কেল! দু'তৌলী আটা ধার দিয়েছিল কবে, সে কথা কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোনাতে হয় ?

মুখ টিপে হেসে আনোয়ার বলে,—এত সাহস পায় কোথা থেকে মানুষ!

—পাবে নাই বা কেন? আমার সোয়ামী তো আর তালুকদার না! আমার নসিবই এমনি।

রসিকতায় আনোয়ারও কম যায় না। পরীর কাঁধে হাত রেখে বলে,—দে নাম লিখে দে। যমুনার নানীকে হাজতে পাঠাই। লালার বউকে হজিমত দেই। বড় আস্পর্ধা বেড়ে গিয়েছে সব!

আনোয়ারের হাত ঠেলে দিয়ে পরী ঝাঁঝ দিয়ে বলে,—এখন খেলা করবার সময় নয়। অনেক কাজ আমার। এক-উঠোন শুকনো পাতা ঝাড়ু দিতে হবে, রুটী সেঁকতে হবে, ছাগল দুটো তাড়িয়ে আনতে হবে ক্ষেত থেকে।

—কাজে যেতে হয় যা না, ভারী কাজ দেখানেওয়ালী হইছিস!—বললো বটে কথাটা কিন্তু পরীকে ছাড়ল না আনোয়ার। চিবুকটা তুলে সে নিরীখ করে দেখলো। বললো, মনে পড়ে? সেই ঘর করবি না বলে ঘাসের গাড়ির পেছনে চেপে বাপের কাছে পালিয়েছিলি?

—আর তুমি যে ক্ষেত পালিয়ে ভাব করতে গিছলে?

সে সব পুরনো দিনের কথা ভেবে পরীর চোখে মেদুর স্বপ্ন নামতো যদি না ঘরে ঢুকতো তার ছেলে, নাচতে নাচতে।

—মা ক্ষিদে পেয়েছে খেতে দে। ত্রস্তে সরে গেল পরী আনোয়ারের হাত ছাড়িয়ে, আর আনোয়ার গেল বাজারতলা। সেখানে আজ মস্ত জমায়েত আছে।

একদিন এ অঞ্চলের মুসলমান কিষাণরা ছিল সিপাহী, বাদশাহী আমলের ফৌজ। জমি মিলেছিল নবাব বাদশাহের কাছে। তাই ধরেছিল ক্ষেতী। এখন জমি চাষ করে আর পড়তা থাকে না। তার ওপর পর পর কয়েক বছর ধাক্কা খেয়ে রুজীর জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছে সকলে। সময় বুঝেই ফৌজী কাজের খবর নিয়ে এসেছে নওলপ্রসাদ এলাহাবাদ থেকে। নতুন কথা বলবে সে।

চার

গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা বাজারতলার দিকে। পাশে সু-উচ্চ শিবমন্দির। এ মন্দিরে ঢোকবার এক্তিয়ার নেই আনোয়ারের। তবু সে জানে শ্বেতপাথরের মেজেতে নাগরী হরফে পরম সৌভাগ্যবতী অযোধ্যাকুমারীর নাম লেখা আছে।

আযোধ্যাকুমারী হচ্ছে বুড়ো লালার পিসী। সে কি আজকের কথা। সতী হয়েছিল সে। তার আগে পরে আরও অনেকে সতী হয়েছে। নদীর ধারে সারি সারি চৌড়া আছে তাদের নামে। তবু অযোধ্যাকুমারী তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তার চৌড়া সব চেয়ে উঁচু।

সকালে সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরবার পথে হিন্দু মেয়েপুরুষ সেখানে জল ঢালে, প্রণাম করে, আর পুণ্যদিনে মিঠাই ফুল রাখে।

লালাদের ছেলে মাখনলাল আনোয়ারের শৈশবের সাথী, ছোটবেলার খেলুড়ী। যমুনার চর পেরিয়ে যখন তারা তরমুজ চুরি করতে যেত, তখন নৌকোয় বসে মাখনলাল বলতো,—সতী হলে কি হয় জানিস? পঁয়ত্রিশ কোটী বছর ধরে সতী স্বর্গে থাকে। সতীর মা, বাপ, আর স্বামীর বংশ চোদ্দজন্মের জন্য পবিত্র হয়।

এমনই ভাগ্যের পরিহাস, মাখন যখন চোদ্দ বছরের তখন তার মাকে সবাই ধরে বেঁধে সতী করালে। একমাত্র ছেলে মাখন, তবু তার বাবা অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে এলাহাবাদে থাকতো। মা ছাড়া কিছু জানতো না মাখনলাল। বংশমর্যাদা কম ছিল বলে শ্বশুরঘরে বড় ভয়ে ভয়ে আর মুখচোরা হয়ে দিন কাটাতো মাখনের মা। শহরেই মরেছিল মাখনের বাপ। স্বামীর ব্যবহৃত নাগরা-জোড়া, যার দাগ নাকি মাখনের মায়ের শরীরটাকে জখম আর মনটাকে ভীতু করে রেখেছিল ষোল বছর ধরে, তাই বুকে করে মরতে গেল সে। তার শ্বশুরবাড়িতে চিরকাল ধরে এমনিধারাই ঘটেছে। এইটাই রীতি।

অযোধ্যাকুমারী ছিল মাত্র বছর দশেকের মেয়ে। কিন্তু তবু সে রেহাই পায়নি। স্বামী মরতেই সে আমের ডাল হাতে লাল কাপড় পরে পিঁড়িতে বসে বলেছিল, সৎ সৎ সৎ। শেষ সময় ভয় পেয়েছিল। লাফিয়ে উঠে পালাতে চেয়েছিল বাপের কাছে। তবু সেই বাপই তাকে জোর করে ধরে এনে চিতায় তুলে দিয়েছিল। ঢাক ঢোলের শব্দে তার কান্না শোনা যায়নি। ভাঙ-এর নেশায় হাসতে হাসতে চিতা প্রদক্ষিণ করেছে সে, সেই নাকি তার আসল রূপ। দশবছরে সতী হয়ে পরিবারকে অতুল পুণ্য দিয়ে গিয়েছে অযোধ্যাকুমারী। স্বামীর ভাগের বিশাল সম্পত্তি পেয়ে তার দেওররা চৌড়া তুলে দিয়েছে যমুনার তীরে। আর গাঁয়ে মন্দির তুলে দিয়েছে তার বাপ।

অযোধ্যাকুমারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মাখনের মাকে বুঝিয়েছিল তার শাশুড়ী ননদ। বলেছিল, মাখনলাল তো আর ছোট নেই! কতজন যে কচি কচি ছেলেমেয়ে রেখে চলে যাচ্ছে! মাখনের মা ভাঙ আর আফিং-এর নেশায় তখন মাতোয়ারা। কিছু তার কানে ঢুকেছিল আর কিছু ঢোকেনি। ধ্বজা উড়িয়ে, বাজনা বাজিয়ে, কড়ি ফুল আর মিঠাই ছড়িয়ে, বড় ধূমধাম করে তারা নিয়ে গিয়েছিল মাখনের মা-কে। ভাশুর খুলে নিয়েছিল গহনা, আর শ্বশুর তার হাত ভরে তামার পাই ঢেলে দিয়েছিল। দান করুক বউ, অর্জন করুক মহাপুণ্য। হুঁশ ফিরেছিল মাখনের মা-র শেষ সময় ছেলের নাম ডেকে। কিন্তু তখন আর সময় নেই। দশখানা গাঁয়ের লোক ভিড় করে এসেছে চারদিক থেকে। ঢাকে ঢোলে ঝনঝনিয়ে বাজনা উঠছে। ধূপের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ক'হাজার লোক সমস্বরে জয়ধ্বনি করছে। জ্বলন্ত চিতায় ঘৃতাহুতি দিতে দিতে পুরোহিত উচ্চারণ করছেন, অনশ্রয়ো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু…।

সেই রাতে যখন সবাই ঘাটে বসে হল্লা করছে, তখন মাখন পালিয়ে এসেছিল আনোয়ারের বাড়িতে। আনোয়ারের মায়ের কোলে মাথা গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদেছিল আর জাতের মুখে তিনবার পদাঘাত করেছিল।

সেই থেকে মাখনলাল ক্রীশ্চান হয়ে গিয়েছে। গাঁয়েও আর

ফেরেনি। সবাই জানে সে কানপুরে থাকে। বুড়ো পাদ্রী সাহেবের দৌলতে ফারসী আর ইংরেজী শিখে ছোট মুন্সী হয়েছে। সাহেবের সঙ্গে তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে দোভাষীর কাজ করে। তা'ছাড়া হিসাব রাখে, খাতা দেখে। অনেকে বলে, তার নামটাও নাকি পরে বদলে গিয়েছে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বাজারতলা চললো আনোয়ার।

সকালবেলা। নদীতে স্নান করে ঘটি থেকে জল ছিটিয়ে আশপাশের সমস্ত পথ শুদ্ধ করতে করতে আসছে শিবমন্দিরের পুরোহিত। উচ্চকণ্ঠে দোঁহা গাইতে গাইতে আসছে সে— কিরপা হোই রাঘব রাম সে উধার ভৈল সন্তাপী—। পাথর-বাঁধানো পথের দু'পাশে নিচু দু'তলা বাড়ি। নিচের ঘরে বসে বুড়ো দর্জি সেলাই করছে। মৌলভীসাহেব চাবির গোছা হাতে মক্তবের দরজা খুলতে চলেছেন। শাক, সবজী, দুধ আর ঘিয়ের ভাঁড় মাথায় নিয়ে ঘাঘ্‌রা দুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে চলেছে মেয়েরা। যমুনার নানী জাঁতা ঘোরাচ্ছে ঘড় ঘড় শব্দে।

বাজপোড়া জামগাছটা পেরিয়ে বাজারতলা পৌঁছল আনোয়ার। প্রথমেই চোখে পড়লো চারপাই-এর উপর দাঁড়িয়ে মোটা নওলপ্রসাদ চিৎকার করে কি বলছে।

মস্ত বাঁধানো চক। তারই উপরে দাঁড়িয়েছে নওল। ঘিরে বসেছে সবাই। সাদা গোল চিকণের কাজ-করা টুপি মাথায় এসেছেন সম্মানিত বৃদ্ধ গ্রামবাসীরা। কি বলছে নওল? ফৌজী জীবনের কথা বলছে সে। বলছে, চাকরি মিলবে, ছুটি মিলবে, বুড়ো হলে 'পেনসিল'-ও মিলবে। সেখানে নিরাপত্তা আছে, টাকা আছে, কদর আর খাতির আছে।

কানে কানে হাফিজকে জিজ্ঞাসা করল আনোয়ার,—নওল কবে থেকে এত বিশ্বাসী মানুষ হলো?

হাফিজ বললো,—জাতপাঁত পুছে কোঈ? জনাও পর্‌কে ব্রাহ্মণ হোই। শহর থেকে ঘুরে এসেছে, ওর বৌয়ের চাচা কানপুরের রিসালাদার। তাতেই ওর ভোল বদলে গিয়েছে। থলি ভরে টাকা এনেছে। নিজের ঘোড়া চেপে এসেছে। গায়ে শাল, পায়ে নাগরা উঠেছে।

নওল বোঝাতে লাগল,—কিষাণ হয়ে জন্মেছ যখন, তখন ধার মাথায় করেই এসেছ। কর্জ হ্যায় মর্দনই-শৌহর। ধার হচ্ছে পুরুষের মনিব। ধার শুধ্‌তে শুধ্‌তে মরে যাবে—আর ধার রেখে যাবে ছেলের ঘাড়ে। শুধু ক্ষেতী করে চলেছে আমাদের বাপ দাদারা। তখন একটাকা রোজগার করলে তিনমাস খেয়েছে মানুষ। এখন পড়েছে টাকার দিন। টাকা আনতে হবে।

জমায়েত থেকে সাড়া উঠল মৃদুগুঞ্জনে। এ-কথায় সকলেই সাড়া দিচ্ছে। টাকার দরকার সকলেরই আছে।

আবার নওলপ্রসাদের কণ্ঠ বেজে উঠল,—ফৌজী জীবন বড় সম্মানের। নবাব সাহেবের যত প্রজা সবাই আজ সেরা ফৌজী সিপাহী। সেইদিন আর নেই যে, পুরোবাট্টা দেবে বলে আধাবাট্টা দিয়ে ঠকাবে। সে হয়েছিল বটে একসময়ে। তখন মনের দুঃখে সিপাহীরা দলে দলে চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এখনকার সাহেবরা বড় ভালো। সব পুরো বাট্টার চাকরি, দেশঘরের কাছে। কোন ভাবনাই নেই।

নওলপ্রসাদের কথাগুলোয় সত্যিই যেন কোন আশার বাণী শুনতে পেলো আনোয়ার। বড় দরকার হয়ে পড়েছে টাকার। বড় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে জীবন।

সেইদিনকার কথা নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে শুরু হলো আলোচনা। তারপরেই এল বিদায়ের পালা। ঘরে ঘরে বিদায় নিয়ে মানুষ চললো যমুনা পেরিয়ে দল বেঁধে। খেয়ানৌকোর ছই-এ বাতি জ্বালিয়ে রাতারাতি কত মানুষ গেল পার হয়ে।

ইতিহাসের পাশাতেও নতুন করে দান পড়ছে। কালের অমোঘ বিধানে নির্বাসিত হতে চলেছে সেইসব দুল্‌কি চালের দিন। ঠগী আর পিণ্ডারীর অত্যাচারে থরথর বুক মুসাফির, তীর্থ ও হজ যাত্রী। উটের পিঠে ইস্তাম্বুলী কার্পেট চাপিয়ে বেদুইনী পোশাক-পরা আরবী সওদাগর, পিতলের তাঞ্জামে বসে মিছ্‌রী আর ফল বিতরণে পুণ্যার্জনে ব্যস্ত প্রসন্ন সহাসনয়না রাজপুতানী, তাদের দিন চলে যাচ্ছে। পৌঁছে গিয়েছে নতুন মানুষ। হিন্দুস্থান তাদের।

হিন্দুস্থানের কোটি কোটি মানুষ তাদের প্রজা। ফৌজ তাদের প্রয়োজনের হাতিয়ার।

এক রাত্তিরে চলে গেল আনোয়ার। গেল দুরাশায় বুক বেঁধে। পরীর কাকুতি মিনতি, খুদাবক্সের চোদ্দবছরের জীবনের ভালোমন্দের ভাবনা, এই সব চিন্তা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করল সে।

নাম লেখাতে গেল যে মানুষ সে আর ফেরে না। আজ গেল, কাল গেল, দশটা দিন কেটে গেল, তার দেখা নেই খবর নেই। পরী শুধু দোয়াভিক্ষা করে। কোন্ আসমানে বসে আছেন খোদা তার কানে যায় না।

হঠাৎ খবর এল মাঝরাতে। কার সাড়া পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল পরীর। দোর ঠেলছে কে? কোন জানোয়ার নয়তো? ভাল্লাখানা টেনে নিলো পরী। তখন আনোয়ারের গলা শোনা গেল—পরী পরী······

দোর খুলে আনোয়ারকে দেখে পরী তো অবাক। পা থেকে হাঁটু অবধি কাদা আর রক্ত। ধূলি ধূসরিত দেহ। ত্রস্ত চাহনি।

—কি হয়েছে?

মস্ত অপরাধ করেছে আনোয়ার। ফৌজ থেকে পালিয়েছে। তার চেয়ে বড় অপরাধ ফৌজের দফ্তরে নেই। জাফর আর হবিবও পালিয়েছে। তারাও তার সঙ্গে ছিল।

চৌকিতে বসলো আনোয়ার। ভাঙা জবানিতে বলে গেল গত ক'দিনের ঘটনা। সরকারী কাগজে যখন টিপছাপ দিলো অন্য সকলে, একা আনোয়ার নাম সই করল উর্দুতে। সাহেব খুশি হয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন লেখাপড়া যখন জানে তখন তার উন্নতি তাড়াতাড়িই হবে।

তারপর দেখা গেল তাদের গতিবিধির ওপর সাহেবদের কড়া নজর। সকলেরই মনে প্রশ্ন জাগলো—নজর কেন? সন্ধ্যে নাগাদ আসল খবর ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তাদের সুদূর পাঞ্জাবে যেতে হবে। খবর পাওয়া গেল কিছু বরখাস্ত সিপাহীর কাছ থেকে। এই নতুন আমদানী ফৌজের সঙ্গে যাতে তারা না

মিশতে পারে সেদিকে সাহেবদের কড়ানজর ছিল, তবু খবরটা রোখা গেল না। জানা গেল টিপছাপ দিয়েছে যে শর্তে, তাতে নাকি হিন্দুস্থানের সর্বত্র বিনা আপত্তিতে যাবার কথা বিশেষ করে লেখা ছিল।

—একথা তো নওলপ্রসাদ বলেনি ?

—বলবে কেন ? সে সাহেবদেরই লোক। ফৌজের জন্য সিপাহী যোগাড় করাই তার পেশা। কিন্তু বেইমানি করে নওল-ও পার পায়নি। পিঠ সোজা করে দাঁড়ালো আনোয়ার। চালাঘর-খানাতে তাকে আর ধরছে না এমনই বিরাট মনে হচ্ছে তাকে। সে বললো,—সে বেইমানকে আমি খতম করে দিয়েছি। ছোরাখানা তার বুকের এদিক ওদিক ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তুনিয়ার আলোতে তাকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। তাকে খুন করে তবে আমরা পালিয়েছি। ফৌজ আমাদের পেছনে ধাওয়া করে আসছে।

তারপর বললো,—তারা তিনদিন ধরে পালাচ্ছে। রাতে রাতে গা ঢাকা দিয়ে পথ চলে চলে এতদূর এসেছে। বড় বিপদ সামনে। সে-বিপদের চেহারা সে জানে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে যে, তাকে এখনি পালাতে হবে।

—কতদিনের জন্যে ?

—তা সে বলতে পারে না। হবে মাস কয়েকের জন্যে।

—তবে আজ রাতে বিঠৌলীতে এল কেন আনোয়ার ? বিঠৌলী তো বড়রাস্তার ওপরেই। গতবছরই কানাত পড়েছিল বিঠৌলীর পাশে—শিকার করতে এসেছিল মিলিটারী সাহেব, যার মেম ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতো !

সে-সব কথা আনোয়ারও জানে। জাফর আর হবিব গাঁয়ের কাছে আসেনি। রাতারাতি যমুনা পেরিয়ে তারা সাসারামের পথ ধরবে। সে একা এসেছে। পরী আর খুদাবক্সকে একবার না দেখে চলে যেতে তার মন সরছিল না।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তু'জনেই কেমন যেন ভাষাহারা হয়ে গেল। হঠাৎ সমস্যা ফেনিয়ে উঠল নতুন করে। নতুন প্রশ্ন দেখা দিলো। সহজ নিরুদ্বেগ জীবনের সাধারণ সুখতুঃখের প্রশ্নগুলো বাতিল হয়ে

গেল। সেই পরী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার রূপ গুণ অনেকের চেয়েই খাটো বলে সে জেনে এসেছে এতদিন। অতি সহজে সে গ্রহণ করেছে পরীর সেবাযত্ন। দিনের পর দিন দুইখানি নিরলস হাতে পরী তার ঘরের কাজ করেছে, ছেলেকে দেখেছে, চাপাটি সেঁকে ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে তাকে ফসল কাটার মৌসুমে। রাত জেগে বাতির সামনে বসে কাপড় রিপু করেছে, টুপিতে তালি দিয়েছে, নয়তো পরবের দিনে পরবার জন্য নিপুণ হাতে লাল রেশমের কুর্তায় সল্‌মা চুমকি বসিয়েছে সযত্নে।

আজ এতবছর পরে যেন আনোয়ারের চোখে পড়লো পরীর চেহারায় সে লাবণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, কপালে রেখা পড়েছে, চুল পাতলা হয়ে এসেছে, হাত দু'খানায় অনেক পরিশ্রমের স্বাক্ষর। তবু এই নারীর সঙ্গেই তার জীবন জড়ানো আর একে ছেড়ে যেতে হবে বলেই তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

মুহূর্তগুলির বিহ্বলতা কাটিয়ে পরী বললো,—জল এনে দিই, হাত পা মুখ ধোও।

—সময় নেই পরী।

—একটু কিছু খাবে না ?

—সময় নেই।

কেন সময় হবে না ? এতটুকু বিশ্রাম করবে না, একটু কিছু খাবে না, এ কি রকম বিদায় গ্রহণ আনোয়ারের ? তিন বছর ধরে উপোষের কষ্ট অনেক জেনেছে পরী। দেখেছে, তারা যখন উপোষ করেছে, তখনও গাঁয়ের কোনও কোন ঘরে সমারোহ করে দশেরা আর রামনবমী হয়েছে। ঈদ আর সবেবরাতে কোন কোন বাড়িতে ধূমধাম হয়েছে। বাজী পুড়েছে, নতুন কাপড়ের সওগাত আর নানা রকম মিঠাই এসেছে শহর থেকে রঙীন কাগজ ঢাকা ঝুড়ি বোঝাই হয়ে। সে সব দিনে এই স্বামীই তাকে কত অপমান করেছে। খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কথায় কথায় মেরেছে ছেলেটাকে। সন্ধ্যেবেলা জল আনতে গেলে লালাদের বুড়ী দাদী দরদীর মতো স্পর্শ বাঁচিয়ে আটা ঢেলে দিয়েছে তার আঁচলে, আর তাই জানতে পেরে আনোয়ার গালাগালি করেছে।

তবু এ দুঃখও দুঃখ নয়, এই মনে ভেবে সুদিনের ভরসায় বুক বেঁধেছিল পরী। যাই হোক না কেন, মরদ তো ঘরেই আছে। এতদিনে সেই ভরসা তার চলে যায় বুঝি। নিরাশ্রয় হবে পরী আর খুদাবক্স, বেঁচে থাকবে পরের দোয়া ভিক্ষা করে।

স্বামীর হাঁটুতে মাথা রেখে মাটিতে বসে কাঁদতে আরম্ভ করল পরী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার দমকে শরীরটা তার কেঁপে উঠতে লাগল। তখন নিচু হয়ে তাকে তুলতে গিয়ে সেই মাটিতেই বসে পড়ল আনোয়ার। পরীকে টেনে নিলো কাছে।

জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে। ভাঙাঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোতে কতক্ষণ ধরে যে বৌ-কে দেখলো আনোয়ার! তামাটে লাল মুখ পরীর। বেণীর সামনে গোছা ধরা রুক্ষ চুল। কবে সাদী হয়েছিল, তখনও এমন করে টান অনুভব করেনি সে। অনেক গলতি জমেছিল পরীর কাছে। তাই বুঝি এই রাতটাকে মিলিয়ে দিয়েছেন খোদা।

চাঁদ যখন হেলে পড়েছে তখনো ঘুমন্ত আনোয়ারের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল পরী। স্বামী বলেছে—তুলে দিবি আমাকে। আঁধারে আঁধারে চলে যাবো। বললেই কি সে ঘুম ভাঙাতে পারে? এখনও তো রাত রয়েছে। নিজেও হেলান দিলো পরী।

সেই ঘুম না ভাঙলেই বুঝি ভালো ছিল। ভাঙলো রোদের তাপে, ঘোড়ার পায়ের শব্দে আর দশজন মানুষের গলার উল্লাসের চিৎকারে।

সব বুঝে লাফিয়ে উঠে আনোয়ার খুলে নিলো তার ছোরা। বেরিয়ে আসতে না আসতে চিৎকার করে উঠল ফিরিঙ্গী অফিসার। পরী কেঁদে উঠে জড়িয়ে ধরলো তার স্বামীকে। এক ঝট্‌কায় পরীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আনোয়ার চেঁচিয়ে উঠল,—চলে আয় কে মরদ্ আছিস্!

সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠল তার। আগুন জ্বলতে লাগল চোখে। এই মানুষকে চেনে না পরী। অনেকদিন আগে

আনোয়ারের বাপ বাঘের সঙ্গে মৌকা নিতো। আজ আনোয়ারের রক্ত সেই কথা স্মরণ করেছে। তার রক্তেও জ্বালা ধরেছে।

কাঁটার ঝোপ, শুকনো নালা, গমের ক্ষেত বনজঙ্গল, আঁধারে আঁধারে পেরিয়ে ডেভিড্‌সন আজ তিনরাত ধরে তিনটে নেটিভ বদমায়েশের খোঁজে খোঁজে আসছে। তিনটের বদলে দশটাকে লটকে দিলেই হতো, কিন্তু জোঁনস্‌ সাহেব ক্ষেপে আছে। সেই তিনটেকেই চাই। এই লোকটাই নাকি দলের সর্দার, সবাই তাই বলছে। আনোয়ারকে দেখেই জঘন্য একটা গালি দিয়ে বন্দুক তুলে ধরলো সে।

আনোয়ারের ছোরাখানা ততক্ষণে অব্যর্থ লক্ষ্যে গেঁথে বসেছে সবচেয়ে সামনের সিপাহীটার গলায়। ভাল্লাটা হাতে ধরিয়ে দিলো খুদাবক্স। কিন্তু প্রতিপক্ষকে ফিরে আঘাত হানবার দ্বিতীয় সুযোগ মিললো না তার। ডেভিড্‌সনের গুলী তার আগেই বুকে বিঁধে গেল।

সকালের প্রশান্তি টুটে ছিঁড়ে ফেলে পরী আর খুদাবক্সের আর্তনাদ ফেটে পড়লো। আনোয়ারের জোয়ান দেহটার ওপর দিয়ে সারিসারি চলে গেল ঘোড়াগুলো। ছিট্‌কে পড়লো আনোয়ারের বিশাল দেহ। রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে গড়িয়ে পড়লো ধুলোর ওপর।

ততক্ষণে বিপদের সঙ্কেত পৌঁছে গিয়েছে গ্রামের ঘরে ঘরে। সবচেয়ে আগে ছুটে এল গ্রামের মদনমোহনের সেবাইত পরমেশ্বর মিশ্র। বলিষ্ঠ বাহুতে তুলে ধরলো আনোয়ারের মাথা, হাফিজ ধরলো পা। চারপাইটা টেনে এনে গায়ের চাদরখানা তাতে ফেলে দিলো বুড়ো লালা।

জলের ঝাপটা দিতে দিতে জমি ভিজে গেল, কিন্তু চাদরটার বাঁধন না মেনে রক্ত উঠতে লাগল ঝলকে ঝলকে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ খুললো আনোয়ার। আর খুদাবক্স ঝুঁকে পড়লো সামনে।

কি বলতে চাইছে তাকে আব্বা। ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প। কান পাতলো খুদাবক্স।

ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিচু, ভাঙা, প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে আনোয়ার বললো,—বেটা বেটা লাল!

—আব্বাজান!

—তুই বদলা নিস্…'আমায় খুন করলো…ভুলিস না!

—কভি নহি আব্বা!

—ভুল্‌না মৎ।

কথাটা প্রায় জোরে বললো আনোয়ার। মৃত্যুর আক্ষেপে অস্থির আঙুলে ছিঁড়ে ফেলতে চাইলো বাঁধন। দুটো তিনটে ধারায় ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত উঠে এল। সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে স্থির হয়ে গেল।

পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো খুদাবক্স পিতার বুকে। পরী তখনো অচৈতন্য।

সে রাত ধরে ভিড় লেগেই রইলো বাড়ির উঠোনে। গোর-কাফনের বন্দোবস্ত তৈরি, মৌলভী সাহেব ফাতেহা পড়লেই হয়। মৌকা বুঝে বেঁকে বসলো মৌলভী। বললো,—আমার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করেছে সে? অপমান করেছে গোঁয়াতুর্মি করে।

মৌলভীর জবাব শুনে গোঁয়ার হাফিজ গিয়েছে, শাসিয়ে এসেছে মৌলভীকে চড়া গলায়। ঘর পুড়িয়ে দেবে, ক্ষেত লুঠে নেবে, এই সব শাসানি শুনে মৌলভী সাহেব এসেছেন শেষ পর্যন্ত।

নিজের পোঁতা আমগাছের তলায় গোর দেওয়া হলো আনোয়ারকে।

খবর পেয়ে ভোরের দিকে মোষের গাড়ি হাঁকিয়ে এল পরীর চাচা। সান্ত্বনা দিয়ে বললো,—আমার কাছে চল্ বেটি, দু'জনে থাকবো।

খুদাবক্সও নানার কথায় সায় দিলো। বললো,—আমি তো বেরিয়ে যাবো, তুই কার কাছে থাকবি মা? নানার কাছেই যা।

পরী ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু অনমনীয় সংকল্পে ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো ছেলে। সে যে বাপের যোগ্য সন্তান তার প্রমাণ তাকে দিতেই হবে। নইলে উঠোনের কবরের দিকে

সে কেমন করে চাইবে ? বাপকে মনে মনে কি জবাবদিহি করবে ? বাপের কথা, বাপের চাহনি তার মনে নিরন্তর চাবুক মারছে। তার পক্ষে ঘরে থাকা অসম্ভব। সে চলে যাবে দূরদূরান্তে।

অগ্নিশিখার মতো পবিত্র, উজ্জ্বল সেই কিশোর মুখ। পরী সেদিকে চেয়ে কেঁদে উঠলো,—ওরে তুই কি করবি ?

—পাঠান কখনও চিন্তা করে না মা। হিম্মৎ থাকলে আপনি থেকে রুজী এসে ধরা দেয়।

আনোয়ার থাকলে যেমন করে বোঝাতো, ঠিক তেমনি করে পরীকে বোঝালো খুদাবক্স। পরী বললো,—বেশ। আমি কিন্তু এ-ভিটে ছেড়ে নড়বো না। ঘরে চেরাগ দেবে কে ?

খুদাবক্সকে বোঝাতে এল পড়শীরা! হাফিজ, সুজন, বিষাণ সিং, লালা। সবাই বললো, তাদের ভরসায় পরী থাকুক। তারা খেয়ে পরে বেঁচে থাকলে পরীরও কোনো অভাব হবে না।

খুদাবক্সকে নিয়ে যাবে নন্দলাল। আনোয়ারের বাল্যবন্ধু সে। রাত জেগে ছেলের জামাকাপড় রিফু করলো পরী। গুছিয়ে বেঁধে দিলো পোঁটলা করে। কোমরে দিলো বাপের ছোরাখানা।

রওনা হবার সময় ভোররাতে। ডাকতে এল নন্দলাল। নদীতে খেয়া নৌকো চলেছে ভেসে। ঝাপ্‌সা চোখে খুদাবক্স দেখতে লাগলো মা-কে। অর্জুন গাছের ডাল ধরে কপালে হাত দিয়ে সে চেয়ে আছে, সে যেন শুধু তার মা-ই নয়। সে যেন তার গ্রামখানি। গ্রামখানাই যেন তাকে বিদায় দিতে এসেছে ভোরবেলা।

নৌকো ওপারের ঘাটে পৌঁছতে সে পা দিলো নতুন মাটিতে—নতুন জীবনে।

পাঁচ

প্রায় পনেরো দিন ধরে পথ চললো নন্দলাল আর খুদাবক্স। পথে পথে সরাইখানা। পথচলতি বন্ধুদের বিশ্বাস করতে নেই।

ঠগীদের অত্যাচার বন্ধ হয়েছে কিন্তু ডাকাত খুনে আর বাটপাড়ের ভয় পদে-পদে।

বান্দাতে পৌঁছে কৈন নদীর তীরে খুদাবক্সকে আশ্চর্য সব জিনিষ দেখালো নন্দলাল। বললো,—নদীর মাঝখানে যে লাল সবুজ আর গেরুয়া রঙের পাথর দেখছিস না, ওর প্রত্যেকটি মন্তর-পড়া। দেখবি? কথাটা শেষ করেই সে আছড়ে একটা ছোট পাথর ভেঙে ফেললো। তার মধ্যে সত্যি সত্যিই সব চিত্রবিচিত্রিত রেখা। মঞ্জুল ভঙ্গীতে লীলায়িত কোনো নৃত্যপরা রমণীর ছবি, কোনটায় অরণ্যের ওপর পূর্ণচন্দ্রের প্রহরার চিত্র। নন্দলাল বললো,—কৈন নদীতে পূর্ণিমা তিথিতে নেমে আসেন স্বয়ং চন্দ্রদেব। জলের জিনপরীদের সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ লীলাখেলা করে চলে যান। আর সেই কারণেই পাথরে ছবি পড়ে যায় এমনিধারা। এমনি সব আশ্চর্য রূপকথার গল্প বলে তাকে ভুলিয়ে রাখলো নন্দলাল। মানুষবাঘের কথা, বান্দার রাজার মন্তর-পড়া পোষা কুমীরের কথা, এমনি সব গল্পকাহিনী।

হামীরপুর, বান্দা আর ছত্তরপুর পেরিয়ে পনেরোদিন বাদে তারা অরছায় এসে পৌঁছলো। সন্ধ্যার দিকে সারা শহর চুঁড়ে নন্দলাল টিকমগড়ে তার বন্ধু পরন্তপের ডেরা খুঁজে বার করলো।

বিরাটকায় চওড়া চেহারা পরন্তপের। জোড়া গোঁফ চুমরে উঠে গিয়েছে কানের পাশ দিয়ে। পরনে যোধপুরী আর পায়ে পেতলের ফুল বসানো নাগরা জুতো

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর হো হো করে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো পরন্তপ। বললো,—আরে মুসলমান পাঠানকে আমি ছোঁবো? খুদাবক্সের দিকে ঢালের মতো হাতখানা এগিয়ে ধরে বললো,—একবার পাঞ্জা লড়ে যাও বেটা, দেখি এলেম্?

নন্দলাল বলে,—কি জী, চাকরি ছেড়ে দিলে কেন সরকারের?

পরন্তপ ভ্রূকুটি করে বলে,—আরে ভাই চৌহান কখনও নোকরি করে? চাকরি কি?—ঢুবেলা শুধু লেফট্ রাইট্, পরেড্ লাগাও উর্দি পরো,—আর ঐ গোঁয়ার শূয়োর-খেকো ফিরিঙ্গী বলে কিনা, 'ট্রেন্সান'! তিন মাস চালালাম ভাই, তার পর একদিন

কৌড়ি গাছের ফল খেয়ে খুব বমি করলাম। সাহেব ডাক্তার বললো, হায়জা হয়ে গিয়েছে, একে ছুটী দিয়ে দাও নয়তো ছাউনিতে মড়ক লাগবে।—আরে ভাই চৌহান কভি কাম করতা ? আবার হো হো করে হাসতে লাগলো পরন্তপ। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললো, —আর কাজ যে করবো, সে কার জন্যে ? বৌ সেই উদয়পুরের কাছে তার মোষ নিয়ে পড়ে আছে। আমাকে ছেড়ে দেবে তবু চারটে মোষের মায়া ছেড়ে আসবে না। ছেলেটাকে সাদি করালাম তা এমনি নসিব যে বৌ তাকে মন্তর করে বশ করে নিলো। তব বোল ভাই খাঁ সাহেব কার জন্যে মান ছোট করব ? কোই শের হ্যায় যার নোকর হবো আমি ? বলেই, আবার সেই হাসি। পরন্তপ বলে যায়,—ভাই খাঁ সাহেব খুদাবক্স, এসব তুমিও একদিন বলবে, তবে আমার মতো বুড়ো হলে। এখন তোমার শেখবার সময়, খাটবার সময়, লড়বার সময়। পুরুষের তো হিম্মত-ই বল, হিম্মত-ই মরদান, হারায়া দরদ—।

নিঃশব্দে হাসতে লাগল নন্দলাল। বললো,—কথায় কথায় শের বলবার অভ্যাসটা দেখছি আজও তোমার রয়ে গিয়েছে!

পরন্তপ বললো,—নিশ্চয় নিশ্চয়—মসল্ল-ই—মরাফ পরায়া য়ে জবান্ না—। শের তো কথার গহনা। ও তো পরাতেই হবে।

পরদিন সকালে খুদাবক্সকে স্নান করিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে জামাজোড় পরিয়ে নিয়ে গেল পরন্তপ অর্জুন সিং পওয়ারের কাছে। অর্জুন সিং-এর বাড়িতে সেদিন তুলসী শালগ্রামের বিবাহ। বড় ভিড় আর জোর খাওয়া-দাওয়া।

অর্জুন সিং-কে দেখেই হাসতে হাসতে গালাগালি করে সম্ভাষণ শুরু করল পরন্তপ, আরে লুঠেরা, আরে ডাকু, আরে পওয়ারের বেটা, আতর গুলাব নিয়ে আয়, আদর যত্ন কর, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া, বসা—দেখ তোর জন্যে কি এনেছি!

দুই জোয়ানে জাপটাজাপটি কোলাকুলি করে সম্ভাষণ হলো। তারপর খুদাবক্সকে পরন্তপ বললো—সেলাম লাগাও বেটা, এখানেই তোমার কাজ মিলে গেল। বন্দুক ছুঁড়বে, ঘোড়া চড়বে, তলোয়ার চালাবে, এইসব শিখবে। দেখো ভাই অর্জুন, যা

শেখবার তাই শিখিও, তোমাদের আবার নিজের মতো কতকগুলো খেলা আছে, সেগুলো যেন শিখিও না।

গোপন কথা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে অস্বস্তি বোধ করে অর্জুন। বলে—কি যে বলো তুমি! সে সব যা হবার হয়ে গিয়েছে।

পরন্তপ হাসতে হাসতে বললো—যা করতে হয় সামলে করো, তোমাদের আবার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে কিনা, তাই মুস্কিল! রাজপুত সর্দার, লড়াই করো, খেতী করাও, শিকার খেলো ; তা না হাজার রকম চোরা কাজ করবে আর লুঠ করবে, এ সব কি কখনো রাজপুতের কাজ?

অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বললো—না না আমি ফৌজ বানাতে চাই। রাজার মোহর মিলেছে। তিনশ' ফৌজ আমি রাখব। লোক খুঁজছি সেই জন্যে।

কাজ হয়ে গেল খুদাবক্সের।

পাঁচ বছর ধরে শুধু নবীশ রইল খুদাবক্স। তন্‌খা মিলল না তার। মিলল শুধু ব্যবহারের ঘোড়া, বন্দুক আর তলোয়ার। রাজপুত ছেলে প্রতাপের সঙ্গে তার ভারী মিলমিশ হয়ে গেল। সারাদিন হাজারটা কাজ। হাজারো ব্যাপারে সাগরেদী করাই হচ্ছে ছোটদের কাজ। তা'ছাড়া ঘোড়াকে যত্ন করা, তাকে পোষ মানানো, ডলাইমলাই—সবই শিখবার জিনিষ।

কিন্তু কেমন যেন একটা রহস্যও আছে। মাঝে মাঝে যখন সরকারী তহসিলদার খাজনা নিতে আসে, তখন খাওয়াদাওয়ার ধুম পড়ে যায়। নাচওয়ালী এসে নাচে। তার জুড়ি সঙ্গৎ লাগায়। সে আসরে তাদের সবার ডাক পড়ে। শুধু কখনো যদি রাতে খবর আনে দূত, তখন রাতারাতি দশ বারোজন ঘোড়াসওয়ার ছুটে বেরিয়ে যায়। কখনো বিশ পঁচিশ চল্লিশজনও যায়। রাত্তিরে যায় আবার ভোর না হতেই ফিরে আসে ঘোড়ার পিঠে থলি বেঁধে, জামায় রক্তের দাগ লাগিয়ে। মালিকের সঙ্গে তখন তাদের কথাবার্তা হয় দোর বন্ধ করে ফিসফিসিয়ে।

কি করতে যায় ওরা,—এই প্রশ্ন করে একদিন ধমক খেলো

খুদাবক্স। গর্জন সিং ডেকে এনে খুব কষে ডেঁটে দিলো। বিশ্রী একটা গাল খেয়ে অপমানে চোখ জ্বলে উঠল তার। বললো—খবরদার! আমি পাঠানের বাচ্চা, মনে রাখবে।

গর্জন সিং বললো—কি করবি তুই? শির নিবি?

নিলে নিতে পারতো মাথা, এমনই খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের। কিন্তু তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গেল প্রতাপ। ভুলিয়ে-ভালিয়ে বললো—ভালুকের বাচ্চা ধরেছে জালিম, দেখবি চল।

প্রতাপ ভালুকের বাচ্চা দেখাবে বলে খুদাবক্সকে অনেক দূরে নিয়ে গেল, বেতোয়ার ক্ষীণধারা পেরিয়ে যেখানে বালির মস্ত চরটা এক প্রান্তে জঙ্গল ছুঁয়েছে। সেইখানে পেঁাছে একখানা বড় পাথর দেখিয়ে বললো,—বোস!

—না বসব না, কৈ কোথায় জালিম!

—জালিম হাটে গিয়েছে আজ! বস না তুই!

প্রতাপের অনুরোধে শান্ত হয়ে বসলো খুদাবক্স।

সামনের দৃশ্য যেমন শান্ত, তেমনই সুন্দর। সাদা সাদা বালি চিক্ চিক্ করতে করতে হঠাৎ আলোয় ঝলসে উঠছে দূরান্তে। মাঝখানে ক্ষীণ অথচ স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে গিয়েছে। বালির ওপর পায়ের দাগে দাগে রাস্তা হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় গাঁয়ের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পেতলের কলসী একটার উপর একটা সাজিয়ে বিচিত্র রংয়ের ঘাগরা দুলিয়ে জল নিতে আসে। কেউ সঙ্গে আনে হাত ধরে ধরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ভাইবোন। জল কম নদীতে, তাই বিপদ তেমন কিছু নেই। এখন দুপুর, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বাতাসে থেকে থেকে চাবুকের শিষ শোনা যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত একটা কুকুর শরীর ডুবিয়ে জল খাচ্ছে নদীতে, আর লালচে হলুদ ডানায় জল ঝাপটে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠছে আর নামছে একটা হীরামন। মস্ত ঠোঁট গলায় গুঁজে বসে আছে একজোড়া কাঁকপাখী। চোখ এক চুল ফাঁক করে ওরা নদীতে ছোট ছোট রূপোলী মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। জামগাছটার ডাল বেয়ে উঠছে আর নামছে কাঠবেড়ালী।

রোদ হেলে পড়েছে। এই অপূর্ব পরিবেশে যা বলে গেল প্রতাপ, তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি ভয়াবহ। খুদাবক্স এক দৃষ্টে চেয়ে রইল আর বন্ধু বল্লে চলল,—অনেকদিন আগে, অর্জুনের মতো সব পওয়ার সর্দাররা 'ভূঁইয়াবৎ' করেছে মারাঠা রাজার বিরুদ্ধে। 'ভূঁইয়াবৎ' বলতে বোঝায় জমির জন্য লড়াই, কিন্তু পওয়ার সর্দারদের স্বেচ্ছাচারী অভিযানগুলো ছিল লুঠপাট, খুনজখমেরই নামান্তর মাত্র। চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টি করে এরা নিজেদের গোলা বোঝাই করত। আজ আর তারা 'ভূঁইয়াবৎ' করে না বটে, কিন্তু অর্জুনের পুরনো দল আজও ভাঙেনি। এদের মধ্যে অনেকেই পুরনো ঠগী বা পিণ্ডারী। লুঠতরাজে ওস্তাদ। সরকারী ডাক, খাজনা লুঠ করে এরা। আগ্রা-সাগর সড়ক ধরে যে যাত্রীরা যায়, তাদের সুবিধে মতো খুনজখম করে এরা লুঠে আনে সোনা রূপো। এইসব কথা যে তোকে বলেছি, তা যেন ঘুণাক্ষরে বেরিয়ে না পড়ে। তাহলে ওরা আমাকে খতম করে দেবে। ক'দিন থেকেই বুঝতে পারছি, এবার তোকে নিয়ে ওরা বেরুবে।

কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল খুদাবক্স। তারপর প্রতাপের কাঁধে হাত রেখে বললো—সম্‌ঝে দিয়ে দোস্তের কাজ করেছ।

দুই বন্ধু মহল্লায় ফেরবার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে অরছার লোককে আসতে দেখল। অর্জুন সিং নিজে এসে নিয়ে গেল তাদের। প্রতাপ নিচু গলায় বললো—অরছাতে এদের অনেক লোক আছে। প্রায়ই খবর দেয় তারা। দো লুঠেরা চাচেরা ভাই। আজ রাতে একটা কিছু হবেই।

সন্ধ্যেরাতে ডাক পড়ল খুদাবক্সের। অর্জুন সিং বললো—আজ রাতে শিকার খেলতে যাবে সব। তুমি গর্জন সিং-এর কাছে থেকো। সে যা বলে তাই শুনবে।

সেই রাতের কথা পরে যখন খুদাবক্স স্মরণ করেছে, তখন সে শুধু লজ্জাই পেয়েছে। নিজের বিবেকের কাছে মাথাটা নিচু হয়ে গিয়েছে তার। বড় লজ্জা আর কলঙ্কের স্মৃতি জড়ানো সেই রাত।

সেই রাতে তারা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল বড়োয়া সাগরের দিকে। হাজারটা প্রশ্নের জবাবেও গর্জন সিং, মহবুব বা

শান্তিপ্রসাদ তাকে কিছু বলেনি। আবছা তারার আলোয় এদিক ওদিক নজর রেখে ধূর্ত নেকড়েবাঘের মতো জ্বল্‌জ্বলে চোখে তারা এগোচ্ছিল। দূর থেকে কয়েকটা টিম্‌টিমে.আলো চোখে পড়তেই সেই দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল।

অজানা উত্তেজনায় বুক কাঁপছিল খুদাবক্সের। নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তার সঙ্গীরা যখন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত নিদ্রায় শায়িত কয়জন যাত্রীর উপর, তখন সে কিছুতেই এগোতে পারেনি। আর্ত নারীকণ্ঠের ক্রন্দন, শিশুর ভয়াতুর আর্তনাদ আর গর্জন সিং-এর ছোরার আঘাতে পুরুষকণ্ঠের যন্ত্রণার চিৎকার তাকে কশাঘাত করেছিল। গাছের ডালে ঝুলোনো বাতির আলোতে তার সঙ্গীদের দেখাচ্ছিল যেন যমদূতের মতো। খুনী! বেইমান! বলে সে সজোরে আঘাত করেছিল শান্তিপ্রসাদের হাতে। সুজন সিংহের হাতে চোট মেরে ফেলে দিয়েছিল তরবারি।

—ওরে বেওকুফ! পাঠানের কলঙ্ক! বলে তাকে পাল্টা মেরেছিল গর্জন সিং। খুন চেপে গিয়েছিল খুদাবক্সের মাথায়। অসম সাহসে সে লড়ে চলেছিল তার চারজন সঙ্গীর বিরুদ্ধে। হঠাৎ দূর থেকে শোনা গিয়েছিল কার পরুষকণ্ঠের হুঙ্কার—কো··ন্··হ্যা··য়··

অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। মশালের আলো কাছে আসছিল, আঁধারের বুকে নাচতে নাচতে। গর্জন সিং শ্বাপদের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল,—মর এবার দুশমনের হাতে। বলে প্রবল বেগে তলোয়ার মেরেছিল তার কাঁধে। লোহার জালে বেধে গিয়েছিল তলোয়ার।

তখন সামনের আঁধার থেকে সাঁই সাঁই করে ছুটে এসেছিল এক ঝাঁক বর্শা। তারই একটা লেগেছিল খুদাবক্সের পায়ে। মাথা টলে পড়ে যেতে যেতে হাজারখানা বর্শার চেয়েও জোড়ে বিদ্ধ করেছিল তাকে বালককণ্ঠের আর্তনাদ—পিতাজী! পিতাজী!—সেই আর্তনাদের সঙ্গে চেতনা হারাতে হারাতে খুদাবক্সের বুক বিদীর্ণ করে একখানা পুরোনো ছবি ভেসে উঠেছিল—মনে পড়েছিল পাঁচ বছর আগেকার এক সকালে সাহেবের ঘোড়ার খুরে খুরে আনোয়ারের জখম দেহ ধাক্কা খাচ্ছে আর তার নিজের কণ্ঠ থেকে

আর্তনাদ উঠে চিরে ফেলেছে আকাশ। অজান্তে তার মুখ থেকে বেরিয়ে 'এসেছিল— ; হায় আল্লা! তার পরই রাশি রাশি আঁধারের বুকে ডুবে গিয়েছিল সে।

. জ্ঞান হলে, প্রথমে তার মনে হলো, যেন অতল আঁধারের বুক থেকে আস্তে আস্তে উঠছে সে। কে যেন তাকে ঠেলে ধরছে ওপরের দিকে। কে তাকে বললো,—দেখি, মুখ তোল, জল খাও।

কষ্টে চোখ মেলল খুদাবক্স। দেখল দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দেহ, শ্যামকান্তি এক প্রৌঢ় পাঠান। ঈষৎ রক্তিম দুই চোখে কৌতুক, ক্ষমা আর মমতা নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছেন।

শিশুর মতো বিস্ময়ে তাকালো খুদাবক্স তাঁর দিকে। বুঝলো সে এক চারপাই-এর ওপর শুয়ে আছে। মাথার ওপর ছাদ। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললো,—পিয়াস।

তার মুখে জল দিলেন তিনি। সে উঠে বসতে চাইতেই তাকে শুইয়ে দিলেন সযত্নে। বললেন,—কি খাঁ সাহেব, একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছ? উঠে বসতে ইচ্ছে করছে?···সামাদ্! ছুটতে ছুটতে এল গৌরবর্ণ, ছোটখাটো একজন বৃদ্ধ। পিতলের ঘটিতে কি যেন এনেছে সে। সসম্ভ্রমে বললো—ওস্তাদ!

—আরে কেমন হেকিম তুমি? রুগী কি খাবে এখন? নাকি আজও এলাচদানা আর গরমজল? তোমার কেতাব কি বলে?

—আজ দুধ দেবো হুজুর। খাস বিকানীর মিছরী দিয়ে দুধ জ্বাল দিয়েছি।

কৌতুকভরা চোখে প্রৌঢ় পুরুষ বললেন,—এই জঙ্গলে মহিষ কোথা থেকে পেলে সামাদ? তোমার কেতাবের পাতার মধ্যে বাঁধা ছিল নাকি?

—খাস হেকিমী কায়দায় মিলল হুজুর। কাল গাঁয়ের তালুকদারকে সাপে কেটেছে। নির্বিষ সাপ। তবু খানিকটা চিকিৎসা করলাম। আজ সকালে এসে বলছে,—হেকিম সাহেব, তুমি জমি নাও, বাস করো আমার গাঁয়ে। আমি বললাম, জমি নিতে আমার কেতাবে মানা। তখন ফিরে গিয়ে দুধ, মিছরী, দুটো খাসি পাঠিয়ে দিয়েছে।

—বেশ! বেশ! আর কিছু দেয়নি তো সামাদ?

মনে মনে স্বার্থপর চিন্তা এল খুদাবক্সের। তার যেন মৃত্যু অমন করে না আনেন খোদা। যেন আসে সামনাসামনি, যেন তাকে চেনা যায়। তার বাপদাদার মত্তো সেও যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় আর লড়তে পারে।

বিশদিন ধরে পথ চলে, বিঠৌলীর শিবমন্দিরের ত্রিশূল দেখা গেল। সন্ধ্যারাগে ঝক্‌ঝক্ করছে। নদী পেরিয়ে খেয়াঘাট থেকেই প্রায় ছুটতে লাগল খুদাবক্স। পাঁচ বছর বাদে ফিরছে সে। ধূলো, ঘাস, ক্ষেত আর সেই বাঁধানো কূয়োতলা, সবাই যেন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আমগাছের তলার নিত্যকার মতো চেরাগ জ্বেলে দিয়ে ছেলের জন্যে দোয়া চাইছিল পরী। পাঁচ বছর ধরে রাতদিন কেঁদে কেঁদে পরীর চোখের চাহনি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। একা বসে ছেলের কথা ভেবে ভেবে তার মনটাও হয়েছে পালকের মত হালকা। এক জায়গায় থেমে চিন্তা করে না। হাজারটা চিন্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেরে। একবার খোদার কাছে প্রার্থনা জানায়, একবার স্বামীর কাছে মনে মনে বলে—কেমন করে যেন দুটো প্রসঙ্গই এক হয়ে গিয়েছে তার। মনে মনে স্বামীর কাছে অনেক প্রার্থনা জানায় পরী—ছেলে যেন ভালো থাকে, ছেলে যেন সুস্থ থাকে, কোন অমঙ্গল যেন স্পর্শ না করে তাকে। আজও রোজকার মতো চেরাগটা নামিয়ে রেখে, দরজায় এসে দাঁড়াল পরী। আবছা আঁধারে ক্ষেতের পথ ধরে কে আসছে? তার স্বামীর মতো পরিচিত হাঁটবার ভঙ্গি, তেমনি করে পেছনে ঝাঁকিয়ে কপালের চুল পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে?

তবে খুদাবক্স! সহসা বুকের কাছে হাতটা মুঠো করে চেপে ধরল সে। হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবে বুঝি, এমনই ধড়াস ধড়াস করছে উত্তেজনায়। দুই হাত মেলে, সত্যকাটা গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পাগলের মতো ছুটে চলল পরী। পাঁচ বছর আগে সাহেবের ঘোড়ার খুরের ধাক্কা লেগে বুক তার জখম। ছেলের কথা ভাবতে গেলেই তাজা খুন উঠে আসে গলা দিয়ে, সে-সব কথা ভুলেই গেল সে। ছুটে চলল বিদ্যুৎবেগে, রুক্ষ চুল উড়ে ঝাপ্টাতে লাগল চোখে মুখে।

ছেলের বুকে আছ্‌ড়ে পড়ে কেঁদে উঠল পরী, আর মা-কে জড়িয়ে ধুলোর ওপর বসে পড়ল খুদাবক্স। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

সেই নীরব অশ্রুধারায় তর্পণ হলো আনোয়ারের। সন্ধ্যার নীরব প্রশান্তি ভেঙে ডানা ঝাপ্টে এক ঝাঁক টিয়াপাখী উঠল আকাশে। এক মুঠো পান্নার টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়ল তারা।

ছ য়

পলাশে আবীরে মাতাল, ভরা ফাল্গুনে হোলির সকাল। কেল্লার ওপরে নহবৎখানায় সানাই ধরেছে রাগ হিন্দোল।

কেল্লার পাশে বড় দরোজা। দুইদিক থেকে লৌহ কপাট সবল হাতে টেনে খুলে মস্ত দু'খানা পাথর গড়িয়ে তাতে ঠেকা দেয়া হলো। দু'জন চোবদার সামনের দিকে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানাল। প্রভাতসূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে ঘৌস-এর লাল মুরেঠায়। প্রত্যভিবাদন জানাতে সওয়ারের উষ্ণীষ ঈষৎ টলে গেল চকিতে। তেজে শক্তিতে দুরন্ত ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে শহরে প্রবেশ করলেন গোলাম ঘৌস, সঙ্গে খুদাবক্স।

প্রৌঢ় ঘৌসের কালো চুলে সামান্য পাক ধরেছে। অন্যথায় শালপ্রাংশু সেই বিশাল দেহের কোথাও এতটুকু চিড় খায়নি। সগর্ব স্নেহে তিনি তাঁর তরুণ সঙ্গীকে পাশাপাশি আগলে নিয়ে চলেছেন, আর মাঝে মাঝে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন।

স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যে খুদাবক্সের চেহারাও তারিফ করবার মতো। অবহেলে লাগাম ধরে সে শিশুর কৌতূহলে দশদিক দেখতে দেখতে চলেছে। স্বচ্ছ দুই বড় বড় চোখে শত জিজ্ঞাসা গোলাম ঘৌসের মুখ ছুঁয়ে কেল্লার বুরুজে বুরুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বল্প শ্মশ্রু আর পাতলা গোঁফ নওজোয়ান পাঠান যুবকের মুখে বেশ একটা সুডৌল পরিণতি এনেছে। খুদাবক্স আজ খুব খুশি।

নগরীতে আজ হোলির উৎসব। হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়—

উত্তাল আনন্দের হররা উঠছে পথে-ঘাটে, অঙ্গনে, অলিন্দে। খুনখারাবি রং-এর জনস্রোত রাজপথে বাড়ি খেয়ে অলিগলিতে ঢুকে পড়ছে মহা উল্লাসে—

হাসত জনকপুরকে লোঁগ
কব আহিয়ে রাম দেখব ভর নজরি।

দশজন ঘোড়সওয়ার সামনে পেছনে ভাল্লা উঁচু করে প্রাসাদের দিক থেকে এগিয়ে এল। মাঝখানে একটি ঝক্‌ঝকে পিতল ও রূপোর কাজ করা তাঞ্জামে আবীর, মিষ্টান্ন ও কুঙ্কুমের থালি সাজানো। তাঞ্জাম চলেছে সাহেবের ছাউনিতে রাজার উপঢৌকন নিয়ে।

ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্,— ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে ভালুক নাচাচ্ছে বাজীওয়ালা। গয়না পরো, গয়না পরো,—ভালুক গহনা পরছে হাতে, গলায়, মাথায়। চলো শ্বশুরাল—ভালুক হেলে-দুলে শ্বশুরবাড়ি চলেছে। বিবি গোঁসা করো, রোঁনে লাগ,—অমনি মাটিতে লুটিয়ে মুখ ঘসে কাঁদতে লাগল ভালুক, আর উল্লাসে গুঞ্জন করে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলে-মেয়েরা।

দেখো বেটা রাণীমহাল। ঘৌসের কথায় চমকে তাকায় খুদাবক্স রাণীমহালের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের একতলার জাফরীর ফাঁক দিয়ে কে যেন পিচকিরী ছুঁড়ল। লালে লাল হয়ে গেল গোলাম ঘৌসের শুভ্র পরিচ্ছদ।

আবীর মেখে লাল হয়ে বাহকেরা বয়ে আনল কার স্বর্ণখচিত পাল্কি। সম্ভ্রমে জনতা সরে গেল দু'ধারে। গোলাম ঘৌস অভিবাদন জানালেন নিচু হয়ে। খুদাবক্সকে চাপা গলায় বললেন, বাঈসাহেবা। সসম্ভ্রম ভয়ে মাথা নিচু করল খুদাবক্স।

তাঞ্জামের জরির পর্দা এতটুকু ফাঁক করে ধরে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করলেন রাণী। ইনিই বাঈসাহেবা, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ। পবিত্র হোলির দিনে লছমীতাল মন্দিরে পূজা দিতে চলেছেন।

এবার হালোয়াই পুরা মহল্লা। পথের দু'পাশে সমৃদ্ধ বিপণি। কিন্তু দোকানপাট আজ সব বন্ধ। কেনাবেচা নেই। রাস্তার দু'ধারে শুধু পত্রপুষ্পের মালা, পথ গুলাল রং-এ পিছল, গোলাপ চন্দনের গন্ধে বাতাস মন্থর।

বুন্দেলা নারীর চলনে ঠমক বেশি। কলহাস্যে তারা চলেছে পদব্রজে আঁচলে আবীর নিয়ে। মাথায় পুষ্পাভরণ, পীত রেশমের শাড়ি পাক দিয়ে পরে মরাঠা কুলবধূরা পাল্কিতে চলেছেন দাসী নিয়ে। বাজারতলায় ভিড়ের মাঝখানে চিৎকার করে গাইছে ছেলেরা। আর হাজারটা মিশ্রিত গোলমাল মন্থন করে থেকে থেকেই ঐকতান ধ্বনি উঠছে,—হোলি হ্যায়, হোলি হ্যায়।

ওস্তাদ বলতে বলতে চলেছেন,—দেখো বেটা ঐ বাগিচা দেখ। আশেপাশে কোথাও তুমি ঝাঁসীর মতো সুন্দর শহর দেখতে পাবে না। ঐ দেখো, কমলালেবুর বাগান, গুলবাগিচা।

খুদাবক্স দেখে আর মুগ্ধ হয়। ফাগুয়ার রঙ-এ রঙীন হয়ে ওঠে তার তাজা মন।

শ্যামবর্ণ চেহারার এক স্থূলকান্তি ব্রাহ্মণ কয়টি কিশোর শ্রোতার সঙ্গে হস্তাঙ্গুলির মুদ্রাসহকারে দুরূহ এক তত্ত্বের জট ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিলেন। গোলাম ঘৌস তাঁকে সম্ভাষণ করেন,—কি শাস্ত্রীজী, হলো কি ?

সুপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ প্রত্যভিবাদন করে বলেন,—বড় সমস্যা খাঁ-সাহেব, তোমার গোলাগুলীতে এর কোন সমাধান হবে না।

—বলেই দেখুন না : ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করেন ঘৌস।

ব্রাহ্মণ হেসে বলেন—পজনেশ কি কবিতা লিখেছেন খাঁ সাহেব কিছুতেই ছন্দে মিলছে না। তাই ঝগড়া করতে করতে চলেছি—

কোমলতন ললিত নৈন বসত নিশি বাসর মন
প্যারী হমারী লাজ ফুলওয়ারী হ্যায়—

ঘোড়া থামিয়ে গোলাম ঘৌস হাসতে থাকেন। বলেন—চমৎকার মিলেছে।

—না না এখানে নয়। আগের পয়ারে বলছে,

ভন পজনেশ এক ক্ষত্রাণী সে
হম ভি চুকে—

জাত বলেই তো বেমিল করে দিলো লোকটা। বুঝছেন না, সন্ধ্যাবেলা শোনাবো যখন, রূপা তো কোরিন কিনা জাতে, কেমন

করে বলুন তো মেলাই? বড় সমস্যা খাঁ সাহেব, সে তুমি ঠিক বুঝবে না। তারপর এতদিন কোথায় থাকা হয়েছিল?

—রাজার জন্যে বাঘ পুষছিলাম।

—তারপর?

—নিয়ে এসেছি।

—শিকারখানার জন্যে তো? তা কি বাঘ? বড় না গুল?

খুদাবক্সের দিকে চেয়ে ঘোস বলেন—সেই তো মুস্কিল নারায়ণজী, বুঝতে পারছি না। বাঘের বাচ্চাই হবে। এখন কোন শিকারখানায় যে দেবো—

নারায়ণরাও বলেন,—কপালও করে এসেছিলে খাঁ সাহেব। বাঘ ধরছ, কামান দাগছ, এদিকে পজনেশ যে কি হাঙ্গামা বাধিয়ে রাখল, কি করি বলো তো? প্যারী হমারী রূপা কোরিন হ্যায়, বললে কি আর মেলে? আর লিখলেই হলো? বসে বসে খাতা লিখতিস ইন্দোরে খজুরীবাজারে, সে সব ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখতে গেলি কেন?

চলে গেলেন নায়ায়ণ শাস্ত্রী। বড় রসিক মানুষ। প্রেমিক স্বভাবের জন্যেই মনে তাঁর নানান সমস্যা। সে সব সমস্যার হাত থেকে তাঁর মুক্তির আশাও নেই। আর মুক্ত অবস্থাটা তাঁর হয়তো খুব পছন্দও নয়।

বেলা বাড়ছে। বাতাস গরম হয়ে উঠেছে। পথে পথে হোলির কোলাহল উঠছে উন্মত্ত তরঙ্গের মতো। চারপাশে গুলাল রঙ আনন্দের হররা আর রায়সো গানের সুরে ভরপুর। খুদাবক্সের মনেও সেই আনন্দের ছোঁয়াচ লাগে। ঘোড়ার পিঠে তুলকি চালে চলতে চলতে সেও গুন-গুন করে গান গাইতে লাগল।

সামনেই এক বিশাল দরোজা। মনের খুশিতে তার ভেতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিতেই সামাল সামাল, হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠল লোকে। কি হয়েছে কিছু বোঝবার আগেই খুদাবক্সের ঘোড়া সামনের দু'খানা পা শূন্যে তুলে ঘুরে গিয়ে অতিকষ্টে সামলে নিলো, আর সামনে তাঞ্জাম সমেত বাহকেরা হুড়মুড় করে পিছু হটে গেল। বোঝা গেল, রক্ষে হয়ে গেল একটি বিপর্যয়।

একটি মাত্র নিমেষ কিন্তু মানুষের হৃদপিণ্ডে তার জের কাটতে

বহুক্ষণ সময় লাগে। তাঞ্জামের আরোহিণী অস্ফুট আর্তনাদে দু'আঙুলে পর্দা সরালেন। আর সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল খুদাবক্স। দেখল, চাঁদের মতো পাণ্ডুর গৌরবর্ণা, ঈষৎ লম্বা মুখে তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ, রক্তগোলাপে রচিত ওষ্ঠাধর, চম্পকবর্ণ পেশোয়াজে ও ওড়নাতে সেই গৌরতনু বেষ্টিত, কপালে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বেণীর বন্ধন অমান্য করে ছড়িয়ে পড়েছে। আরোহিণীর বিস্মিত চোখ খুদাবক্সের চোখে বাঁধা পড়ল। ভ্রূকুটি করলেন তিনি।

চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একখানি ছবি অনভিজ্ঞ যুবক অশ্বারোহীর মনের পটে অক্ষয় রেখায় ধরা পড়ল। রেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল রঙ। প্রাণবন্ত হয়ে উঠল সেই ছবি।

তাঞ্জামের পর্দা টেনে দিলেন বিজয়িনী। মহাকালের প্রসন্ন দক্ষিণপাণি-বিচ্যুত অমর একটি ক্ষণ নিমেষে ফুরিয়ে গেল। খুদাবক্স অশ্ব সংযত করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। তাঞ্জাম চলে গেল।

সপ্রশংস কণ্ঠে দ্বাররক্ষী বললো,—মোতি! মোতিবাঈ।

মোতি, দুই অক্ষরের একটি নাম বুকে নিয়ে খুদাবক্স সেদিন কেল্লায় ফিরল।

পরে, অনেক পরে, সেই ছবির সঙ্গে উপমা মিলিয়ে অনেক ছবি তার মনে এসেছে। অনেক 'শ্যের,' অনেক 'গুল', অনেক গানের কথাই মনে হয়েছে তার। কিন্তু সেই ছবির পাশে অন্য কোন ছবি তার কাছে সুন্দরতর বলে মনে হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা। নাট্যশালায় হাজার বাতির ঝাড় জ্বলছে। মেঝেতে লাল গালিচা পাতা, তাতে পা ডুবে যায় চলতে গিয়ে। সামনে সারি সারি কুর্সি। অনেক সমঝদার লোক বসে অপেক্ষা করছেন। একটু পরে শুরু হবে নাচ গান।

শীষঘরে অঙ্গরাগ শেষ করে বসেছিল মোতি। মন তার বে-দিশা। অন্যতমা নর্তকী জুহী মোতির পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়াল। অন্যদিন মোতি কত কথা কয়। চঞ্চল চোখে ভ্রূভঙ্গিমায় কত নাচের বোল আওড়ায়। কিন্তু আজ মোতি একটা কথাও

বলছে না। হাসিখুশি একটা লোক মনমরা হয়ে চুপচাপ থাকবে, জুহীর ভালো লাগে না। বলে—আকাশ পাতাল কি' ভাবছ অমন!

জবাবটা আসে সুগন্ধ বাতাসের ভিজে ঝাপটার মতো,—হ্যাঁরে জুহী, আজ সকালে আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল রে!

মোতির কথায় প্রাণ পায় জুহী। তাহলে তেমন কিছুই ব্যাপার নয়। চটুল হেসে বলে—সখী চুলও বাঁধোনি কাজলও পরোনি; গেলে আর অমনি স্নান সেরে এলে লছমীতাল থেকে। তাই বলি দেখাচ্ছিল যেন ঠিক রাগিণী আশাবরী,

শ্রীখণ্ডে শৈল শিখরে শিখিপুচ্ছে বস্ত্রা
মাতংগমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী—

—কেন কি হয়েছে?

—আবার প্রিয় প্রতীক্ষায় চকিতনয়নাও বটে—

—চুপ চুপ। অধরোষ্ঠে অঙ্গুলিশাসনে চুপ করতে বলে মোতি জুহীকে।

জুহী কিন্তু বারণ মানে না। চোখ নাচিয়ে ভ্রূ বাঁকিয়ে বলে—কেন চুপ করবো বলো? তুমি হলে বুন্দেলখণ্ডের সেরা রূপসী মোতিবাঈ। তোমাকে দেখলেই লোকে চকিত হবে; আর তোমার মন যে পাবে—

অতর্কিতে নাট্যশালার দাসী এসে ঢুকল শীষঘরে। হাত নাচিয়ে জানাল, আজ বহু সমঝদার লোক এসেছে নাচ দেখতে। সবাই অপেক্ষা করে বসে আছে। শিগগির যাও, জলদি করো।

ঘুঙুরের নিক্কণ তুলে ত্রস্তে চলে গেল মোতি। নাট্যশালার পর্দা আস্তে আস্তে সরে গেল।

মোতি নয়, শ্রীরাধিকা। মাথায় সোনালী ওড়না, পরনে ঘননীল ঘাগরা। বঙ্কিম ঠমকে কলসী কাঁখে নিঃসীম আঁধারে যমুনায় জল আনতে চলেছেন। রাজভয় আছে, লোকভয় আছে, তাছাড়া ঘরে রায়বাঘিনী ননদ,—তাই কুণ্ঠিত ভীরু পদক্ষেপ। গৌর সুন্দর পায়ে রূপোর জিঞ্জিরা, ক্ষীণ রেলা তুলে একটি সরল রেখায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল মোতি মঞ্চের মাঝখানে। দুলে উঠল কণ্ঠহার—মতির মালা। মরালগ্রীবা ভঙ্গিমায় কর্ণাভরণে

বিজুরী খেলে গেল। সারেঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে মোতিও পুকার দিয়ে উঠল,···প্রেম সে বাওরী রে···। রাধা ভয়ি প্রেম সে বাওরী—।

কাঁখের কলসী মাটিতে নামিয়ে রেখে গান করতে করতে রূপাতীত লোকে চলে গেল মোতি। মোতি আর এখন মোতিতে নেই।

সারাদিন কোকিল ডেকেছে, আবীর খেলেছে সখীরা। রাধা তখন ঘরে ছিল। প্রিয় তাকে ডাকেনি তাই সে বাইরে আসেনি। এখন এই নিশীথে সে বাঁশি শুনে আকুলপারা বেরিয়ে এসেছে, যমুনার তীরে একা একা পথ খুঁজে ফিরছে। কিন্তু কোথায় তার সেই প্রিয় সখা? তবে কি এই পূর্ণিমারজনী ব্যর্থ হয়ে যাবে? রাধিকার অন্তরে যে আজ অফুরন্ত আবীরের উৎস, কুঙ্কুমের সঞ্চয়! সেই রঙ তার প্রিয় কি গ্রহণ করবে না? তাই মোতি গাইছে;··· প্রেম সে বাওরী রে······।

গানের সুরে সুরে আর নাচের মুদ্রার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে শুনছিল আর দেখছিল যারা তাদের যেন কোন কল্পলোকে নিয়ে গেল মোতি।

ভালো লাগল সকলেরই কিন্তু পাগল হলো একা খুদাবক্স। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল,—বহুৎ খুব!

নাট্যশালায় গণ্যমান্য রাজপুরুষদের সামনে নর্তকীকে বাহবা দেবার রেওয়াজ ছিল না। তাই মোতি নাচ থামিয়ে ঘুরে তাকাল। দেখল, সকালের সেই অশ্বারোহী।

খুব বেমানান হয়ে গিয়েছে মন্তব্য। রাজপুরুষদের সামনে এটা প্রত্যক্ষ বেয়াদবির সামিল। সকলেই খুদাবক্সের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। খুদাবক্সের নাক কান লাল হয়ে উঠল অপমানে। চকিতে সে নাট্যশালা থেকে উঠে চলে গেল। একটু পরেই আবার শুরু হলো নৃত্যগীত, রাজার নির্দেশে।

দোলপূর্ণিমার মধ্যরজনী। মোতির শয়নকক্ষে বাঁধভাঙা চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে। আর তারই মাঝখানে শুভ্রবসনা মোতি মূর্তিমতী রাগিণীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালে রাজপুত

চিত্রকরের আঁকা পট। বেদীতে তানপুরা। কুলুঙ্গীতে ঘুঙুর।

মাটিতে আজ আকাশের চাঁদ গলে গলে পড়ছে। পৃথিবী মায়াময়। ধীর পদক্ষেপে ঝরোকায় এসে দাঁড়াল মোতি।

দূরে কোন এক পান্থ মিঠে গলায় গান গাইছে, নিদ নহি আবত সৈঁয়া।—আঁখিপাতে ঘুম নেই।

মোতির চোখেও আজ ঘুম আসছে না।

ঘুম নেই, আছে শুধু ক্লান্তি। পুষ্পবল্লরীর মতো নিজেকে বিছিয়ে দিলো মোতি মাটিতে। উপুড় হয়ে শুয়ে কাত ফিরে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল অনিমিখ।

নাচনেওয়ালী সে। তবু তার যৌবন আজও সন্থ ফোটা ফুলের মতো অনাঘ্রাত। যে গুলবাগিচায় কোন বুলবুল এসে বসেনি, তারই মতো একান্তে প্রতীক্ষা করে বসে আছে মোতি।

মনে পড়ল মোতির সেই নওজোয়ান অশ্বারোহীর মুখ। সকালে ও সন্ধ্যায়, ত্ন' ত্ন'বার দেখেছে তাকে। ঘুরে ফিরে তার কথাই মনে পড়তে লাগল মোতির বার বার। কে সে? কোথায় ঘর? কেন সে অমন করে তাকাল? নাচের জলসায় আদব ভুলে গিয়ে কেন সে আজ রাজার সামনেই তাকে তারিফ করে বাহবা দিয়ে উঠল?

মোতির মনে আজ শুধু তার কথাই জেগে আছে। জেগে আছে তার থেকে থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। সেই ঝঙ্কারে আজ মোতি অপরূপ রাগরাগিণী শুনতে পাচ্ছে।

মাটির বুকে নিঃশ্বাস ফেলে মোতি অস্ফুটে বলে ফেলে,—নজরোসে নজর মিলি তো দিল হি বাওরী—

কথাটা বলে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করে মোতি। এমন নিলাজ হয়ে কার কথা ভাবছে সে? 'শ্যয়ের' পাঠাচ্ছে কার উদ্দেশে?

ঘুম এল মোতির চোখে অনেক রাতে। আর তার অকলঙ্ক সুন্দর মুখ চেয়ে জেগে রইল চাঁদ।

সা ত

জুঁই-চামেলীর গন্ধ বিভোর উত্তাল বাতাসের তরঙ্গে মধুর এই রাত। হোলির পক্ষকাল ব্যাপী উৎসবের আজ শেষদিন। শুক্লপক্ষ থেকে কৃষ্ণপক্ষে এসেছে চাঁদ। রজনী এসেছে মধ্যযামে। নগরীর কলকোলাহল স্তিমিত, আলোতে ছায়াতে রহস্যময় নির্জন পথ।

কেল্লার পূর্বপ্রান্তে ময়দানে আসর বাঁধছে কয়জন। কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে আরাম করে বসেছেন ঘোসসাহেব। সহরে মুজরা নিয়ে এসেছিল নটুয়াদল। তাদের বায়না করে নিয়ে এসেছেন রঘুনাথ সিং রিসালাদার। ফৌজী ছাউনিতে রাম-চরিতের গান হবে।

সিপাহীরা বসেছে ভিড় করে। সামিয়ানার নিচে বড় বড় মশাল মাটিতে গুঁজে রোশনাই হয়েছে জোর। ধুলো উড়িয়ে মস্ত শতরঞ্চি বিছিয়ে দিচ্ছে দু'জন সিপাহী।

আসল জটলাটা বসেছে ঘোসের আশেপাশে। সিদ্ধির শরবতের তত্ত্বাবধানে আছেন স্বয়ং ঘোসসাহেব। আজ সকালে রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুমতি আনতে গিয়েছিলেন তিনি। বন্দোবস্ত করে ফরমায়েশী মালাই আর গোলাপজল আনবার দায়িত্বও তাঁরই ওপর ছিল। বাবাসাহেব সমঝদার লোক। ঘোসকে নাকি তিনিই বুদ্ধি দিয়েছেন এলাচের আরক খানিকটা মিশিয়ে দিতে।

ফলটা কিরকম দাঁড়ায় দেখবার জন্যে সকলের মুখের দিকে চাইলেন খাঁ-সাহেব। কিন্তু পেয়ালা মুখে তোলবার আগে সকলেই চুপচাপ। ঘোস বললেন—ব্যাপার কি? আপনাদের কি চুমুক দেবার মেজাজ আসছে না? কিছু গলতি হয়ে গিয়েছে?

তখন ঝুঁকে পড়ে রঘুনাথ সিং বললেন—গোস্তাকি মাফ করবেন খাঁ-সাহেব, কেমন যেন ভরসা হচ্ছে না। আপনি পথ দেখান। সেই দশেরার ব্যাপারটা আর কি ভুলতে পারছে না

এরা।—বলেই হেসে ফেললেন তিনি। হেসে ফেললেন ঘোসও, আর প্রাণখোলা একটা হাসির ঢেউ বয়ে গেল আসর দিয়ে।

ঘোস দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—ভাইসব, একবার পাঁচবছর আগে দশেরার পর নিজেরা খানাপিনা করতে গিয়ে নতুন কায়দায় রান্না বাৎলেছিলাম আমি, তাতে নিমকের কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—আর দুধের ব্যাপারটা?—খেই ধরে দিলেন রঘুনাথ সিং। হাসির হররা ফেটে পড়ল।

ঘোস বললেন—দুধের ব্যাপারে কামাল করেছিল বাহ্‌রাম, একচোখো শয়তান, কিন্তু সেই বদ্‌নাম যদি এখনো নাছোড়বান্দা হয়ে আমার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে, তো তাকে আমি আজ এই রাতে সিদ্ধির শরবতের ভেতর দিয়ে খতম করলাম। মরতে হয় তো—

বলে ফিরে দাঁড়িয়ে টেনে তুললেন বাহ্‌রামকে। বললেন—মরতে হয় তো এই মরুক।

চুমুক দিয়ে খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বাহ্‌রাম—আরে ব্যস্‌ ব্যস্‌ ওস্তাদজী কামাল করেছেন ভাই। একবার দেখ।

আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে ফিরতে লাগল সিদ্ধির পেয়ালা। খুদাবক্স সাগর সিংকে কানে কানে বললো—বাহ্‌রামের ব্যাপারটা কি?

সাগর সিং বললো—বাহ্‌রামের কানের কাছে বলো না, হঠাৎ চটে যাবে। সেবার এমনি ধারাই হঠাৎ বাজী ফেলল বাহ্‌রাম, ক্ষেতে গরু চরছে, তাকে ধরে দুধ দুয়ে আনবে। বৈশাখ মাসের গরম। বিল্‌চারী থেকে ফিরছি আমরা পঁচিশজন। যেমন গরম চারপাশ, তেমনি গরম ওস্তাদের মেজাজ। বিকেল নাগাদ রান্নাবান্নার দিশে করা গেল, ভাগ্যগুণে একটা হরিণ মারলেন কুমার রঘুনাথ সিং, সকলে আরাম করে বসলাম। বাহ্‌রাম তো যেমনি গোঁয়ার তেমনি একরোখা, অথচ মনটা ওর ভারী সাচ্চা। হঠাৎ ক্ষেপে গেল, ওস্তাদের তক্‌লিফ হয়েছে, ও দুধ খাওয়াবে তাঁকে। আমাদের সঙ্গে বাজী ফেলে সে চলল বালতি নিয়ে। তারপর ফিরে এল শুধু শুধু।

খুদাবক্সের কানটা টেনে সাগর বললো—ভাই, তার একটাও গাই ছিল না, সব বলদ। আহীরদের গাড়িতে জুত্‌বার বয়েল সব।

হাসতে গিয়ে বিষম খেয়ে চেপে গেল খুদাবক্স, দেখে বাহ্‌রাম খাঁ তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে আছে। ঘোস তার দিকে সিদ্ধির মেজাজে আরক্তিম সস্নেহ চোখে তাকালেন। বললেন—গান শুরু হবে। মেজাজ ঠিক আছে তো ?

সম্মতি জানাল খুদাবক্স স্মিত হেসে। মন মেজাজ তার খুব ভালো আছে। সেই হোলির শুরু থেকেই মনটা তার অন্যরকম হয়েছে। ছুনিয়ার রঙই সুন্দর হয়ে গিয়েছে তার চোখে। আসরভরা মানুষ, কথায়-বার্তায় ব্যস্ত। এতজনের মধ্যে বসে খুদাবক্সের মনে হলো এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করছে সে। মনের কোন গহনে যেন রয়েছে সেই আনন্দের মণিকক্ষ ! কার সপ্রসন্ন নয়নের আলোতে যেন তার দরজা এতটুকু খুলেছে ! এ এক ছুর্লভ অভিজ্ঞতা !

পেটাঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। আসরে ঢুকল সূত্রধর, পরিধানে সাদা কুর্তা, ধুতি ও উত্তরীয়। গলায় রূপোর মালার সঙ্গে গাঁথা রুদ্রাক্ষ, কানে কুণ্ডল। ঢুকে করজোড়ে সকলকে অভিবাদন করে সে উচ্চ কণ্ঠে প্রস্তাবনাগীত শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ হলো জমায়েত।

সুললিত কণ্ঠ গায়কের। সেই পুরনো রামসীতার গানই সে গাইতে লাগল ভক্তিভরে। সূর্য-চন্দ্র, শিব, কৃষ্ণ, চতুর্দিক, দশকোণ এবং শ্রোতাদের উদ্দেশে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করল সে। তারপর ক্ষমা চাইল, পাপমুখে সে পৃথিবীতে নররূপী ভগবান রামচন্দ্রের নামগান করছে বলে। শুরু হলো তুলসীদাসী পদ। রাম বিবাহ করে অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন। কাঠের ঘোড়ার পিঠে নাচতে নাচতে এলেন লক্ষ্মণ। রাম আর সীতা ঢুকলেন মস্ত জরির ছাতার নিচে। ছাতা ধরে ঢুকল প্রহরী। তখন সূত্রধর উচ্চকণ্ঠে বললেন—

'জনকপুরী সে রামচন্দ্রজী সীতা লে কর আয়েঁ
ধুমধাম কর্‌ শোর মচাওকে সব্‌সে রামগুণ গায়ে'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আনন্দিত পুরবাসীর নৃত্য। বাব্‌রি চুল কপালে ঝুলিয়ে দ্রুত সারেঙ্গী বাজাতে লাগল সারেঙ্গীবাদক। আসর জুড়ে আহা আহা উঠল। ঘোড়াটাকে ছুল্‌কি চালে নাচিয়ে

লক্ষ্মণও নাচে যোগ দিলেন। রাম সীতা অটল গাম্ভীর্যে চেয়ে রইলেন। উৎসাহে সূত্রধর লাফিয়ে উঠতে লাগল।

সামান্য শরবত খেয়েছে খুদাবক্স। কিন্তু মগজ পর্যন্ত নেশা পৌঁচেছে বলে বোধ হলো। গান আর নাচই সে দেখছিল, তবে সে অন্য এক আসর, ভিন্ন এক গায়কী। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে সে একটু একটু করে পিছু হঠতে লাগল। কিছুদূর এসে দড়ির ঘেরটা পেরিয়ে বাইরে চলে এল। তার অনুপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করবে বলে মনে হলো না। ঘোস একমনে দেখছেন তাকিয়া কোলে নিয়ে। সাগর সিং একমনে সিদ্ধির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আসর পিছনে ফেলে চলে এল খুদাবক্স।

পাথর বাঁধানো পথের পাশে বাড়িগুলোর ছবি ছায়া হয়ে পড়ে আছে। উৎসবক্লান্ত নগরী ঘুমিয়ে পড়েছে ঘরে ঘরে। রাজউদ্যান থেকে এক ঝলক ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

মায়াময়ী নিশিথিনী। অভিসারিকার মতো তার নিঃশব্দ পদসঞ্চার। কোন আকর্ষণে সে খুদাবক্সকে পথে পথে টেনে নিয়ে চলল, এ পথ, সে পথ, বাজারের চত্বর ঘুরিয়ে। ভিখারী ঘুমোচ্ছে মন্দিরের সামনে। চার-পাঁচটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, মালিকরা পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পঞ্চকুঁয়ার পাশের নিমগাছটা অজস্র মুকুল ও মঞ্জরীতে সহসা সুন্দর হয়ে উঠেছে, তার পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার টুকরো ঝলমল করছে। সেখানে ক্ষণিক দাঁড়াল খুদাবক্স। অনেক দূরে কার ক্লান্তকণ্ঠে গানের কলি শোনা যাচ্ছে। গানের কথা বোঝা যায় না, তবে সুরটা বাতাসের তরঙ্গে ভেঙে ভেঙে চন্দ্রালোকিত নগরীর বুকে টুকরো টুকরো হয়ে জোনাকির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এমন রাতে তাহলে আরো কেউ জাগে? নিশ্চয় তাকেও খুদাবক্সের মতো নিশিতে পেয়েছে।

লছমী দরোজার সামনে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রহরী। সেই রাস্তা ধরল খুদাবক্স। পথের দুই পাশে মুকুলভারে আনমিত কিশোর আমগাছ। মন্দির উদ্যান থেকে জুঁই-চামেলী-চাঁপা ও বেলফুলের গন্ধ নিয়ে এসে সেই অপরূপ আলপনা আঁকা পথের ওপর আবেশ সৃষ্টি করেছে। হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

আকাশের ছায়া বুকে ধরে স্থির হয়ে আছে জল। তীরে দু'তিনটি কিস্তি বাঁধা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দড়ি খুলে দিয়ে বৈঠা তুলে নিলো খুদাবক্স। রোজকার হিসেব চোখ থেকে হারিয়ে গিয়েছে তার। এমনি রাত রোজ আসে না। আজ তাই বেহিসেবী হয়ে গিয়েছে খুদাবক্স।

জলে কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে বিরামমঞ্জিল। সুরক্ষিত উদ্যানবেষ্টিত জল-মহল। একটা মস্ত বটগাছের ঝুরি নেমে গিয়েছে জলে। সেখানে কিস্তি বেঁধে বটগাছের রেখায় রেখায় তরঙ্গায়িত গুঁড়িতে পা রেখে উঠল খুদাবক্স।

একটু বাগান, কিছু সিঁড়ি, একটি চত্বর, আবার একটু বাগান। তারপর তৃণাকীর্ণ জমি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে জলের দিকে। সেখানে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স, আর চকিতে বিদ্যুৎ ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল কে কালোপাথরের সিঁড়ির ওপাশ থেকে। সেই সন্ত্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে সহসা সমস্ত আকাশ-বাতাস-দুনিয়া দুলে উঠে স্থির হয়ে গেল খুদাবক্সের চোখে। অবগুণ্ঠন টানতেও ভুলে গেল মোতি। ললিত পঞ্চমের সুরে বাঁধা সেই কম্প্রমুহূর্ত। সময় আর সময় রইল না! পল ও অনুপল, মাত্রাগুলি যেন পদ্মের মতো ফুটে উঠে সুরভিতে ভারাক্রান্ত করল সময়! ওড়না টেনে দিলো মাথায় মোতি। নিজেকে তিরস্কার করল খুদাবক্স। মাথা নিচু করল সম্মান জানিয়ে। বললো—দুইবার অজান্তে গোস্তাকি করেছি। বড় লজ্জায় আরজি পেশ করছি, মাপ করুন।

কইতে গিয়েও কথা খুঁজে পেলো না মোতি। তারপর বললো—কেন ?

—সেই সন্ধ্যায় বে-আন্দাজ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। জবান আমার বশে ছিল না।

অনেক লজ্জা জয় করে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল মোতি। বললো—আমার স্মরণে নেই।

—আপনার মেহেরবানি।

স্বল্প হাসল মোতি। তার নীরবচিন্তা যাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গুঞ্জরন করছিল সেই তার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দুনিয়ার লজ্জা তাকে ঘিরে ধরেছে। কথা কইতে বাধছে। দুরুদুরু করছে

বুক। অজানিত এই চকিত সাক্ষাৎ যেমন মধুর, তেমনি বিপজ্জনক।

তার চিন্তাকে ধরে খুদাবক্স বললো—কৌতূহল মাপ করবেন, কিন্তু আপনি কি একা এসেছেন?

ওড়নার ফাঁকে একবার চুরি করে খুদাবক্সকে দেখে মোতি বলে —এই বাগান সুরক্ষিত। এখানে আমি কখনো কখনো এসে থাকি, প্রহরী তা জানে। তাই কোন ভয় নেই। কিন্তু আপনি?

—আমি গুলাম ঘোসের তোপখানার হাবিলদার, সহরে নতুন এসেছি।

মোতি শোনে আর মুখটিপে হাসে।—নতুন যে সে তো কথা বলার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়। হাবিলদার অথচ কথায় বলায় সে হুকুমনামা নেই।

আলাপ পরিচয়ের বিনিময়ে সহজ হলো পরিবেশ। ঘাটের সোপানে বসল মোতি। দূরে বসল খুদাবক্স। অবাধ্য কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে দেখল তার স্বপ্নচারিণীকে। এই মুখ তাকে উন্মনা করেছে, এই চোখে তার হৃদয় পড়েছে বাঁধা, এই কণ্ঠের সঙ্গীতে তার হৃদয়ের তারে তারে লেগেছে টান। তাই এখন, এমনি সময়, অপরাধ হলেও বারবার চেয়ে না দেখে তার উপায় নেই।

আজ সন্ধ্যায় কেন প্রসাধন করেছিল মোতি এমন করে কে বলবে। বড় যত্নে বেণী রচনা করেছিল রূপোর ফুল গেঁথে, সাদা রেশমের গাঢ়ারা পরেছিল। যত্ন করে বেছে নিয়েছিল আকাশনীল রঙের জরির ফুল বসানো ওড়না। চোখে সুর্মা টেনে দিয়ে সযত্নে সিঁথিতে পরেছিল মুক্তার কাশ্মীরি গহনা, পায়ে পরেছিল নাগরা।

প্রসাধন তার সার্থক হলো আজ। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সময়ের হিসেব হারাল।

শৈশব থেকে গুরুর পায়ের কাছে বসে সুরসাধনার শিক্ষা নিয়েছে মোতি, মন প্রাণ দিয়ে আরাধনা করেছে সঙ্গীতের। এই মুহূর্তকে সার্থক করে চকিতে তার মনে ঝঙ্কৃত হলো—

যব প্রীতম ঘর আয়ে—

অনেক ধ্যানে, সাধনায়, আরাধনায় আর আলাপনেও যে পূর্ণতা পায়নি মোতি, যে আকুলতা তার মেটেনি, আজ তারই

চরিতার্থতা যেন অনুভব করছে সে। পরম তৃপ্তিতে কোমল চরণ জলে ডুবিয়ে বসল মোতি।

চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিম গগনে।

হঠাৎ মোতি বললে—এবার কিন্তু ফিরতে হবে আমার।

—সহরে কি কখনো সাক্ষাৎ করা যায় না?

—না। সন্ত্রস্ত মোতি বলে—আপনি তো জানেন না কত নিষেধ, কত শাসনে কয়েদ আমি।

একটু দুঃসাহসী হয় খুদাবক্স। বলে—কয়েদ তো আমরা সকলেই। সকলেই তো কয়েদ হতে চায়, যদি মালিকের হৃদয় কোমল হয়। আর ছুটিই কি সব সময় মেলে?

মখ্‌তবে ইশ্‌ক-কা দেখা য়ে নিরালা দস্তুর
ছুট্টি উনকে নহিঁ মিলা, ন লুৎফ-কা কসর হুয়া—

—তার মানে?

মোতির চোখে চোখ রেখে খুদাবক্স বলে যায়, প্রেমের মখ্‌তবের আশ্চর্য নিয়ম এই যে, না ছুটি মেলে, না আনন্দের অভাব হয়।

খুদাবক্সের এই স্পর্ধাকে তিরস্কার করবে ভাবে মোতি, কিন্তু তার কৌতুকভরা চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সকৌতুকে। খুদাবক্সও হাসে।

হঠাৎ কোলাহল আসে সহরের দিক থেকে। মনে হয় মশাল নিয়ে লোকজন এদিকেই আসছে। চকিত হয়ে ওঠে মোতি। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে—কি হবে?

স্বীয় আচরণের দুঃসাহসিকতা তখন খুদাবক্সকেও সচেতন করেছে। মোতির হাত টেনে ধরে সে কিস্তিতে তোলে। তারপর জোরে জোরে বৈঠা টানতে থাকে। বলিষ্ঠ হাতের চালনায় নৌকো চলে আসে গভীর জলে। বিপদের সম্ভাবনায় বুক কাঁপছে, তবু মোতি একটু হাসে। খুদাবক্স বলে—কোন ভয় নেই।

ঘাটে পৌঁছেই নেমে পড়ে মোতি। বাঁধানো শিরীষগাছের গোড়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তার বৃদ্ধ সঙ্গী, মন্নু সারেঙ্গীয়া। তাকে ডেকে তোলে মোতি। তারপর চকিতে চলে যায়। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

বুক। অজানিত এই চকিত সাক্ষাৎ যেমন মধুর, তেমনি বিপজ্জনক।

তার চিন্তাকে ধরে খুদাবক্স বললো—কৌতূহল মাপ করবেন, কিন্তু আপনি কি একা এসেছেন?

ওড়নার ফাঁকে একবার চুরি করে খুদাবক্সকে দেখে মোতি বলে—এই বাগান সুরক্ষিত। এখানে আমি কখনো কখনো এসে থাকি, প্রহরী তা জানে। তাই কোন ভয় নেই। কিন্তু আপনি?

—আমি গুলাম ঘোসের তোপখানার হাবিলদার, সহরে নতুন এসেছি।

মোতি শোনে আর মুখটিপে হাসে।—নতুন যে সে তো কথা বলার ভঙ্গীতেই বোঝা যায়। হাবিলদার অথচ কথায় বলায় সে হুকুমনামা নেই।

আলাপ পরিচয়ের বিনিময়ে সহজ হলো পরিবেশ। ঘাটের সোপানে বসল মোতি। দূরে বসল খুদাবক্স। অবাধ্য কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে দেখল তার স্বপ্নচারিণীকে। এই মুখ তাকে উন্মনা করেছে, এই চোখে তার হৃদয় পড়েছে বাঁধা, এই কণ্ঠের সঙ্গীতে তার হৃদয়ের তারে তারে লেগেছে টান। তাই এখন, এমনি সময়, অপরাধ হলেও বারবার চেয়ে না দেখে তার উপায় নেই।

আজ সন্ধ্যায় কেন প্রসাধন করেছিল মোতি এমন করে কে বলবে। বড় যত্নে বেণী রচনা করেছিল রূপোর ফুল গেঁথে, সাদা রেশমের গাঢ়ারা পরেছিল। যত্ন করে বেছে নিয়েছিল আকাশনীল রঙের জরির ফুল বসানো ওড়না। চোখে সুর্মা টেনে দিয়ে সযত্নে সিঁথিতে পরেছিল মুক্তার কাশ্মীরি গহনা, পায়ে পরেছিল নাগরা।

প্রসাধন তার সার্থক হলো আজ। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে সময়ের হিসেব হারাল।

শৈশব থেকে গুরুর পায়ের কাছে বসে সুরসাধনার শিক্ষা নিয়েছে মোতি, মন প্রাণ দিয়ে আরাধনা করেছে সঙ্গীতের। এই মুহূর্তকে সার্থক করে চকিতে তার মনে ঝঙ্কৃত হলো—

যব প্রীতম ঘর আয়ে—

অনেক ধ্যানে, সাধনায়, আরাধনায় আর আলাপনেও যে পূর্ণতা পায়নি মোতি, যে আকুলতা তার মেটেনি, আজ তারই

চরিতার্থতা যেন অনুভব করছে সে। পরম তৃপ্তিতে কোমল চরণ জলে ডুবিয়ে বসল মোতি।

চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিম গগনে।

হঠাৎ মোতি বললে—এবার কিন্তু ফিরতে হবে আমার।

—সহরে কি কখনো সাক্ষাৎ করা যায় না ?

—না। সন্ত্রস্ত মোতি বলে—আপনি তো জানেন না কত নিষেধ, কত শাসনে কয়েদ আমি।

একটু দুঃসাহসী হয় খুদাবক্স। বলে—কয়েদ তো আমরা সকলেই। সকলেই তো কয়েদ হতে চায়, যদি মালিকের হৃদয় কোমল হয়। আর ছুটিই কি সব সময় মেলে ?

মখ্‌তবে ইশ্‌ক-কা দেখা য়ে নিরালা দস্তুর
ছুট্টি উনকে নহিঁ মিলা, ন লুৎফ-কা কসর হুয়া—

—তার মানে ?

মোতির চোখে চোখ রেখে খুদাবক্স বলে যায়, প্রেমের মখ্‌তবের আশ্চর্য নিয়ম এই যে, না ছুটি মেলে, না আনন্দের অভাব হয়।

খুদাবক্সের এই স্পর্ধাকে তিরস্কার করবে ভাবে মোতি, কিন্তু তার কৌতুকভরা চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে সকৌতুকে। খুদাবক্সও হাসে।

হঠাৎ কোলাহল আসে সহরের দিক থেকে। মনে হয় মশাল নিয়ে লোকজন এদিকেই আসছে। চকিত হয়ে ওঠে মোতি। শঙ্কিত কণ্ঠে বলে—কি হবে ?

স্বীয় আচরণের দুঃসাহসিকতা তখন খুদাবক্সকেও সচেতন করেছে। মোতির হাত টেনে ধরে সে কিস্তিতে তোলে। তারপর জোরে জোরে বৈঠা টানতে থাকে। বলিষ্ঠ হাতের চালনায় নৌকো চলে আসে গভীর জলে। বিপদের সম্ভাবনায় বুক কাঁপছে, তবু মোতি একটু হাসে। খুদাবক্স বলে—কোন ভয় নেই।

ঘাটে পৌঁছেই নেমে পড়ে মোতি। বাঁধানো শিরীষগাছের গোড়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তার বৃদ্ধ সঙ্গী, মন্নু সারেঙ্গীয়া। তাকে ডেকে তোলে মোতি। তারপর চকিতে চলে যায়। কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায়।

খুদাবক্স চলতে থাকে কেল্লার দিকে। আসর থাকতে থাকতে তাকে পৌঁছতেই হবে। আসর ছেড়ে সে যে উঠে এসেছিল তা কেউ বুঝেছে কিনা কে জানে। মোতি নিশ্চয় নিরাপদে বাড়ি পৌঁচেছে। আসরের আলো দূর থেকে দেখা যায়। গানও শোনা যায় বেশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খুঁদাবক্স।

পুণ্যরামচরিত গান সমাপন হয়েছে। দশমুণ্ডধারী লঙ্কাপতি রাবণকে হত্যা করে রাম সীতাকে নিয়ে ফিরেছেন অযোধ্যাপুরী। সূত্রধর করজোড়ে গীতসমাপনে সমবেত জনতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন।

যে কিশোর বালক তিনজন রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সেজেছিল, তারা হাসিমুখে পিতলের একখানা তাম্বুলদান নিয়ে এল। দর্শকদের সামনে ধরল পেতে। ঝন্‌ঝন্ করে দর্শনী পড়তে লাগল। খাজাঞ্চি জ্বালানাথের ইঙ্গিতে একখানা নতুন থালায় ধুতি চাদর ও টাকা বয়ে আনল একজন। নজরানা তুলতে তুলতে খুদাবক্সের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটি। হেসে বাড়িয়ে দিলো হাত। আসরের সবাই সকৌতুকে খুদাবক্সের দিকে চাইল।

দীর্ঘছন্দ সুঠামদেহ, ধপ্‌ধপে সাদা যোধপুরী ও পেশোয়ারী কুর্তা পরনে, তার ওপর টকটকে লাল জমিয়ারের বাণ্ডি, মাথায় মুরেঠা, পায়ে নাগরা। দেখে তারিফ মনে এল সকলেরই। আপনার আনন্দে আপনি মত্ত—এক মূর্ত যৌবন। সকলের দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করে একটু লাজুক হাসল খুদাবক্স, আর কুর্তার পকেট উজাড় করে মুঠো ভরে যা উঠল ঢেলে দিলো থালায়। একটা মোহর আর চার-পাঁচটা টাকা। তার পুরোমাসের সম্বল। নটুয়াদলের অধিকারী, সূত্রধর সবাই মহানন্দে সম্মতি জানাল। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ হেসে উঠল পরস্পরের দিকে চেয়ে। সিদ্ধির নেশা আর গানের মেজাজে মশগুল আসর মাথা ঝাঁকিয়ে মুরেঠা নাচিয়ে তারিফ করে উঠল—হদ্দ্ কিয়া ভাই খুদাবক্স, কামাল কামাল! দিল্ এত খুলে গেল কেন রে—বলে বেয়াড়া আনন্দে চিৎকার করল কে যেন! রঘুনাথ সিং বলে উঠলেন—কি খাঁ-সাহেব, আমি আপনি তুই শের থাকতে এই বাচ্চা এসে কামাল করে যাবে? বলে দুই-মোহর বের করলেন রুমাল খুলে।

ঘোস বেশ চোখ বুজে বসেছিলেন। রঘুনাথের কথার পর কি করতে হবে ভেবে নেবার আগেই হাসতে হাসতে রঘুনাথ তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোহর উঠিয়ে এনেছেন। রঘুনাথ টেক্কা দিচ্ছেন দেখে তিনি বলে উঠলেন—ঠিক আছে ভাই, আজ পুরো নটুয়াদলকে কুমার রঘুনাথ সিংজী পরোয়ার পুরী মিঠাই খাইয়ে নতুন কাপড় বখ্‌শিশ করবেন। ব্যস্‌—যাও!

বলে হাত নেড়ে আসর ভেঙে দেবার হুকুম দিয়ে সহসা ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে উঠলেন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন—কি কুমারসাহেব, কামাল করল কে? তারপর পরোয়ার আর পাঠান শরীর কাঁপিয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন। দেখা গেল টক্কর নিতে গিয়ে একটু ঠকে গিয়েছেন কুমারসাহেব, কিন্তু তাতেই তাঁর আনন্দ বেশি।

আসর ভাঙছে হৈ হৈ করে। শতরঞ্চি গুটিয়ে আনছে কয়জন। নেবা মশালগুলো তুলছে বরদাররা। এরই মধ্যে হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল সাগর সিং। কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে সে বসেছিল। এখন দাঁড়িয়ে পকেট উল্টে ফেলে সে কেঁদে উঠল বিশ্রীভাবে—আমি অনেক কিছু দিতে চাই, কিন্তু আমার একপয়সাও নেই। ও হো হো, তবে আমি দিল্‌ দিয়ে দেবো। অধিকারী ভাই, তুমি কি আমার দিল্‌ নেবে না?

সকলেই হেসে উঠল, কিন্তু কার কথা কে শোনে। সাগর সিং বারবার বলতে লাগল—আমি খাস বঘেলখণ্ডের রাজপুত, আমার দিল্‌ কি কমদামী? আমার দিল্‌ নিয়ে নাও, চলে যেও না—

হাসতে হাসতে রঘুনাথ সিং বললেন—ওর গলা থেকে পা পর্যন্ত সিদ্ধিতে বোঝাই। ওর মাথায় জল ঢেলে দাও।

জল দেবার কথা শুনেই চেঁচামিচি করে আপত্তি জানাল সাগর সিং। কিন্তু কে তার কথা শোনে। চারজন ধরাধরি করে তাকে নিয়ে চলল ছাউনিতে।

খুদাবক্সও হাসছিল। ঘোস শক্ত করে তার কাঁধের কাছে চেপে ধরলেন। বললেন—এবার বাড়ি।

ভোর হয়ে এসেছে। পুব আকাশের রঙ ফিকে, আর চাঁদ ক্রমেই নিবে, আসছে। ভোরের তারা দপ্‌দপ্‌ করছে। ঠাণ্ডা

বাতাস ক্লান্তি মুছে নিতে লাগল সস্নেহে খুদাবক্সের কপাল থেকে। কেল্লার নহবতখানায় শানাই বেজে উঠল প্রভাতী সুরে। শানাই-এর পুকার নিদ্রিত নগরবাসীর তন্দ্রামগ্ন চেতনার দরজায় সুরের মূর্ছনায় মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল।

শুদ্ধ সুরের আশীর্বাদ পথচারী দু'জনকে স্পর্শ করল। রাজপথে সামান্য প্রাণের সাড়া দেখা যায়। এখনই উঠবে ভাঙ্গী পুরুষ ও রমণী। জল দিয়ে ধুয়ে দেবে রাজপথ। জলসিঞ্চনে ভিজিয়ে দেবে দুইপাশের ধুলো।

ভৈরব রাগের উত্তরেই যেন পূর্বপ্রান্তে মহালক্ষ্মীমন্দিরের নহবতখানা থেকে শানাই বেজে উঠল। রাজপ্রাসাদের অন্ধকার দরজা খুলে গেল। বিনায়ক রাও শাস্ত্রী মৃদুমৃদু ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে চলেছেন। পিছনে প্রদীপ ও অন্যান্য পুজোপচার নিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণ সেবক কয়জন। সামনে একটি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ বালক পিতলের ঝারি থেকে জলসিঞ্চন করতে করতে চলেছে। রাজপরিবারের পুজো যাচ্ছে মহালক্ষ্মীমন্দিরে।

আসন্ন প্রভাতের এই শুদ্ধশুচি প্রস্তাবনা বড় ভালো লাগল খুদাবক্সের। মনে পড়ল তার গ্রামেও ভোরবেলা কেমন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। মদনমোহনের পূজারী পরমেশ্বর মিশ্র কেমন সু-স্বরে মন্ত্রপাঠ করে। মনটা তার এমনিতেই সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই সমস্ত পরিবেশ ও সুখস্মৃতি তাকে যেন আরো ভরে দিলো।

—সাঁতার জানতে? পাশাপাশি পথ চলতে চলতে ঘোস-এর কথায় হঠাৎ যেন হোঁচট খায় খুদাবক্স।

ঘোসের এই অদ্ভুত প্রশ্নের জবাবে অবাক হয়ে তাকায় খুদাবক্স। ঘোসের মুখ কিন্তু একেবারেই ব্যঞ্জনাবিহীন। তিনি তার দিকে চাইলেন না।

আবার বললেন—সাঁতার শিখেছ?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল খুদাবক্স। চট্ করে সে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। কেন এই প্রশ্ন, তা যেন ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছে না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পেশার সাগ্‌রেদী করতে করতে সতর্ক হতে শিখেছে সে। মনে হলো যেন অতর্কিতে আক্রমণ একটা হলেও

হতে পারে। একটু অপেক্ষা করল সে। তখন ঘোস বললেন—নৌকো চড়েছিলে কিনা, তাই জানতে চাইলাম, মুস্কিল হলে কি করতে!

ধরা পড়ে গিয়েছে সে। অবাধ্য হৃৎপিণ্ডকে শাসন করে খুদাবক্স জবাব দিলো—কোনমতে সামলে নিতাম।

—বেশ বেশ। বলে চলতে লাগলেন ঘোস। একেবারেই ভাবলেশহীন মুখ ঘোসের। তবু খুদাবক্সের মনে হলো, চোখের কোণে যেন কৌতুকের একটি স্মিত আভাস চিক্‌মিক্ করছে।

আ ট

মোতির শয়নকক্ষের সামনে একটি ঝুলবারান্দা। প্রভাতে তার একান্তে দাসী একটি বেদী ধুয়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন সকাল। সেই বেদীতে একটি নরম সবুজ রেশমের সাজপোশ্ ঢাকা তানপুরা অপেক্ষমান। একপাশে রূপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা। ওপাশে জাফরিকাজের ধূপদানী থেকে চন্দনধূপের গন্ধ উঠছে।

একপাশে বসেছেন বৃদ্ধ চন্দ্রভান। রাজপুত রাজবংশীয় এই সঙ্গীতাচার্য তরুণ-জীবনে মুসলমান ওস্তাদের কাছে সোনার রাখী বেঁধে সাগ্‌রেদী গ্রহণ করেছিলেন। স্বীয়-সাধনায় অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর নামের সঙ্গে পান্নার রাজকুমারীর নাম জড়িয়ে অনেক গল্প একদা দরবারে দরবারে ফিরত। খ্যাতি ও যৌবনের চরম শিখরে দাঁড়িয়ে সহসা তাঁর জীবনের মোড় কেন ঘুরে গেল, কেন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে নগরে নগরে ভ্রাম্যমানের জীবন গ্রহণ করলেন, তা নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। অনেকদিন থেকে এখানে বসবাস করছেন তিনি, সঙ্গীতশিক্ষা দিচ্ছেন মোতিকে।

সৌম্য সুন্দর গৌরদেহ চন্দ্রভান, সাদা আচকান, যোধপুরী, মুরেঠা ও নাগরায় সুঠাম দেহখানির বাঁধন বার্ধক্যেও শিথিল হয়নি।

ঋজু হয়ে বসে তিনি কথা বলছেন আর একটু দূরে করজোড়ে বসে সশ্রদ্ধ হয়ে শুনছে মোতি নত হয়ে। প্রভাতে স্নানান্তে পীত বস্ত্র পরিধান করে, শুদ্ধশুচি মনে গুরুর কাছে এসেছে মোতি। চন্দ্রভানের সংযত কণ্ঠের কথাগুলির একটিও যেন হারিয়ে না যায়, তাই একাগ্র চিত্তে মোতি শুনছে।

চন্দ্রভান সস্নেহ কণ্ঠে বলছিলেন—সব সাধনার মতোই সঙ্গীত সাধনা বড় দুরূহ ব্যাপার। ঈশ্বর আরাধনা করে ভক্তের জীবন কেটে যায়, সঙ্গীতও চিরজীবনের জিনিষ। অনেক সাধকজনের খবর আমি জানি বেটি, তাঁরা সিদ্ধসাধক, তবু সুরের কারণে জীবনে কোন মহফিলে যোগ দেননি। পরিণামে দুঃখে কষ্টে দিন কেটে গিয়েছে তাঁদের, তবু বিদ্যাকে পুঁজি করে তাঁরা না কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন, না কোন আরাম পেয়েছেন। তোমাকে কি আমি কখনো ছোটে খাঁ'র কথা বলেছি?

—না তো!

—ছোটে খাঁকে আমি দেখেছিলাম কাশীতে। সে চল্লিশ বছরের কথা হবে। তাঁর নাম আমার গুরুজীর কাজে শুনেছিলাম। গুরুজী বলেছিলেন, ভাগ্যের বরপুত্র ছোটে খাঁ-সাহেব, তিনি ছিলেন সুরের একান্ত রগীব্ লোক। মালকৌশে সিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গান গাইবার সময়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন মুর্শিকের সৈয়দ, সঙ্গীতের আত্মা। কিন্তু শেষ অবধি কি হলো? মাথা তার গোলমাল হয়ে গেল। গোয়ালিয়রে তাঁরই মহফিলের শেষে সব ফেলে রেখে কোথায় চলে গেলেন।...যাক্, আমি তখন নতুন জোয়ান, গুরুজীর সন্ধানে নানাভাবে ফিকির করতে ব্যস্ত। শেষরাতে খেয়াল হয়েছে গঙ্গাজীকে দর্শন করব। চলে গিয়েছি শিবালা ঘাটে। সেখানে সহসা শুনলাম মালকৌশ রাগের একটি পদ, সুরের মুহ্‌রা কায়েম করে, একটি সপাট তানের অন্তে এমন করে চলে গেল পূর্ণস্থায়ী পদগুলোতে, যেন মনে হলো সেই শেষরাতের আকাশ, বাতাস আর গঙ্গার জল, সবই সুরের ঝাপটায় তোলপাড় হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি। সময়ের খেয়াল নেই, হিসেব নেই, সুর যে এমন ধারা জীবন্ত হতে পারে, তা আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না। মনে পড়ে, গান শেষ হলো যখন,

রাতের রঙ তখন ফিকে। দেখলাম সমাধিস্থভাবে বসে আছেন চোখ বুজে সুর-সাধক।

শিবালা ঘাটের এক পূজক ঠাকুর নেমে আসছিল। সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। সস্নেহে হাত ধরে তুলল তাঁকে, তারপর ধীরে ধীরে নিয়ে পার করে দিলো চবুতরা, খিলান আর সিঁড়ির বিপজ্জনক অংশগুলো।

পূজকজীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেছিলেন, উনি হচ্ছেন ছোটে খাঁ-সাহেব। বড় খামখেয়ালী আর বে-ঠিকানা মানুষ। চোখ তাঁর ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। কখনো এখানে আসেন, কখনো চলে যান, বেশি কিছু জানি না, তবে যখন আসেন, তখন একটু মদত খিদমত করবার চেষ্টা করি। ওঁর পিছু পিছু যাবেন না কখনো। উনি একেবারেই মানুষের সঙ্গ পছন্দ করেন না।

মোতি অভিভূত হয়ে শোনে। চোখের ঘনকৃষ্ণ আঁখি-পল্লব বেদনাতুর হয়ে ভিজে ওঠে। চন্দ্রভান বলতে থাকেন—আমি আজ বুঝি, গানের সাচ্চা আশ্‌ক তিনি বুঝেছিলেন, তাই নিজের বলতে যা কিছু সব বিলিয়ে দিয়ে অমনি ধারা জীবন বেছে নিয়েছিলেন। সেইভাবে সঙ্গীতকেই চরম জেনে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিতে বলি না আমি, তবু জেনো সাধনা দরকার হয়। এমন সাধনা চাই যে, জীবনভর ঐ একই জিনিষের মধ্যে রোশ্‌নি দেখবে, আর কোথাও খুঁজে ফিরবে না।

করজোড়ে মোতি বলে—আপনার মতো শরীফ মুরশিদ পেয়েছি, আমার তো পরম সৌভাগ্য। আমার অত সুকৃতি নেই, তবু চেষ্টা করি।

চন্দ্রভান বোঝেন মোতির মর্মব্যথা কোথায়। বলেন—তওয়ায়েফ্‌ তুমি তাতে কোন অপমান নেই, তোমাকে তো বলেছি, তওয়ায়েফ্‌দের মধ্যে থেকেই কতজন সুরের সাচ্চা মাসুক জন্ম নিয়েছেন। কমল যেখানেই ফুটে উঠুক, সে কমলই থাকবে, আর তার সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হবে। শুধু খেয়াল রাখবে কখনো গানকে ছোট বলে মানবে না। যত রাগরাগিণীর পট তুমি দেখবে, জানবে তারা সাধকের ধেয়ানে ধরা দিয়েছিল, তাই তাদের রূপবর্ণনা সম্ভব হয়েছে। সাধনা সবচেয়ে বড় কথা বেটি—

চন্দ্রভান উঠে দাঁড়ান। স্পর্শ বাঁচিয়ে মেঝের ওপর নত মস্তকে প্রণতি জানায় মোতি। সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেন তাকে চন্দ্রভান। মোতি যে তওয়ায়েফ্ মাত্র, সে কথা তিনি কখনো মনে করেন না। কোন গোপন বেদনার পূজারী চন্দ্রভান! সব মানুষকেই গ্রহণ করবার ক্ষমতা পেয়েছেন একটি গভীর বেদনা-বোধ থেকে।

নেমে গিয়ে চন্দ্রভান অপেক্ষমান শিবিকায় আরোহণ করেন। পথের দিকে চেয়ে আনমনা হয়ে যায় মোতি। ভাবে চন্দ্রভানের কথা। আবার চিন্তিত হয় কোন বিচ্যুতি ঘটলো নাকি! তারপর ভাবে তার নিজের জীবনে দুটো প্রেমই সত্যি। সঙ্গীত সে ভালোবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু খুদাবক্সকেও কম ভালোবাসে না। দুই-ই সমান, মনে মনে বলে সে।

নিচ থেকে জুহীর কলকণ্ঠ শোনা যায়—বেগম সাহেবার শৃঙার কতদূর? এদিকে এত্তেলা নিয়ে তাঞ্জাম এসে গিয়েছে। খেয়াল আছে কি না যে আজ হচ্ছে সেই দিন!

কথা বলে আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠে জুহী। মোতি আয়নাতে মুখ দেখে, কানে গহনা পরে আর মুখটিপে হাসে। বলে—ব্যস্ ব্যস্ চুপ কর্। আমার সব খেয়াল আছে।

—'এ কিন্তু মাঝরাতে চুপিচুপি'—সে সব খেয়াল নয়, এ হচ্ছে ভোরবেলা, কাজের খেয়াল।

হাতির দাঁতের চিরুণী দিয়ে শাসন করে জুহীকে মোতি। বলে—সব খেয়াল আছে।

চঞ্চল চরণে জুহী ঘুরে বেড়ায়। একখানা ছবি সোজা করে বসায়। আয়নার ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় চন্দনের গুঁড়ো। সুর্মা পরে টেনে টেনে। ভুরু কুঁচকে নিজের মুখখানা দেখে। মোতি বলে—ওতেই চলবে জুহী, এখন চল।

জুহী বলে—না, মন খারাপ করে লাভ নেই।

—মন খারাপ হলো কেন?

—মন তো ভালোই থাকে, শুধু তোমার সামনে এলেই—

মোতি মৃদু তাড়না করে। বলে—চল চল, তবু যদি না সুন্দরদাসের ছেলের কথা জানতাম।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জুহী হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে। বলে—ছেলেটার একেবারে বুদ্ধি নেই। কালও খত পাঠিয়েছে, জানো ?

নেমে এসে মোতি তাঞ্জামে ওঠে। তাঞ্জাম চলে নাট্যশালার দিকে। পথ চলতে চলতে বাহকরা হাঁকে—তফাত যাও! তফাত যাও! পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখে মোতি। ছাগলছানা কোলে নিয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে হেসে হেসে দৌড়োয় তার ভাই-এর হাত ছাড়িয়ে এঁকে বেঁকে শাকওয়ালীদের ঝুড়ির মধ্য দিয়ে। প্রসন্ন কৌতুকে স্মিতাননে হাসে মোতি। প্রত্যহের পরিচয় এই পথের সঙ্গে, তবু কেন যেন মধুর মনে হয়, কেন যেন ভালো লাগে এই পথ! এই কেন গুলোর উত্তর খোঁজে না মোতি। শুধু এককলি গান গুঞ্জরন করে—মুরলী ধুন শুনা শাঁবলিয়া।

নাট্যশালাতে সারেঙ্গীয়া, মৃদঙ্গকার ও অন্যান্য সঙ্গতীয়ারা অপেক্ষা করছেন। মাঝখানে শ্যামকান্তি ঈষৎ স্থূলকায় বাবাসাহেব গঙ্গাধর রাও, শিল্পী সুখলাল কাছ্‌বাহাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। সুখলাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছেন, আর রাজার চাহিদাগুলো মনে মনে টুকে রাখছেন স্মৃতির পাতায়, ঠোঁট অল্প অল্প নড়ছে। নাট্যশালার অধিকারী বিশাল সুখকরণ বসে আছেন ঋজু হয়ে পদ্মাসনে।

ঘরের মাঝখান দিয়ে দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে কার্পেট। তার বাইরে নাগরা খুলে রেখে নতমস্তকে কুর্ণিশ করতে করতে ঢোকে মোতি। রাজার সামনে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানায়। তারপর সকলের সামনে মাথা নিচু করে কুর্ণিশের ভঙ্গীতে পেছু হটে গিয়ে স্ব-স্থানে বসে। তার অনুরূপ আচরণের পর জুহীও বসে তার পাশে। ক্ষণকাল সকলে অপেক্ষা করে, তারপর রাজার চোখের ইশারা বুঝে নিয়ে বিশাল সুখকরণ শুরু করেন মহড়া। মৃদঙ্গী ঘাড় ঝাঁকিয়ে বাব্‌রি চুল নাচিয়ে বোল বাজিয়ে ওঠে, খোলে ঘা পড়ে। নিমেষে ঘুঙুর বাঁধে মোতি। সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে বিশাল সুখকরণ আসরে এসে দাঁড়ান। গণেশ, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনাগানের পর রাজার প্রশস্তি গীত করেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকে অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের প্রস্তাবনা গেয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে

যান। তখন আলবালে জল সেচন করতে করতে নৃত্যপরা মোতি প্রবেশ করে। স্বল্প নৃত্যছন্দ, শুধু জল সেচনের ভঙ্গিমা। জুহী ও হীরা, তার অন্য সখীরাও আসে।

চিবুকে হাত রেখে জরির তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে দেখেন গঙ্গাধর রাও। প্রশস্ত ললাটে প্রভাতী পূজার আশীর্বাদ তিলক। কোন দুশ্চিন্তা যেন কপালের রেখাবলীতে বন্দী হয়ে আছে বলে বোধ হয়। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করে তিনি দেখেন।

সোনী দুষ্মন্ত বেশে প্রবেশ করে আসরে। গঙ্গাধর রাও সামনের ঘণ্টাতে আঘাত করেন। অভিনয় থেমে যায় চকিতে। কার কি ত্রুটি হয়ে গিয়েছে ভেবে সকলেই দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করে। রাজা বলেন—মোতি, তোমার চাহনি আর নাচ এরকম তরল হয়েছে কেন? এ কি তওয়ায়েফের আসর? হুঁশ নেই তোমার?

ভীত মোতি নতমস্তকে শোনে ভৎর্সনা। তারপর আবার শুরু করে প্রথম থেকে।

ঘড়িতে দশটা বাজতেই উঠে পড়েন রাজা। পাশে করজোড়ে দাঁড়ায় মোতি। রাজা সস্নেহকণ্ঠে বলেন—বড় পরেশান হয়ে গিয়েছ মোতি?

—নেহি জী সরকার।

রাজা বলেন—আমি তো চলে যাচ্ছি তিন মাসের মতো। তার আগে একদিন পুরো জলসা দেবো।

দরজার দিকে চলতে চলতে বলেন—রাণীমহালে একদিন নাচ দেখাতে হবে। তারপর সকৌতুকে বলেন—খুব ভালো করে। বাঈসাহেবাকে খুশি করতে পারো তো—

নতমুখে মৃদু মৃদু হাসে মোতি। রাজা উঠে বসেন মেণায়। বাহকরা তুলে নেয় শিবিকা।

প্রাসাদ অভিমুখে চলতে চলতে রাজা কত কথাই যে ভাবেন। কোলে একটি আর অপর একটি ছেলের হাত ধরে মা চলেছে ছেঁড়া কাপড়ের ঘাগ্‌রা দুলিয়ে বিষ্ণুমন্দিরের অন্নসত্র অভিমুখে। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র। দূরে দবণ্ডী বাজাচ্ছে নকীব—ঘোষণা করছে, আজ অপরাহ্ণে শ্রীমন্ত সরকারের হুকুমে চৌকে বস্ত্র বিতরণ হবে,

সবাই যেন হাজির হয়ে যায়। অন্নদান, বস্ত্রদান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা, লগ্নে লগ্নে হোম যজ্ঞ, সবই একটি ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে—একটি পুত্র হোক মহারাজের। সিংহাসনের উত্তরাধিকার হোক সুনিশ্চিত। কিশোরী পত্নীর পুত্রেষ্টি ব্রতের উপবাস-ক্লিষ্ট মুখের একখানা ছবি সেই নিঃসঙ্গ রাজহৃদয়কে ব্যথা দেয়। গত রাত্রে সান্ধ্যপূজার পর যখন বস্ত্র পরিবর্তন করতে চলেছিলেন তিনি, সহসা চোখে পড়েছিল, অলিন্দে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন রাণী। উপবাসে ঈষৎ শীর্ণ বোধ হলো চেহারা। সমবেদনা আর স্নেহের ভাব এল রাজার মনে।

দূরে বহু দূরে ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে ব্রিটিশ বিউগ্‌লে উর্দি বাজছে শোনা গেল। ভ্রূকুঞ্চন করলেন রাজা। বাহকদের বললেন,—জোরে চালাও।

রাণীমহালের অঙ্গনে লাল শালু বিছিয়ে দিয়েছে আসরে। ঝুলবারান্দায় বসেছেন পুরনারীরা। তাদেরই মধ্যে বসেছেন রাণী। আসরে দাঁড়িয়ে মোতি তাঁর দিকে তাকায়। অভিবাদন করে বলে,—ফরমাইয়ে সরকার।

রাণী তার চেয়ে কিছু ছোটই হবেন। মোতির ঈষৎ উন্নীত মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি অঙ্গুলি হেলনে কাশীকে ডাকেন। কাশী ডেকে বলে, এক নাচ প্রথমে, তার পর গান শুনবেন বাঈসাহেবা।

নিচু হয়ে তস্‌লিম জানায় মোতি। তারপর একবার শান্ত দৃষ্টিতে দেখে তার পরিবেশ। রাজপ্রাসাদের ভেতরে এই প্রশস্ত অঙ্গন জলে ধোওয়া ও পরিচ্ছন্ন। দ্বিতল প্রাসাদ তার চারিপাশ ঘিরে। অপরাহ্ণ। তবু সূর্যের আলো এসে পড়েনি এই কালো পাথরের অঙ্গনে, চারপাশের ঘরগুলোতে আড়াল করেছে। প্রাসাদের গায়ে গায়ে জোড়ায় জোড়ায়, মাছ, হাঁস, ময়ূর ও হরিণের মূর্তি উৎকীর্ণ। ও পাশে ঝুলবারান্দায় পাখীর কলরব। চিড়িয়ামহলে পিঞ্জরা টাঙানো সারি সারি, তাতে শুক, শারী, হীরামণ ও কাকাতুয়া। খোপে পায়রা উড়ে এসে বসছে শত শত। বাঁদিকে বোধ হয় আশ্রিত পুরনারীদের বাস। মরাঠা রমণীরা কাছা দিয়ে

পরেছেন রঙীন কাপড়। সারি সারি বসে আছেন জোড়াসন হয়ে। শিশু, বালক বালিকারও অভাব নেই। বাঈসাহেবাকে এত কাছাকাছি দেখেনি কখনো মোতি। দোতলার ঝুলবারান্দার মাঝখানে তিনি বসেছেন একটি হাতলবিহীন চৌকিতে। দুইপাশে বসেছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা। রাণীকে মৃদু-মৃদু বাতাস দিচ্ছে কাশী। সকলেই অপেক্ষমান। এদের চোখে যেন কোন এক বার্তা পড়ে মোতি। এদের কাছে সে শুধু নটী, বাঈসাহেবার বেতনভোগী নর্তকী মাত্র। সহসা রাণীর চোখে চোখ পড়ে। যেন তার বিভ্রান্তি বুঝে রাণী ভরসা দিয়ে একটু হাসেন। বলেন—কোন অসুবিধে হচ্ছে ?

মোতিও হাসে। বলে—না। তারপর সঙ্গতীয়াদের নির্দেশ দেয়।

রঙিলা তানের হালকা গানের সঙ্গে লঘু পদক্ষেপে নাচে মোতি। পুরো হাতা গলাবন্ধ সবুজ রেশমের জামা, পীলা ঘাগ্‌রা, পীলা ওড়না। নাচের তালের সঙ্গে সঙ্গে বাজনা কখনো হয় দ্রুত কখনো হয় ধীর। মানিনী হয়ে মান করে বসে মোতি, আবার হেসে হেসে প্রসন্ন হয়। পায়ের কাছে লাল শালু কুঁচকে পদ্মফুলের মতো হয়ে যায়। তারিফ করে মেয়েরা আর সবিস্ময়ে দেখে। মেতি তালে তালে পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল শালুতে অনেকগুলি পদ্মরচনা করে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

নাচ থামতে সকলেই প্রশংসা করে ওঠে। তাড়াতাড়ি চাদর টেনে সমান করে দেয় জুহী। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এবার মশালদানে বাতি নিয়ে আসে দাসীরা। মহলকারনীরা বাতি জ্বালায় ঘরে ঘরে, ঝাড় লণ্ঠনে, অলিন্দে। এই আবছায়া পরিবেশে, প্রাচীন প্রাসাদের ছায়াচ্ছন্ন অঙ্গনে, মোতি একটু স্বস্তি পায়। মধুর কণ্ঠে চন্দ্রভানজীর কাছে শেখা গান ধরে—কুঞ্জবন ছোড়ি রে শ্যাম, কঁহা গাউঁ গুণনাম—

ললিত কণ্ঠে কোন প্রেমিকার হৃদয়বেদনা বেজে ওঠে। সমস্ত হৃদয় দিয়ে, মীরার গানে মোতি নতুন আকুতি আরোপ করে। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে গানের অন্তর্লীন সৌন্দর্য। ভজন গাইতে বসে কেমন যেন আবেগ আসে মোতির মনে, তার

পরেই সে চলে যায় বালক কৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহোক্তিতে—নন্দলালা মোরে প্যারা আও গিরিধারী বনমালা পহ্নাউ ইত্‌বারী—। ধীরে অতি সন্তর্পণে সন্ধ্যা নামে গগন ছেড়ে অঙ্গনে। শ্রোতাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। গানের সুরে সুরে যেন ব্রজধামের ধূলিধূসর সন্ধ্যা, গৃহগামী গাভীদলের গলার ঘণ্টার টুং টাং শব্দ, দুরন্ত বালককে কোলে নিয়ে যশোদার মান-অভিমান, এই সব ছবিগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গান থামতেও তাই আবেশ কাটে না।

—বড় সুন্দর লাগল, পিয়াস পুরিয়ে দিলে তুমি—রাণীর সপ্রশংস উক্তি শুনে মোতি মাথা নিচু করে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ও আনন্দে। শুধু ভালো লেগেছে শুনেই মোতি চলে যাবে? রাণী তাঁর পার্শ্বচারিণীকে কাছে ডাকেন।

তারা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে। দাঁড়িয়ে পড়ে মোতি। দাসী বলে—বাঈসাহেবার আশীর্বাদ। লাল রেশমের রুমাল মেলে ধরে। এক জোড়া মুক্তোর বালা। কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায় মোতি। তারপর বালা তুলে নিয়ে রাণীর উদ্দেশ্যে পুনর্বার তস্‌লিম পেশ করে। মোহরের থলিটা দেয় জুহীর হাতে। একটা মোহর বের করে দেয় দাসীকে।

রাতে যখন গঙ্গাধর বিশ্রাম করতে এলেন, রাণী অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। বললেন—মোতির গান আমার খুব ভালো লাগল। কি সুন্দর ভক্তির সুরে গাইল। বড় গুণী মেয়ে, বড় কলাবিদ্‌।

—ভালো লেগেছে তোমার?

—হ্যাঁ।

তারপর একটু ইতস্ততঃ করে হেসে বললেন—আমার মোতির কঙ্কণ আমি ওকে দিয়েছি। ভালো করিনি? একটু যেন অপরাধের সুর আলতো হয়ে ছুঁয়ে আছে প্রশ্নটায়।

রাজা বললেন—বেশ করেছ। মোতিকে মোতির বালা দিয়েছ, ঠিক করেছ। কি বিঠুরওয়ালী, খুব কাব্যবোধ হয়েছে তো! বড় খুশি হলাম। হাসছো যে?

—আমি বিঠুর ছাড়লাম, তবু নাম আমাকে ছাড়ল না!

—না, আগের চেয়ে অনেক মানুষ হয়েছ। মানতেই হবে—

এবার দু'জনেই হেসে ফেললেন। অনেক দুশ্চিন্তার মাঝখানে একটু হাসিতে যেন মনের ভারও খানিকটা নেমে গেল।

লছমীমন্দির ছাড়িয়ে পুবদিকে চলতে চলতে টিলার গায়ে একটি মিনার ও ঘর। লোকালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে এখানে পলাশ, কেঁদ, তেঁতুল ও শিরীষ গাছের বন। শেষ-বসন্তের অন্তিম বাসনা মূর্ত করে ফুটে উঠেছে পলাশ। বনজুঁই-এর গাছেও গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফুটেছে। তার স্নিগ্ধ গন্ধে মদির হয়েছে পরিবেশ। শুক্লপক্ষ সমাপনে চাঁদের দিন ফুরিয়েছে। দিনমানেও এখানে কেউ আসে না।

প্রতি রজনীতে ছায়া ও সুরভিসমাকুল এই বিসর্পিল বনপথ ধরে অভিসারিকা রাধিকার মতো গোপনে আসে মোতি। কত শাসন, কত বাধা, রাজার নজরে পড়বার আশঙ্কা, সব অগ্রাহ্য করে আসতে হয়। খুদাবক্সের সঙ্গে কিস্তি বেয়ে চলে এসে, জলের ওপরে আনমিত একটি জামগাছের ডালের আড়ালে কিস্তি বাঁধে তারা। তারপর চলে আসে তাদের এই ছোট্ট ঘরখানায়। পাথরের ঘর। একপাশে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলে। সেই স্বল্প আলোতে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আর বাঈসাহেবের ইনাম, তার হাতের বালাজোড়া ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায় মোতি।

খুদাবক্স ছলনা করে। বলে—দেখতে পাচ্ছি না তো?

মোতি বলে—কেন, আলোতে ভালো করে দেখো।

খুদাবক্স বলে—না, তোমাকে দেখে দেখেই সব আলো আমার ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন আর অন্য আলো কোথায় মিলবে বলো?

মধুর হাসে মোতি। কোমল হাত তার মুখের ওপর রাখে।

মোতির পোষাক দেখে হাসে খুদাবক্স। বলে—কিষাণের সঙ্গে মিশে কিষাণী হয়ে গিয়েছ মোতি!

কালো মোটা কাপড়ের ঘাগ্‌রা আর ওড়নাতে মোতিকে সত্যিই গাঁয়ের মেয়ের মতো দেখায়।

খুদাবক্স বলে—এক গান গাও মোতি।

—বলো কোন গান?

—যে গান গাইতে চায় তোমার মন।

ভীরু সরমে মধুর কণ্ঠে সেই পুরনো গান গায় মোতি। গজলের কথায় আর সুরে ললিত রাগ তার আবেদন জানায়। মিনতি করে বলে—হে বুলবুল তুমি অশ্রুবর্ষণ করো না, এখানে অশ্রুবর্ষণে মানা আছে—

মৎ রোঁ ইহা বুল্‌বুল্—
আঁসু বহানা হ্যায় মনা॥

ফুলের মতো ওষ্ঠাধরে মৃদু গুঞ্জন করে কথাগুলি। অনভ্যস্ত কোন্ বেদনার অনুভূতি জাগে খুদাবক্সের মনে। নীলাভ তীক্ষ্ণচোখে নামে কোমল মমতা। অনুভূতির কোন্ জটিল অরণ্যে পথ হারায় খুদাবক্সের তরুণ মন। গানের সুর সেই অরণ্যের দিশারী। সুরে সুরে যেন ফুল ফুটে ওঠে, জোনাকি জ্বলে, মাধুরী ও প্রেম সুরভিত করে সেই ছায়াপথ। শেষ স্তবকের সময় পুনর্বার ফিরে আসে কোন দুখিয়ারী মনের সকরুণ মিনতি—

মেরে প্রীতম্ নিদ্ হুয়ে হ্যায়
সোর মচানা হ্যায় মনা॥

মিলনের প্রথম বাসর। মন জানাজানি হয়েছে সবে। বাদ্য-যন্ত্রগুলি বাঁধা হয়েছে, ঝাড়ে বাতি জ্বলছে, অপেক্ষমান এক আসর। সেখানে সঙ্গীত এখনো শুরু হতে বাকি, সবে যেন সায়াহ্ন। এখনি কেন বিরহের গান গাইল মোতি? কেন এই পরিবেশকে এমন ব্যথাতুর করে তুললো সে? খুদাবক্স ভেবে পায় না। মোতিকে দেখে দেখে অবাক মানে বারবার। বিস্ময় তার আর ফুরোয় না। কি অপরূপ সুন্দরী মোতি, কি রহস্য লুকিয়ে আছে তার অধরে নয়নে অলকে। অথচ বড় গভীর আর শান্ত।

মোতি হাসে একটু। নীরবতার মুহূর্তগুলি আবেগ ও বাসনায় থর থর করে কেঁপে উঠতে চায়, তাতে ভয় পায় মোতি। খুদাবক্সের হাতে হাত রেখে বলে—কিছু বলো খুদাবক্স।

—কি বলব মোতি?

—তোমার কথা বলো।

—আমার কথা তো বলেছি মোতি, সবই তো তুমি জানো। আমার জীবনটাই বা কতটুকু বলো, আর কি-ই বা জানবার আছে!

তবে অনেক বলবার ইচ্ছে হয় মোতি। তোমার আগে কে আর এমন করে শুনতে চেয়েছে বলো!

উন্মীলিত কমলদলের মতো শিশিরের ফোঁটাগুলি গ্রহণ করে মোতি। বলে—আমার কথাও তো তুমি সব জানো খুদাবক্স। সেই কোন ছোটবেলা মা মরে গেল, মানুষ করল মন্নু সারেঙ্গীয়া। দিল্লীতে বিশ্বেশ্বর মিশ্র খেয়ালীয়ার বাড়িতে ছিলাম তাঁর স্ত্রীর আশ্রয়ে। আট বছর বয়সে সেখান থেকে আমাকে এনেছেন চন্দ্রভানজী। বড় বিধিনিষেধ আর কড়া পাহারায় থেকেছি খুদাবক্স। শাসন আর নজর মানতে শিখেছি।...রাজার নাটে আমরা নাচওয়ালী, কি জীবন বলো, কি বা জানতাম!

—কবে জানলে মোতি যে, কিছু জেনেছ?

—হ্যাঁ খুদাবক্স, তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে পরে জেনেছি যে, আমার জীবনেরও মূল্য আছে।

—নিশ্চয়ই আছে মোতি। আমার কাছে আছে।

—বড় বে-বফা দুনিয়া খুদাবক্স। মনে ভাবি, ভুল করলাম না ঠিক করলাম, তোমাকে কোন দুঃখের মধ্যে আনলাম কি না কে জানে! আমার কথা বলে কয়ে বিশ্বেশ্বরজী চন্দ্রভানজীকে অনেক অনুরোধ করলেন। চন্দ্রভানজী আমাকে ঝাঁসী আনলেন। বাবা-সাহেবের বড় ভাই রঘুনাথ রাও তখন গদীতে ছিলেন। বাবা-সাহেবের নাট্যশালার সখ জানো তো? সেই থেকে আমি নাচ গান শিখেছি, খানিকটা পর্দানশীন হয়ে বড় হয়েছি। বাইরের দুনিয়ার কাকেই বা চিনি বলো? বিধিনিষেধ, কত বাধা, সে তুমি বুঝবে না খুদাবক্স। তারপরে জানোই তো আমার মা ছিল নাচওয়ালী, এ আমার জন্মগত পেশা, এক সময় মনে হয়, তোমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে তোমাকেই হয়তো কষ্ট দেবো—কি করলাম, ভালো কি মন্দ—তা জানেন উপরওয়ালা।

—আমি জানি। বলে খুদাবক্স তাকে কাছে টেনে নেয়। মাথাটা হেলিয়ে দেয় কাঁধে। মোতি পরমনির্ভরে মাথা হেলান দেয়। সুরভিত চুলের গন্ধ আসে। চূর্ণ কুন্তলগুলি সযত্নে কপাল থেকে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। অনেক দূরে কোন রাত-চরা পাখী ডেকে ওঠে। জোনাকি মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে দেয় গাছের তলায়।

পাশাপাশি দুটি বক্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। পরস্পরের হৃদ্‌স্পন্দন শোনে দু'জনে। মোতির হাতখানা তুলে ধরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। এত কোমল, এত পেলব! নিজের হাতের ওপর রেখে দেখে। মোতি বলে—কি দেখছ?

—মানায় না।

—কি?

—দেখো কি বে-মানান।

মোতি বলে—খুব মানায়। কিছু জানো না তুমি।

দু'জনের ভালোবাসা এক সঙ্গে স্পন্দিত হয়। তারাগুলোও যেন তাদের মনের আনন্দ ধরে নিয়ে থর থর করে কাঁপে। মোতির মুখ তুলে নিয়ে এমন করে দেখে খুদাবক্স যে মোতি লজ্জা পায়। বলে—কি দেখছ? কি এমন জিনিষ?

—বড় আশ্চর্য জিনিষ মোতি, তুমি যদি আরশি নিয়ে দেখো তবু এর নিশানা পাবে না। আমার চোখে দেখতে হবে।

—আমি দেখতে চাই না। তুমিই দেখো।

একটু হাসল খুদাবক্স। তারপর তার চোখের দৃষ্টি গভীর হয়ে নেমে এল। সেই চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জগৎসংসার ভুলে গেল মোতি। গভীরতর কোন দুর্বার আকর্ষণ খুদাবক্সের চোখে। মোতির চিবুকটা তুলে ধরল সে। ঈষৎ আনমিত করল তার নিজের মুখ।

কয়েকটি মুহূর্তের হিসেব হারিয়ে গেল। তারপর খুদাবক্স গভীর গলায় আবৃত্তি করল—অগর ফিরদৌসে বার, রু-য়ে-জমিন্ অস্ত্—

মনে মনে মোতি বললো—হামীন্ অস্ত্! সে তো আমারও কথা।

রজনী অতিক্রান্তা হয়ে অবতীর্ণ হলেন তৃতীয় যামে। মোতি বললো—চলো রাত আর অল্প বাকি।

—চলো।

জলের ধারে কিস্তির কাছে এসে খুদাবক্স বললো—মোতি, খএর যদি হয়ে থাকে তো মাপ করো—। অন্যায় করিনি তো?

গভীর সপ্রেম চাহনিতে তাকে আশ্বস্ত করল মোতি। বললো—আমার কাছে তোমার কিছু অপরাধ নেই।

কিস্তি ছেড়ে দিলো খুদাবক্স।

কামানগুলো যে জ্যান্ত কিছু নয় তা ঘোসের কথা থেকে বুঝতে পারা কঠিন। ভবানীশঙ্কর, ঘনগর্জ, কড়ক-বিজ্‌লী, নলদার—কামান নয়, যেন পঞ্চপুত্রের কথা বলছেন ঘোস, এমনই মনে হয় খুদাবক্সের।

—কি চেহারা, কি তেজ, কি লড়াই করবার হিম্মৎ, পেশোয়ার আমলে কি রকম খেলা দেখিয়েছে যে কি বলি! কি সব দিন চলে গেল বলো তো? বিশাল স্থবির দেহ কাম্মানটার দিকে চেয়ে ঘোস এমনভাবে আফসোস করেন যে, অবাক হয় খুদাবক্স। ঘোস ঘনগর্জকে একটু হাত বুলিয়ে দেন। বলেন—চুপ করে ঘুমো ব্যাটা, হিম্মৎ বঢ়াতে রহো।

—দরকার হবে না কি?

—না, না, কি বলছ তুমি! সে-সব দিন একেবারে খতম। এখন শুনি লড়াই হয় কাগজে কলমে। অংরেজ সরকারের সঙ্গে খরীতা চলে দরবারে দরবারে। দিন-কালই বদলে যাচ্ছে না কি বলো! ছিল বটে সে সব দিন।

কেল্লার দক্ষিণবুরুজে দাঁড়িয়ে ও-পাশে ইংরেজ ছাউনি চোখে পড়ে। ঝক্‌ঝক্ করছে বেয়নেট। মার্চ করে ফৌজ ফিরছে ছাউনিতে। গোঁফে মোচড় দিয়ে অনুকম্পার সুরে ঘোস বললেন, লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট 'ট্রেনশান'! চালাতে থাক। ওদের আদবকায়দা কিন্তু ভারী চমৎকার! তবে পরেড্ আর পরেড্! আমার পছন্দ হয় না। সকাল, বিকেল, রাত যেন ঘড়ির মতো চলছে।

বুরুজের কিনারে পাথরের প্রাকারে বসেন ঘোস। খুদাবক্সকেও বসতে ইঙ্গিত করেন। বলেন—অংরেজদের বন্দুক, কামান ভারী চমৎকার। আমার কবে থেকে শৌখ্ ছিল দুটো অংরেজী কামান কিনবো। ওজন হাল্কা, ব্যবহারে সুবিধে অথচ ভারী পাল্লাদার। গোয়ালিয়রে আছে কয়েকটা, সেখানেই দেখেছি।

টহল দিয়ে ঘুরিয়ে আনছে দুটো হাতিকে রাস্তা দিয়ে। বাঁকে করে জিলিপী আসছে দেখা গেল। বড় হাতিটার রোজকার বরাদ্দ। অনেকটা উঁচু থেকে সহরটা দেখতেও চমৎকার লাগে।

দূরে পাহাড়গুলো দেখা যায়। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন ভালোলাগার আনন্দটা'খুব উপভোগ্য মনে হয় খুদাবক্সের। এক মুঠো বাদাম আখ্‌রোট তুলে দেন তার হাতে ঘোস। নিজেও ভাঙেন দুটো একটা। তারপর বলেন—বেটা, কথা আছে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না।

উত্তর নিষ্প্রয়োজন। ঘোস বলেন—তোমার মনে পড়ে সাতবছর আগেকার কথা? যখন তোমার আমার প্রথম মোলাকাত হয়েছিল? আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমার মধ্যে সাঁচ্চা ইস্পাত আছে বলে আমি মনে করি। আর এ-ও আমি আমার জিন্দ্‌গী ভরে দেখলাম, একটু ভালোবাসা, একটু দেখ্-ভালাই-এর অভাবে, সেই ইস্পাতে তৈরি হয় কসাই-এর ছুরি। কিছু আমার বলবার নেই, কেননা, তুমি আমার সব চাহিদা ভরে দিয়েছ। ঘোড়া চালাতে, তলোয়ার খেলতে, বন্দুক লড়তে, কামানের তদারক করতে খুব তৈরি হয়ে গিয়েছ তুমি। এখন কয়েকদিন থেকে কিছু কিছু কথা শুনতে পাচ্ছি। কি, বাবাসাহেবের তওয়ায়েফ্ মোতির সঙ্গে তোমার কিছু বুঝ্ হয়েছে?

ঘোসের দিকে চেয়ে খুদাবক্স বলে—আপনি যে নিশানা করেছেন ওস্তাদ্, ও একেবারে ঠিক। কিন্তু এতে কোন ইজ্জত ছোট হবার কথা নেই—কারণ আমি তাকে ভালোবাসি। এতে কি আমার কোন গুণাহ্ হয়েছে? কোন অপরাধ করেছি কি?

ঘোস ব্যথিত নয়নে ঘাড় নাড়েন। বলেন—সাচ্চা আস্ক্, খাঁটি সোনা। তা কারোর ইজ্জত ছোট করে না—বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তুমি তো সব জানো না বেটা। জানো না কি, মোতি নিজের মালিক নয়। হাঁ বাঁদী নয় বটে, কিন্তু বাবাসাহেব ওকে ছোট থেকে বড় করেছেন, সব শিখিয়েছেন, দরবারে দরবারে যে মামুলি তওয়ায়েফ্ থাকে, তাদের চেয়ে মোতিকে অনেক ভালোভাবে রেখেছেন। মোতিকে তুমি কি করবে, শাদী তো করতে পারবে না!

—কেন নয়? আমি শাদী নিশ্চয় করব। আপনি একথা কখনো ভাববেন না—

—আরে হামারা বাত ছোড়ো—বলে ধমক দেন ঘোস। বলেন —শাদী করবে! তোমার মা কি বলবেন?

—মা মেনে নেবেন। তর্কের খাতিরে বলে খুদাবক্স। বলেই মনে হয় অসম্ভব কি। উত্তেজনায় আরক্ত মুখে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে সে।

হতাশার ভঙ্গীতে হাত উল্টোন ঘোস। বলেন—বেশ! মাও নয় মেনেই নিলেন। কিন্তু হাওয়ার উপর ইমারত বানিও না বেটা, মোতিকে শাদী করতে দেবেন না বাবাসাহেব। বুঝছ না তুমি? আইন নেই, নিয়ম নেই, রাজা যা বলেন তাই হয়। মোতির ওপর তাঁর নিজের কোন মতলব নেই সত্যি, তবু তুমি তাঁর হাবিলদার, আর দরবারের নটী মোতি—স্বাধীন ইচ্ছেয় নিজেদের মধ্যে মিলমিশ তিনি বরদাস্ত করবেন না।

—আমি পরোয়া করি না। এই দর্পিত উক্তির সময় এমন দেখায় খুদাবক্সকে যে, ঘোস খুব বোঝেন, এই তেজ, এই বেপরোয়া জিদ্, নিজের ভবিষ্যৎ বাতাসের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে হৃদয়ের দাবি মেনে নিয়ে দেওয়ানা হবার সাহস, একমাত্র যৌবনের পক্ষেই সম্ভব। খুদাবক্সের সতেজ সুন্দর চেহারা, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, দেখে দেখে তাঁর নিজেকে বড়ই বুড়ো মনে হয়। কিছু ঈর্ষাও হয়। তারপরই স্নেহ ও বাৎসল্যের সুরে বলেন—খুব হয়েছে। বসো। মস্ত মর্দানা হয়েছ বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বোঝো, বেপরোয়া কিছু করো না। অনেক করে নিজের জীবন একটুখানি গড়েছ, এক ঠোক্করে ভেঙে দিও না বেটা। যদি এমনিভাবে চলে, তো সম্মান, অর্থ আর নিরাপত্তা, সবই মিলবে তোমার। দেখো, জীবনে কত কিছু বুঝবার আছে, শিখবার আছে—দিন তোমার সামনে। আমি আসল দিনগুলোই পিছে ফেলে এসেছি—যখন ঠোক্কর খেয়ে ফিরেছি পথে পথে।

ঘোসের কণ্ঠের আন্তরিক বেদনা স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। বলে—ওস্তাদ!

ঘোস উঠে দাঁড়ান। বলেন—চল, যাওয়া যাক, বেলা হয়ে যাচ্ছে! একটা খেয়াল রেখ—তোমাকে আমি ডানহাত করে নিয়েছি, রাজাও একটু স্নেহ করেন, শত্রু তোমার অনেক। তুমি

কি করো না করো, খবর ঠিক রাখে সবাই, রাজার কানেও তুটো একটা কথা গিয়েছে। তাই এতগুলো কথা কইলাম।···জানো কি যে তোমাকেও যেতে হচ্ছে?

—কোথায়? চকিত হয় খুদাবক্স।

—রাজার সঙ্গে সফরে। একটি ছেলে হলো না বলে রাজার বড় তুশ্চিন্তা হয়েছে। ভয় হয়ে গিয়েছে গদীর জন্যে। রাজাদের নসীব জানো তো, একটা ছেলের জন্য গদী ছুটে যেতে পারে। যাই হোক, রাজা যাবেন তীর্থে—তিন মাসের জন্যে। আমি তো যাবই। ইচ্ছে করেই তোমার নাম বলেছি। যাতে তোমার ওপর সন্দেহটা তাঁর কমে যায়। আমাকে তুটো একটা কথা বলেছেন, মনে হচ্ছে কিছু সন্দেহ করেন উনি। জানি না। একটু ক্রোধী মানুষ তো। সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে বলেন—কিস্তি রোজ চালায় কে? তুমি, না, ও?—বলেই বলেন—ঝগড়া করতে পাবে না। হেসে ফেলেন একটু। খুদাবক্স আশ্বস্ত হয়। নেমে এসে ঘোসকে সেলাম জানিয়ে প্রায় লাফিয়ে নেমে গিয়ে ঘোড়ায় ওঠে। মুরেঠা নাচিয়ে আবার সেলাম জানায়। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

তাকিয়ে থাকেন ঘোস। বুড়ো ঈশ্বরদাস হিসাব মিটিয়ে খাতা বগলে নিয়ে ছাতা খুলতে খুলতে বলে—আমার আপনার মতন বুড়ো চোখে ছোকরাকে দেখলে বড় খুশি আসে, না খাঁ-সাহেব? কি দেমাক, আর কি ঠাট!

ঘোস সম্মতি জানান। কিন্তু মানতে পারেন না। এতদিন আরাম আর খুশিই হচ্ছিল, ইদানীং একটু তুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। রাজার কথাবার্তা মনে পড়ে। খুদাবক্সের জন্যে তুশ্চিন্তা হয়। রাগ হয় মোতির ওপর। ঘোড়ায় চড়তে চড়তে, ঘোড়াকেই বলেন—যেখানেই মুস্কিল, সেখানেই কিছু ঘাগ্‌রী ওড়নার কারবার আছে। না কি রে বাহাতুর, বল্?

কানখাড়া করে একটু শোনে ঘোড়া। তারপর চালকের নির্দেশে চলতে থাকে তুল্‌কি চালে। ঘোস আখ্‌রোট খেতে খেতে পথ চলেন। ব্রিটিশ অফিসার খোদ এলিস সাহেব যে প্রাসাদের দিকে চলতে চলতে তাঁকে স্বীকারের নজিরে একটু মাথা নোয়ালেন—তা খেয়ালই হলো না তাঁর। একটু বিস্মিত হলেন

এলিস। তারপর হতাশভঙ্গীতে তিনিও মাথা নাড়লেন। বড় মুস্কিল এদের আদব-কায়দা বোঝা।

ন য়

শয়নকক্ষে সারি সারি রাজার পিতৃপুরুষের পুরনো ঢঙের তৈলচিত্র। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রাজার বক্তব্যটা যেন আরো জরুরী হয়ে ওঠে। সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের শঙ্খ চাপা দেওয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা টেবিলে পড়ে আছে। রাণী মাথা নিচু করে স্বামীর কথাই শুধু শোনেন। রাজা বলেন—একটি পুত্র আমাদের প্রয়োজন। কি দুশ্চিন্তা আমাকে অহর্নিশি অনুসরণ করছে, তোমাকে কি বলব। তীর্থে যাব স্থির করেছি, তার আগে তোমার ও আমার কোষ্ঠিপত্র পুনর্বার বিচার করিয়ে এনেছি কাশী থেকে। তোমার কোষ্ঠির বিচারে এক কথা বলে—তুমি নেবালকর বংশের যশের কারণ হবে। আমি তো বিচারে ভুল করিনি। যে যা চায় আমি দু'হাত ভরে দিই, আর ভাবি নিশ্চয় প্রসন্ন হবেন শঙ্কর। নইলে—। নইলে কি হবে ভাবতে গিয়ে দু'জনেরই চোখ পড়ে খোলা মানচিত্রখানার ওপর।

বাইরে পর্দা দুলে ওঠে। দাসী জানায় এলিসের আগমন বার্তা। রাজা বেরিয়ে যান। রাণী জানলা দিয়ে তাকান বাইরে। অঙ্গনে তাঁরই বয়সী তাঁর দাসীরা হাসাহাসি করে জল নিয়ে চলেছে পিতলের ঘড়া মাথায়। কেমন নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবন। কত হাসবার অবসর। বারান্দা ঘেরা ঘর। আলো বেশি আসে না। নরম গালিচায় পায়চারি করে দেয়ালের দিকে ফিরে আসেন রাণী। বিলম্বিত ছবিগুলোর বড় বড় চোখ স্থির দৃষ্টি। সকলের মধ্যে স্বামীর কথারই পুনরাবৃত্তি যেন ঝঙ্কৃত হয়—পুত্র চাই, বংশধর চাই, উত্তরাধিকারী চাই!

মনে মনে মহাদেবকে প্রণাম করেন রাণী। এত ব্রত, পূজা, উপবাস, তার সুফল নিশ্চয় মিলবে। প্রসন্ন হবেন মহাদেব। নইলে তাঁর জীবনটার মানেই তো যাবে হারিয়ে।

আসন্ন যাত্রার প্রাক্কালে মহাসমারোহে জলসা বসেছে। নাট্যশালা দীপমালা সজ্জিত। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে লাল গালিচা। দুই পাশে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভালাদার, রূপোর ভালা হাতে। তাঞ্জামে করে একে একে এসে নামছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ—রাজপুরুষ, ইংরেজ অফিসার আর বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অরছা ও দতিয়ার রাজা। প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা করে ভেতরে নিয়ে আসছেন রাজার কর্মচারীবৃন্দ। গালিচা ঢাকা ঘরে কুর্সি পড়েছে সারি সারি। হাজারখানা মোমবাতির ঝাড় ঝুলছে মাথার ওপর। পান, এলাচি ও আতর ফিরছে হাতে হাতে। দরজায় দরজায় পত্রপুষ্পের মালা।

রাজার অশ্বারোহীও গোলন্দাজ দলের বাছাই করা লোকরা দরজায় দরজায় সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বেরিয়ে যাবার দরজার মুখে দেয়াল হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুদাবক্স। মনটা তার ভালো নেই।

সে জানে দর্শকরা মোহর নিয়ে বসে আছেন। নাচ শেষ হতেই মোহর ছুঁড়ে দেবেন তাঁরা। মোতির পেশার সেও একটা অঙ্গ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দসই নয়। তা ছাড়া তার বা মোতির, এই জমায়েতের কাছে বেতনভোগী হাবিলদার বা নাচওয়ালী ছাড়া আর যে কোন পরিচয় নেই, সেই রূঢ় সত্যটা এই কায়দাদুরস্ত্ মজলিসে বসে যেমন মালুম হচ্ছে এমন আর কিছুতে না। গঙ্গাধর রাও কলারসিক মানুষ। কিন্তু এই জলসা একান্তভাবেই তওয়ায়েফ্ কায়দায় হবে।

একটু গরম লাগছিল খুদাবক্সের। সন্ধ্যার দিকে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সিদ্ধিমালাই খেয়েছে। খেলে নেশা হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই সাগর জিভ কেটে লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছিল উর্দুতে। তবু বে-চ্যয়ন্ বোধ হচ্ছে একটু, অস্বীকার করা যায় না। ঘৌস বাধ্য হয়ে বসেছেন চতুর্থ সারিতে, কিন্তু খুদাবক্সের দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকাতে ভুলছেন না। বাহ্‌রাম খাঁ ঢুকে ঘৌসের কানে কি বলে খুদাবক্সের পাশে এসে দাঁড়াল। বোধ হলো ঘৌস নিশ্চিন্ত হলেন।

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সহসা একসঙ্গে সারেঙ্গী ও তবলা

বেজে উঠল, আর জাফরান ঘাগ্‌রায় তুফান তুলে প্রবেশ করল মোতি। দর্শকরা যেন একবার নিঃশ্বাস ভেতরে টানলেন। রঙ, রেশম, জরি, গহনা আর বেণীতে ঘুর্ণি হাওয়ার মতো কয়েকটা পাক মেরে আসরের চার পাশে ঘুরে নতি জানিয়ে জরির একটা বৃত্ত রচনা করে ঘাগ্‌রা ছড়িয়ে দিয়ে মাঝখানে বসল মোতি। মাথায় মুক্তার সিঁথিমৌর, দীর্ঘ বেণীর প্রান্তে সোনার ঝিঁজর, চোলির নিচে গৌর দেহের একটু অনাবৃত অংশ। বুক থেকে গলা অবধি গহনায় ঢাকা, আঙুলে, মনিবন্ধে, সর্বত্র মোতি চুনী ও পান্নার ঝিলিক, ঘাগ্‌রার ঘের শেষ হয়েছে গোড়ালির ওপরে, গোড়ালি অবধি ঘনসবুজ পেশোয়াজ। হাল্কা জরির ওড়না আজ আর আবরণ নয়, আভরণ। সেই সরল, শান্ত লজ্জাবনতমুখী, একান্তভাবে খুদাবক্সের ওপর নির্ভরশীলা প্রেমিকাকে কোথাও খুঁজে পেলো না খুদাবক্স। এই লীলাচপলার গতিতে বিভ্রম, চাহনি মদালস ও উদ্‌ভ্রান্ত, এ যেন মোতি নয়, যেন কাঁচের পান-পাত্রে টলমল করছে তরল সুরা!

সুর্মাটানা চোখে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিলো মোতি। সকলেই তাকে তারিফ করছে চোখে চোখে। মৃদু শিহরণে মুখ নামাল মোতি, তারপর ধরল ঠুংরি—'কাঁহা শুনি ব্রজক বাঁশুরী—'।

এমন মিঠে ঝঙ্কার উঠল যে, মনে হলো গলায় নয়, কোন স্পর্শকাতর তারের বাজনায় ঝঙ্কার লেগেছে। মুখে মুখে তারিফ উঠল ঘর গম্‌গম্‌ করে।

গানের সঙ্গে সঙ্গে ভাঁও বাতায় মোতি। মুখে ভাববিলাস না খেললে ভূমিকা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। কখনো চোখের পাতা মৃদুকম্পনে শরম টানে, কখনো ভ্রূ ধনুকের মতো টেনে হয় বিজয়িনী, আবার ওড়না একটু ঢেকে, একটু খুলে নায়িকাসুলভ লীলা দেখিয়ে মোতি গান শেষ করে।

রাজার অনুসরণে মোহর পড়ে লাল শালুর ওপর।

কুড়িয়ে এবার নিতেই হবে। এমন পরীক্ষায় আর কখনো পড়েনি মোতি। আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়ে অবমানিতা মোতি আশ্বাস খুঁজে ফেরে চোখে চোখে। এক পলকে অনুভব

করে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার দিকে শিকারীর মতো চেয়ে কি যেন খুঁজছে।' নিচু হয়ে তুলে নেয় মোতি, আর কৃতজ্ঞতা জানায়। বিভ্রান্তিতে ওড়না একটু নিলাজ করে মোতিকে, হাতে মোহরগুলো কেমন যেন বেঁধে। ওদিকে সারেঙ্গীয়া তার নাচের সুর বাজিয়ে তুলেছে, এবার ধামারের লহরায় নাচবে মোতি। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে খুদাবক্স। চোখ নামিয়ে নিলো মোতি। সাবধান হয়ে থাকবার প্রয়োজন তাকে ভালো করেই সকালে বুঝিয়েছেন চন্দ্রভানজী। এতটুকু সন্দেহ যাতে কারো মনে না আসে, তাই দ্রুত প্রণতি সেরে একেবারেই নাচতে শুরু করল মোতি। পায়ের তালে তালে, ঘাগ্‌রা পেশোয়াজের দোলে, রঙিলা তানের ছোট ছোট ফুলঝুরিতে মনমাতানো এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। অরছার বিজয়বাহাদুর বেতালা তারিফ দিতে শুরু করলেন। ভ্রূভঙ্গে অসন্তোষ দমন করলেন গঙ্গাধর রাও। হাজার হলেও অতিথি। এতটুকু অসম্মান করা চলবে না। তাঁর ইজ্জতই খাটো হয়ে যাবে। শুধু নাচগানের নাটক নয়, ভেতরে ভেতরে আর একটা নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি অনিবার্যভাবে স্থানকালের পরোয়া না করে ঘনিয়ে আসছে, তা তিনি তখনো বোঝেননি। সিদ্ধির নেশা তখন মগজে উঠেছে খুদাবক্সের। আসরে যে নাচছে তার পায়ের তাল, বোল, মনের তুফান সবটা শুধু সেই বুঝছে। বুঝছে বলেই কেমন যেন অসহ্য লাগছে।

নাচ শেষ হতেই আবার মোহর পড়ল আসরে। নাচের নেশায় মোতিও একটু মাতাল। রাজার ঠিক সোজা নজরের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বেচাল সে করতে পারে না। বিশেষতঃ গুপ্তচরের মুখে খবর শুনে যখন রাজা চটে আছেন। আভূমি প্রণত হয়ে তস্‌লিম জানিয়ে মোতি উঠে দাঁড়াল। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ, চূর্ণ কুন্তল, কপালে ঘাম। তার দিকে চেয়ে কি একটা মন্তব্য করে দাঁড়ালেন ইংরেজ অফিসার আর বেশ জোরেই একটা তারিফ দিয়ে তরল হেসে ছুঁড়ে দিলেন একটা মুখবাঁধা লাল থলি। তুলে নিয়ে সেলাম করছে মোতি, হঠাৎ সমস্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে তার কানে এসে বাজল—মোতি ছুঁ না মত্! মোতি ছুঁয়ো না।

অবিশ্বাস্য এই ঔদ্ধত্য। একটি নিশ্চল মুহূর্ত, তারপরেই আবার শোনা গেল—কেন নিলে মোতি?

খুব নিচু গলা। শুধু চারিপাশ নীরব বলেই শোনা গেল। দুই চোখ ভয়ে অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে গেল মোতির। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কার ভরসা চাইল। তারপরই রাজাসাহেবের ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু চিৎকার শোনা গেল—বন্ধ করো!

কোলাহল উঠল নানা গলায়। তারই মধ্যে ছুটে এলেন ঘোস। প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বাহ্‌রাম খাঁ'র সঙ্গে খুদাবক্সকে দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দিলেন। বললেন—স্বরূপদাস মেওয়াওয়ালা, মানিকচৌক। তারপরই চলে এলেন ভেতরে।

হতবুদ্ধি খুদাবক্সকে টেনে নিয়ে বাহ্‌রাম ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। গলির কিনারে একটা পানের দোকান। তার পাশ দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এল একটা ফলের দোকানের সামনে। মুখে বসন্তের দাগ, কালো রঙ একজন আধবুড়ো লোক বাহ্‌রামকে দেখেই নেমে এল। পাশের দরজা খুলে তাদের ঢুকিয়ে নিলো। খুব দ্রুত কি যেন বললো তাকে বাহ্‌রাম খাঁ। লোকটা তাড়াতাড়ি মেঝেতে ময়লা মাদুরের ওপর শতরঞ্চের পাশা বিছিয়ে দিলো। পাশে রাখলো দুটো গেলাশ, একভাঁড় সিদ্ধি। বাহ্‌রাম খুদাবক্সকে বললো—শোন ভাই, খাঁ-সাহেবের হুকুম, আর তোমার জান বাঁচানোর জন্যেও বটে, এখনি হয়তো খুদা না করেন, তোমার খোঁজে ফৌজ আসবে। তুমি আজ যা করেছ, তাতে গর্দান চলে যেত যদি কোন কোন দরবারের মতো এখানেও পোযা গুণ্ডার চল্ থাকতো। অরছা দতিয়ার রাজা, আর অংরেজ অফিসারদের সামনে তুমি বেইজ্জতি করেছ রাজাকে। রাজা ধরতে পারেননি, কিন্তু তোমার ওপর সন্দেহ তো তাঁর চট করেই আসবে। খেয়াল হয় খবর নিতে এখুনি লোক আসবে—

নেশার ঘোর আর চমক তখন অনেকটা কেটেছে। খুদাবক্সকে বাহ্‌রাম আবার বললো—কোন কথার জবাব দেবে না তুমি, দেখাবে যে, নেশায় একেবারে চুর হয়ে আছ। ভাই স্বরূপদাস—আজ

সন্ধ্যে থেকে, এই খাঁ-সাহেব, তুমি আর আমি এখানে পাশা খেলছিলাম—কোথাও যাইনি।

মোমবাতি বসানো লণ্ঠনটা টুলে বসিয়ে কাছে টেনে আনল স্বরূপদাস। খুদাবক্সের পাগড়িটা খুলে পাশে ফেলে দিলে। গলার বোতামগুলো খুলে দিলে, নাগরা টেনে রাখলে পাশে, তারপর হাতে ধরিয়ে দিলে সিদ্ধির গেলাশ।

বাইরে পাথরের রাস্তায় খটাস্ খটাস্ করে চার পাঁচ জোড়া নাল বসান জুতোর শব্দ হলো। পরুষকণ্ঠে কে দরজা খুলতে বললো।

পাশায় দান ফেলে জড়ান গলায় বিশ্রী গালি দিয়ে উঠল বাহ্‌রাম। খুদাবক্স তার জামা চেপে ধরল। জড়িতকণ্ঠে বললো—এই গালি দে না মত্। কেয়া তুম বড়ে রাহীস্ আদ্‌মী হো?

দড়াম্ করে দরজাটা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন রিসালাদার রঘুনাথ সিংহ। জিজ্ঞাসা করলেন,—কতক্ষণ হলো এসেছে খাঁ-সাহেবরা?

—সন্ধ্যে থেকে বড় গোল লাগিয়েছে কুঁয়ার সাহেব, দু'ঘণ্টার ওপর হল্লা করছে,—বলছি হুজুর আমার একটা ছাড়া ঘর নেই।

হাতের একটা ঝাপটা মারা ভঙ্গীতে তাকে নাকচ করে দিয়ে রঘুনাথ বললেন, বাহ্‌রাম, খুদাবক্স এখানে ছিল? ইস্‌মে কোঈ ফন্দাবাজী ঔর ফিকর নেই হ্যায়!

—কিছু না হুজুর—ছুটি মিলেছিল তাই একটু ফুর্তি করতে বসেছি। বিশ্বাস না করুন তো—

রঘুনাথ সিং বললেন—আমি বিশ্বাস করব কিনা সেটা বড় কথা নয়—আজ যা হয়ে গিয়েছে, তেমন কখনো হয়েছে কিনা জানি না। খুদাবক্সের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। একটা তীব্র অস্বস্তির অনুভূতি—অনেককাল পরেও মনে পড়ত খুদাবক্সের—যেন তার মনের তলা পর্যন্ত খুলে খুলে দেখছেন কুমারসাহেব।

তাঁরা চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে খুদাবক্স,

স্বরূপদাস ও বাহ্‌রাম। নিজের আচরণের গুরুদায়িত্বটা বোঝে কিনা খুদাবক্স কে বলবে! তুফান একটা উঠিয়েছে সে। ঝাঁপ্‌টাটা মোতির ওপর দিয়ে কতখানি যাবে সেই হয় তার একমাত্র ভাবনা। তারপর স্বরূপদাসের হাতটা চেপে ধরলো। বললো—বাঁচিয়ে দিয়েছ ভাই।

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বাহ্‌রাম বললো—আজকের রাত কেটে যাক্, তারপর তুমি ধন্যবাদ জানিও। এখনো সময় হয়নি।

পরে যখনই খুদাবক্স সেই রাতের কথা স্মরণ করেছে, তার মনে পড়েছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ফৌজের হল্লা, দপ্ দপ্ করে মশালের আলো নাচিয়ে চারজন সিপাহীর ক্রমাগত টহল। সেই রাতে, অসহায় ক্রীড়নকের মতো তার নিজস্ব অনুভূতি আর আবেগ শুধু চরকিবাজি খেয়েছিল। কেননা ঘটনা তাকে আর মোতিকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। তার প্রমত্ত উক্তিতে ইজ্জতে ঘা লেগেছিল সামন্ততন্ত্রের। ক্ষেপে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সিংহের প্রতিভূ। মনে পড়ছে সেই রাতে বাহ্‌রাম ও স্বরূপদাসের মুখে লণ্ঠনের লাল আলোয় চরম বিশ্বস্ততার দৃঢ় মনোভাব ফুটে উঠেছিল। আরো মনে পড়ছে, রাত যখন দুটো বাজলো, তখন ক্লান্ত চরণে রাজপ্রাসাদ থেকে সেই ঘরে এলেন ঘোস। তাঁকে দেখে মনে হলো, অনেক সংগ্রামের ক্লান্তি তিনি বয়ে এনেছেন। তাকে ডাকলেন ঘোস, বললেন—তোমার জন্যে আমি রাজার সঙ্গে তর্ক করলাম খুদাবক্স, কথা আদায় করলাম যে, তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আমার ইজ্জতের কথা আর ভাবলাম না, কেননা তোমার ভবিষ্যৎ ব্যবহারের ওপর আমার ইজ্জতের ভার রইল। কিন্তু এ তুমি কি করলে, আমার একটা মানাও শুনলে না?

মনে পড়ছে খুদাবক্সের, মাথার মুরেঠা খুলে ফেলে চরম ক্লান্তির ভঙ্গীতে ঘোস বসেছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে খুদাবক্সের নিজের মনে তখন লজ্জা ও অনুশোচনার ঝড় উঠেছিল।

আর সেই রাতে যখন খুদাবক্স ঘুমিয়ে পড়ল, ঘোসের চোখে কিন্তু ঘুম এল না। মনে পড়লো রাজাকে তিনি বলেছিলেন—আজ তুমি মস্ত রাজা হয়েছ, কিন্তু ভুলে যেও না একদিন আমিই তোমার সঙ্গী ছিলাম। তখন বড় ভাইয়ের মতো তোমাকে দেখ্-ভালাই

করেছি। আমি স্বীকার করছি, খুদাবক্সকে আমি স্নেহ করি। তাই বলছি, সে বালক, তাকে তুমি ক্ষমা করো। আমার ইচ্ছা আমি জানালাম মাত্র। যা তোমার বিচার তাই করো তুমি—

রাজা মেনেছিলেন তাঁর অনুরোধ।

কিন্তু তিনি কি করে খুদাবক্সের হয়ে কথা দিয়ে এলেন? সে কি তার কথা মানবে? জোয়ানীর ধর্মই নয় কি বিশ্বাসঘাতকতা করা? তাঁর কথা তো সে মানবে না।

আঘাত লেগেছে তাঁরও। তিনিও হৃদয়ঙ্গম করেছেন, এই পাঠানযুবককে তিনি কতখানি ভালোবেসেছেন। আর তা বুঝেই মনে হয়েছে এই ভালোবাসা তাঁকে নীতিচ্যুত করবে। আবার কখনও মনে হয়েছে সেই নাচওয়ালীর কথা। তার প্রেম শুধু সর্বনাশ আনবে, তবু খুদাবক্স তাকে পরিহার করবে না, সেই সামান্য রমণীর নয়নের ইঙ্গিত মাত্রেই তাঁর সমস্ত শুভেচ্ছা ও নিজের প্রতিশ্রুতি পদদলিত করে সে চলে যাবে।

মোতি নাচওয়ালী। ভালোবাসার ফাঁদ পরিয়ে সে বন্দী করতে পারে প্রেমিককে, তার প্রেম শুধু দুঃখ আনবে জেনেও সে মুঠো আলগা করতে জানে না। জানে না যে, প্রেমিকের কল্যাণের জন্য প্রেমিকার আত্মত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। জানে না যে, সেই ত্যাগই হলো প্রকৃত প্রেম।

জানে না যখন, তিনিই জানাবেন। প্রয়োজন হলে যেমন গুলী করে মেরে ফেলা হয় আহত ঘোড়াকে, নির্মম অস্ত্রোপচার চলে সৈনিকের ক্ষত-বিক্ষত দেহে, তেমনই প্রয়োজন অনুভব করছেন ঘৌস। একটা ঘা তাঁকে দিতে হবে। যোদ্ধার মতো সুকৌশলে, অথচ আঘাত হবে মর্মান্তিক। নইলে খুদাবক্সকে বাঁচানো যাবে না। তার বাপদাদার মতো সেও কিসমতের হাতের পুত্‌লার মতো, খড়কুটো হয়ে নাকচ হয়ে যাবে। জীবনটার দিশা থাকবে না।

প্রৌঢ় যোদ্ধা ঘৌস, রণনীতিতে সুনিপুণ তিনি। কিন্তু এক বাঁধন কাটবার জন্যে যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, তার উৎস স্থলে কোন্ অনুভূতি কাজ করছে তা কি তিনি বুঝেছিলেন? বুঝেছিলেন, কি যে, মোতির হাত থেকে খুদাবক্সকে নিয়ে আসতে

চায় তাঁর যে সত্তা, সেও সমান লোভী, অধিকারলোলুপ এবং অন্ধ? নিজের অনুভূতির স্বরূপ অবচেতন রইল নিজের কাছে, এই বোধ হয় ভালো। কারণ নিজেকে দেখবার দূরদৃষ্টি সে রাতে ঘোসের ছিল না, থাকলে তিনি হয়তো শিউরে উঠতেন।

অন্ধ প্রেম যদি মৃত্যুবাহী হয়, অন্ধ বাৎসল্যও সমান মর্মান্তিক।

দ শ

অগ্নি, নৈঋত ও ঈশান কোণে মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে বলে বোধ হয়েছিল মোতির। কিন্তু সেই মেঘে যে প্রলয় উঠবে সে ধারণা তার ছিল না। ধারণা ছিল না যে, দুনিয়ার চোখে তার কোন দাম নেই। রাজার রূঢ় পরুষভাষণে অনেক সত্যই উদ্‌ভাসিত হয়েছে মোতির মনে। জেনেছে রাজ্যের পরিধি যাই হোক, সামন্ততন্ত্রের প্রাপ্য সম্মানের উচ্চমান গগনচুম্বী। বিদেশী অফিসারের সামনে অপমানিত হয়েছেন রাজা। তওয়ায়েফের এতখানি স্পর্ধা সহ্য করা সম্ভব নয়। অপরাধীর নাম রাজা জানেন, এবার তাদের ক্ষমা করা হলো, কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝে চলতে হবে।

আর সেই ভবিষ্যৎটাই যেন হারিয়ে গেল মোতির চোখে। রাতভোর ভেবেছে। সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ তবু খাটে বসে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। ভাবনার কালীদহে কূল পাচ্ছে না তার মন রশি ফেলে ফেলে। এও বুঝছে সে, রাজার নিষেধ মানবার চেয়ে মৃত্যু বরণীয়। কেননা খুদাবক্স ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

মন্নু সারেঙ্গীয়া বার্ধক্যের রেখাবলয়িত জরাজীর্ণ হাতখানা মাথায় বুলিয়ে তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে তার মায়ের কথা। বলেছে, মন্থনে গরল উঠবে জেনেশুনেও গভীর প্রেমভরে প্রেমাস্পদের মুখ চেয়ে ভবিষ্যতের আঁধার দরিয়ায় ঝাঁপ দেবার যে চারিত্রিক আদল, তা নাকি এসেছে রোশানের কাছ থেকে।

সে কথা যাচাই করবার মন মোতির নেই। তার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বর্তমান, তাও একজনের মুখ চেয়ে।

তুনিয়াতে তারও আর কেউ নেই, বিত্ত নেই, পিতা নেই, বন্ধু নেই, শুধু নিজের জোরে এই তুনিয়াতে মাথা তুলে চলবার ফিরবার মতো একখানা আকাশে নিজের মালিকানা কায়েম করবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

সেইখানেই চরম আশ্রয় মোতির। নর্তকী হয়ে নয়, বহুজনের ঈর্ষা ও কামনার লক্ষ্য হয়ে নয়, একজনের একান্ত হয়ে, তার সঙ্গে জীবন বেঁধে, তার পাশে থেকে তবেই তার সার্থকতা মিলবে।

ভেবে ভেবে মনের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে, আর তাতে পুড়ে পুড়ে মোতির রূপ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতির ছায়া দেখে কিরকম বিস্ময় লাগলো মোতির! আরেকজনের জীবনে সর্বনাশ এনেছে, এতখানি বিপদ নিজের মাথার ওপর টেনে নামিয়েছে, তবু রূপ ম্লান হয়নি! চুনী, পান্না, হীরে, মোতি, সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে নিষ্ঠুর দ্যুতিতে। কাল এসব ফেরত পাঠাতেও ভুল হয়ে গিয়েছে নাট্যশালার তোষাখানার মালিক মালহরির কাছে।

সহসা চমক ভাঙলো। দাসী খবর দিলো ঘোস এসেছেন। তিনি নিচে অপেক্ষা করছেন।

ঘোস! কেন? তবে কি খুদাবক্সের কোন খবর এনেছেন অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে ত্বরিৎ গতিতে নেমে এল মোতি। পর্দা সরিয়ে ঢুকল ঘরে। ঘোস তাকালেন তার দিকে। তাঁর চোখে অবিশ্বাস, অনুকম্পা আর কঠিন কর্তব্যের সংকল্প। চঞ্চল চরণ থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে একপাশে বসে পড়লো মোতি, ঘোসকে কুর্সি দেখালো।

নিদারুণ কর্তব্যের বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন ঘোস, তাই বিলম্ব না করে বলতে শুরু করলেন। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে যেন পাথর হয়ে যেতে লাগল মোতি।

ঘোসের কথাগুলো নিষ্ঠুর আঘাতে সজোরে ঘা দিতে লাগল তার চেতনার ওপর, তার বেদনা-অনুভূতি তন্ত্রীগুলোর ওপর। ছেড়ে দিতে হবে! তার মা আছে ঘরে, সে গরীব ঘরের ছেলে, তার ভবিষ্যৎ আছে, এই তার জীবনের শুরু, যদি ছেড়ে না দাও তুমি, তাহলে সব নষ্ট হয়ে যাবে, সর্বনাশ হবে, বন্যার মুখে খড়কুটোর মতো তার দাঁড়াবার ভিত্তিটাও উপড়ে ভাসিয়ে নেবে তুর্দৈব!

আহত আত্মসম্মানে উঠে দাঁড়াল মোতি। কথা তারও আছে। বলে—আপনার মুখে আমি তার কথা শুনবো না খাঁ-সাহেব, সে নিজেই আমাকে সব বলেছে।

—কি তোমাকে বলেছে সে? বলেছে কি যে, দশদিন যখন জখম হয়ে পড়েছিল, তখন তাকে মলমতাগিদ করে বাঁচিয়েছি আমি? তুমি তাকে দেখেছো নওজোয়ান। কিন্তু তুমি তো সে-দিনগুলোর কথা জানো না মোতি যে, শিশুর মতো সেবা করে বাঁচিয়েছি ওকে, যখন রাতের পর রাত মৌত এসে শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকতো! কাজ শিখিয়েছি, কাজ দিয়েছি, ইজ্জত দিয়েছি, তার বাপ নেই, ভাই নেই, ভালোমন্দের কথা আমি ভাববো না? বে-করার হয়ে যাব ইন্‌সাফের কাছে!

—সে আমাকে ভালোবাসে।

—তুমিও তো তাকে ভালোবাসো?

—জরুর, বলে রাণীর মতো সদর্পে ঘাড় ঈষৎ বাঁকাল মোতি,—তাই তার ভালোমন্দ, সব দেখবো আমি। আমি তার জন্যে সব করবো।

—তুমি কি করবে মোতি? কি করতে পারো তুমি? কতটুকু তোমার ক্ষমতা?

—ভালোবাসতে পারি।

—এ ভালোবাসা দিয়ে সে কি করবে? এখান থেকে ওখানে ফিরবে কিছুদিন, তিসরাদিন ও-ই তোমাকে ধিক্কার দেবে। বলবে আমি পুরুষ। শুধু এখানে ওখানে বেইজ্জতি জীবন নিয়ে টক্কর খেয়ে ফিরলে আমার চলবে না। শুধু মুহব্বতে কি হবে মোতি, পুরুষ চায় সম্মান, যশ আর প্রতিষ্ঠা।

বসে পড়ল মোতি বিবশা হয়ে।

ঘোস অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন—তার মা কষ্ট করে দিন চালাচ্ছে, ছেলে একদিন উপযুক্ত হয়ে তার জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ধুয়েমুছে দেবে। আজ তুমি ভাবছ একরকম। কিন্তু তিনদিন পরে সেই তোমাকে দোষ দেবে। তুমি তো মেয়ে মোতি, সেদিন কেমন করে সইবে? তাই বলছি সব ভেবে দেখো, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।

গত রজনীর দুঃসহ গ্লানির যন্ত্রণা এতক্ষণে বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে

ঝরতে লাগল। মোতি বললো—আপনার এক্তিয়ার আছে তার জীবনের ওপর, আপনি তাকে নিয়ে যান। আমি কে? কতটুকু আমার ক্ষমতা? আমি তো তাকে ধরে রাখিনি।

কত বড় অন্যায় করছেন জেনেও বিচলিত হলেন না ঘোস। বললেন—তোমার জয় পুরা হয়ে গিয়েছে মোতি। আমার একটা কথাও সে মানবে না। তোমাকেই বলতে হবে সব।

—আমাকেই বলতে হবে? রুদ্ধ অশ্রুর বাঁধ ভেঙে বন্যা নামলো। মোতি ফুলে ফুলে উঠলো কান্নার আবেগে। বললো—তওয়ায়েফ, নাচি, গান গাই, আর যা খুশি আসে তাই বলো! তোমরা বিচার করো, আমরা শুনি। কিন্তু আমি তো মানুষ, আমি তাকে ভালোবাসি, তাকে আমি মুখ ফুটে বলবো, চলে যাও আমাকে ছেড়ে? এ তুমি কি বলছো খাঁ-সাহেব! এ কি কখনও হয়েছে? এমন কোন নজীর আছে?

—ভালোবাসলেই ছাড়তে হয় বেটি। তোমার প্রেম যদি সত্যি হয়, তবে তার ভালাই-এর জন্য সদ্‌কা করো, তোমার আশ্‌ক বিলিয়ে দাও তামাম দুনিয়ার দরবারে। সবাই দেখুক আর মানুক যে, হ্যাঁ, মোতির প্রেম সাঁচ্চা ছিল বটে।

—না, না, না! ঈষৎ রক্তাভ শুভ্র আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে অমূল্য মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু উৎসারিত হয়। মাথা নাড়ে মোতি। না, কিছুতেই পারবে না সে!

—আজই তার কাজে মন নেই, হুঁশ হারিয়ে কত কি করছে। বলো তুমি, যাকে ভালোবাস, তার তো ভালোই দেখতে চাইবে। না কি দেখতে চাইবে দিন থেকে দিন তার খারাপ হচ্ছে, সে নেমে যাচ্ছে। প্রেম তো শিকলি নয় যে, কয়েদ করবে, বেঁধে রাখবে, নিচে টেনে রাখবে—ছেড়ে দাও, উঠতে দাও, মানুষের মতো হয়ে দাঁড়াতে দাও।

—ওকে চোট দেবো কি করে?

—কলিজার চোট মরদকে ঘায়েল করে না, মরদ ভেঙে যায় যদি ইজ্জত চোট খায়।

মোতি চোখ মুছে ঘোসের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললো—খাঁ-সাহেব আপনার কোনও মতলব আছে

কি না আমি জানি না। জানি না, নদীর গহীরে আরো কোন চোরা স্রোত বইছে কি না। কিন্তু আপনি আমাকে জানেন না খাঁ-সাহেব। আমি যদি ভালো বুঝি, তো ঠিক আমার ধর্মমতো আমি কাজ করবো, চাই তো কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাক! কিন্তু জানবেন, তখন যদি দেখি, আপনি আমার সঙ্গে দু'মুখে কথা বলেছেন, অন্য কোন মতলব আপনার ছিল, তাহলে কিন্তু ক্ষমা করবো না। আপনাকে আমি ছাড়বো না। জবাব আদায় করবো। এ কথাও খেয়াল রাখবেন। আপনি এখন চলে যান।

একটু আত্মস্থ হয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘোস বেরিয়ে গেলেন। এসেছিলেন এক ধারণা নিয়ে, কিন্তু যাবার সময় সম্ভ্রম বয়ে নিয়ে গেলেন।

উপরের ঘরে এসে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদলো মোতি। কাঁদলো এই জন্য যে, ঘোসের কথায় কিছু সত্য ছিল। কাঁদলো এই জন্য যে, খুদাবক্সের কল্যাণের জন্য নিজের সমস্ত দাবী ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত। তবুও কাঁদলো। কারণ এই ত্যাগ করতে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে! মাত্র উনিশ বছর বয়স তার। এই পরিপূর্ণ যৌবনে, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ-সাধ অনাস্বাদিত রেখেই তাকে মরতে হবে তাই ভেবে। খুদাবক্স বেঁচে থাকতে সে মরতে পারবে না। কিন্তু এও তো মরণেরই দোসর।

দুনিয়ার নাটে কতই না আশ্চর্য খেলা ঘটে! বহুজনের স্বপ্নপ্রেয়সী যে রাজনর্তকী, ভাগ্যের বিধানে তারই স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে। এও এক আশ্চর্য খেলা! চিক্, কণ্ঠি, মৌলী, কর্ণিকা ও কঙ্কণ খুলে ফেললো মোতি। নিরাভরণ বক্ষে মাটিতে উপুড় হয়ে বহুক্ষণ কাঁদল সে। প্রাচীরে বিলম্বিত চিত্রপট থেকে যেন সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন রামকেলী, মল্লার, তোড়ি, কৌশিক ও মালকৌশ।

গভীর রজনী। শহর ছাড়িয়ে পশ্চিম উপপ্রান্তে এক নির্জন উদ্যান। মোতির নিজস্ব সযত্ন-পালিত এই বাগান। সখ করে একদা আমগাছের সঙ্গে জুঁইয়ের লতার বিয়ে দিয়েছিল মোতি বাজনা বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে, অত্যন্ত ধুমধাম করে। ছলনা করে

জুঁইয়ের লতা পাশের একটি বকুল গাছকে আশ্রয় করে কিন্তু জড়িয়ে উঠল ফুল ফোটবার সময়ে। তার আচরণকে সকৌতুকে তিরস্কার করে মোতি আমগাছের তলার বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমের মঞ্জরীর মৌশুমে, এখানে বসে জুহী, শোহ্‌নী ও হীরাকে নিয়ে কত আনন্দ করেছে, ঝুলনা টাঙিয়ে দোলা খেয়েছে, কখনো বনভোজন করেছে অগ্রহায়ণ মাসে। লোধী ছেলেমেয়েরা কাঠ কুটো পাতা কুড়িয়ে দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে শাকসব্‌জি কিনেছে, দুধ কিনেছে, দাম দেবার সময় হিসেব মানেনি।

অনেক সুখস্মৃতি জড়িত এই বাগানেই আজ দেখা করবে খুদাবক্স। বিকেলে খুদাবক্সকে সে-ই খত পাঠিয়েছে জুহীকে দিয়ে সুকৌশলে। তারই নির্দেশে আসছে খুদাবক্স।

অনেক দিন আগে যখন খুদাবক্সকে জানতো না মোতি, তখন এই বাগানেই সখীদের অনুরোধে সে গান গেয়েছিল—'বীতে দুখকে দিন আওয়ে বসাওয়ান্ত্'—পদটির বক্তব্য ছিল, দুখের দিন বিগত হয়েছে হে সখী, প্রিয়তম আসছেন, তাই বসন্ত উদিত হচ্ছে কাননে। সেদিন বোধ হয় অনাগত ভবিষ্যতের ডালির আনন্দ-সম্ভার কল্পনা করেই সেই গান এসেছিল তার মনে। আজ এই আখেরী মিলনের দিনে, সেই গানের কথা বার বার স্মরণ হচ্ছে আর মনে হচ্ছে বসন্তকে চির বিদায় দিতেই সে এখানে এসেছে। কিন্তু মাঝখানের বিগত দিনগুলোর কি প্রয়োজন ছিল? ন জানে, ন পহ্‌চানে, ন দিল্ লগাতা, ন প্যার হোতা—পরিচয় না হলে তো চিত্ত বিবশা হতো না, ভালোবাসতো না সে!

শুকনো পাতায় দ্রুত অধীর পদক্ষেপ শোনা গেল। এগিয়ে এল খুদাবক্স। সেই পরিচিত আবেগ জড়িত প্রিয়কণ্ঠ শোনা গেল—মোতি!

যদি কোথাও থাকো দীনদুনিয়ার দরদী মালিক, তবে এই সময় পাশে থেকো, আমাকে সাহস দাও, মনে মনে প্রার্থনা করলো মোতি।

—মোতি! একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল খুদাবক্স।

তার ব্যগ্র বাহু থেকে সজল চোখে একটু হেসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো মোতি। বললো—বসো, কথা আছে।

—বসবো, আগে তোমাকে ভালো করে দেখি। ওঃ, কি দিনটাই গিয়েছে মোতি, তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না? তোমাকে কি বলেছেন কিছু?

—তোমার কষ্ট হয়নি?

হাত নেড়ে খুদাবক্স তার আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিলো। বললো—কষ্ট আবার কি! আর এখানে তো আমি থাকবো না—চলে যাচ্ছি—

—চলে যাচ্ছ?

—তুমিও যাচ্ছ, আমি একা যাচ্ছি না কি? আমরা পালাচ্ছি অনেক দূরে। আগে যাবো আমার মা'র কাছে।

সম্মোহিত হয়ে চেয়ে থাকে মোতি। বলে—তারপর?

—তারপর কি করবো, তা ভাববো কেন এখন? যা হয় করবো। কেন ভরসা হচ্ছে না? পাঞ্জাখানা দেখো, হাতখানা দেখো—আর দরকার হলে সব কিছু করবো—

নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিজেই মনের খুশিতে হাসে খুদাবক্স। অসীম আত্মবিশ্বাস তার। হাতে জোর আছে, তুনিয়া পড়ে আছে, যা হয় একটা কিছু করবে সে। পরোয়া করে কি হবে?—কাল কৌন দেখা হ্যায়? কালকের চেহারা ভাবছো কেন মোতি? আজকের কথা ভাবো—এই মুহূর্তের কথা ভাবো—এইটেই সত্যি।

বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্কল্প জ্বল্‌জ্বল্‌ করে খুদাবক্সের মুখে। সেই মুখের দিকে চেয়ে মোতির ভয় হয় বুঝি বা সব সঙ্কল্প তার ভেসে যাবে। সময় আর নেই। তাই সে জোর করে বলে—তুমি ভুল করছ খুদাবক্স। আমি তো তোমার সঙ্গে যাবো না।

—কি বললে?

—আমি তোমার সঙ্গে যাবো না।

—তবে কি করবে? পরে আসবে কার সঙ্গে, কেমন করেই বা আসবে?

মাথা নাড়ে মোতি। খুদাবক্স বসে তার হাত টেনে নেয় নিজের হাতের মধ্যে, মোতি হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে—ভুল বুঝো না খুদাবক্স, শুধু আজ নয় কোনদিনই তোমার সঙ্গে আমি যাবো না।

চরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে খুদাবক্স।

মোতি বলে—সেই কথা বলতেই তোমাকে খত পাঠিয়েছিলাম আমি।

সবিস্ময়ে শোনে খুদাবক্স।

—যা হয়ে গিয়েছে, তার কথা ছেড়ে দাও খুদাবক্স। ও তো তীরের মতো ছুটে গিয়েছে, এখন ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

—এ সব তুমি কি বলছ মোতি?

—বলছি গত ছ' মাসের কথা ভুলে যাও। ভুলে যাও যে আমাকে তুমি চিনতে বা জানতে। কেননা ভুল করেছি আমি, সেই ভুলের জের আর টানবো না। আমার সঙ্গে তোমার—

আর কোন সম্বন্ধ নেই এই কথাটা বলতেও যেমন পারে না মোতি, শুনবারও তেমন ধৈর্য থাকে না খুদাবক্সের। রক্ত ক্ষেপতে থাকে তার। চরম বেইমানী উক্তির উত্তরে সে গম্ভীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—জবান্ সামলে কথা বলো মোতি। এ নাট নয়, আমিও নাটের কদরবান্ আমীর নই।

—কিন্তু আমি তো সেই নাটেরই তওয়ায়েফ্! আমি তো আমাকে ভুলতে পারি না। তোমার সঙ্গে আর দেখাশুনা হবার কোন মানে হয় না—আমার কথা তুমি ভুলে যাও।

—ভুলে যাবো! তবে এই দিনের পর দিন কথা, গান, হাসি, আর এত রকমের জবানবন্দী কী সব মিথ্যে? তুমি মিথ্যা? তুমি বেইমান?

স্বেচ্ছায় অমৃতে গরল মিশিয়ে আত্মঘাতী হবার বাসনা জাগে মোতির—নিজের সর্বনাশ ঘটাবার সঙ্কল্প তার দৃঢ়তর হয়। সেও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমি বেইমান নই—আমি নাচনেওয়ালী। এ রকম কারবার হালফিল করি আমি—সেটাই আমার ইমান। তোমার সঙ্গে আমি কোথায় যাবো? সেই কুঁড়ে ঘরে? গরীব-খানায়? সেখানে আমার কোন্ সুখ? কিসের আশা? চারজন দাসী আমার মদৎ করে, আর আমি যাবো তোমার ভাঙা ঘরে বসে রুটি বানাতে?

—খবরদার! আমার ঘরের কথা তোমার মুখে এনো না! খুদাবক্স ঠেলে, সরিয়ে দেয় তাকে।—মিথ্যা কথা বলেছ, বেইমানী

করেছ, আমার সমস্ত দুনিয়াকে জ্বালিয়ে দিয়েছ, এই পর্যন্ত, আর এগিও না!

—এই কথা থাকল তবে! আমি চলে যাই?

—আমিও চলে যাচ্ছি, বলে খুদাবক্স আবার এগিয়ে এল কাছে। অন্তর্দাহনের জ্বালা গলায় নিয়ে বললো—নাচনেওয়ালী! তওয়ায়েফ্! যাদুগরনী! আমার ভুল হয়েছিল। সোনার শিকলিতে বাঁধা থাকো বুলবুল, গোলামি করতে থাকো। এর বদলা আমি এখনই নিতাম, কিন্তু তোমাকে তো আমি ছোঁব না।

—খুদাবক্স—

যন্ত্রণার ঝড় উঠেছে আর তাই খুদাবক্সের মুখ থেকে ছিটকে বেরুলো কথাগুলো: কেন তবে আগে বললে না মোতি, কেন জানতে দিলে না যে, আমি চাঁদ ধরতে গিয়েছিলাম? তোমাকে তো আমি কোন কথা লুকোইনি। চাষী কিষাণের ছেলে, তামাম দুনিয়ায় কেউ নেই, একটু ভালোবাসার ভিখারী ছিলাম, সব কথাই তো বলেছিলাম—তবে কেন এমনি করে আঘাত দিলে?

—আমি চলে যাচ্ছি—

—তুমি যাও না যাও, আমার চোখ থেকে তুমি হারিয়ে গিয়েছ। এখন আমি কি করবো! উপড়ে তো ফেলে দিতে পারবো না, নয় ফেলে দিতাম—

—খুদাবক্স!

মোতির অনুনয় জড়ানো হাত ঠেলে দিলো খুদাবক্স। বললো—ভুল করেছি। মাপ করো।

চলে যেতে যেতে ফিরে এসে আবার বললো—যাবো যখন ঠিক করেছি তখন যাবোই, একই সূর্যের তলায় এক জায়গায় তোমার সঙ্গে থাকবো না···তাতে তোমার কি ক্ষতি আছে, অন্য কোন সমঝদার জুটে যাবে—আমার মতো গাঁওয়ার নয়, গরীব নয়—সেই তোমার ভালো···ব্যস কি বলো নাচনেওয়ালী!

—অনেক বলেছ খুদাবক্স আর বলো না—

—ও, সময় বুঝে গলায় হামদরদীর সুরও আসে! দেরি হয়ে গিয়েছে মোতি, আর নিজেকে ভুলে যাবো না—চলে যাবো আর তামাম দুনিয়াকে শুনিয়ে যাবো—মোতি বেইমান! মোতি

মিথ্যাবাদী—জবান ইজ্জত আর দিল্ তিনটেই তার জ্বলে খাক হয়ে গিয়েছে!'

বনপথে চলে যেতে যেতে শেষ কথা বলে গেল খুদাবক্স—হারামী করেছ তুমি! নটী! তারপর অপেক্ষমান ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। চাবুক কষিয়ে ঘোড়াকে উড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

সান্ত্বনা এই যে, মোতি সেই দৃশ্য দেখল না। তার আগেই সে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল।

দুই পাশের আঁধার, আরো নিবিড় হয়ে আসুক, আর ঢেকে দিক খুদাবক্সকে, তাতেই বোধ হয় সে সান্ত্বনা পাবে।

নিজের ঘরে না ফিরে, অপেক্ষমান বাহ্‌রামের হাতে খত পাঠিয়ে দিয়েছিল খুদাবক্স ঘোসের কাছে।

বাহ্‌রাম তার কোন মানা শোনেনি। টাকা আর আশরফি ভরা একটা থলি তুলে দিয়েছিল তার হাতে। বলেছিল—তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে আমি মিটিয়ে নেব।

বিদায় বেলায় এই চরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর হাত চেপে ধরে খুদাবক্স আর কোন কথা বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল—মনে রেখো।

বাহ্‌রাম অনুনয় করে বলেছিল—একবার ঘরে চলো, ওস্তাদের সঙ্গে দেখা করো।

খুদাবক্স মানতে পারেনি। তার দিল্ টুকরো টুকরো হয়ে ছুটে গিয়েছে এই জায়গা থেকে, এখানে তার ঘর নয়। বললে—ভেবো, কোন মুসাফির এসেছিল কিছু হামদরদী প্রাণের সন্ধানে। দু'দিন বাদে সে-ই চলে যাচ্ছে। তাতে কারো কোন দুঃখ নেই।

একটা চোখ অন্ধ, তবু এক চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতেই সেদিন অনেক দূর দেখেছিল বাহ্‌রাম। সান্ত্বনার কথা বলে আর বন্ধুকে অপমান করেনি। মাঝরাতে ফটক খুলিয়ে দিয়েছিল ঘুষ দিয়ে। খুদাবক্স বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। নির্জন রাস্তায় একা ফিরতে ফিরতে এমন আজব মনে হয়েছিল দুনিয়াদারিটা যে, কোথাও কোন মিল খুঁজে পায়নি বাহ্‌রাম।

রাশি রাশি আঁধার কেটে উড়ে চলেছিল খুদাবক্স। শহর

জনপদ পিছনে ফেলে, একেবারে চলে গিয়েছিল জঙ্গলের সীমান্তে বেতোয়ার ধারে। তৃষ্ণার্ত ঘোড়াকে জল খাইয়ে নিয়ে আবার চলেছিল পশ্চিমের পথ ধরে।

বন্ধ্যা প্রকৃতি, কঠিন পথ। ঘোড়ার খুরে খুরে বিজলীর টুকরো খেলছে, নিশাচর শ্বাপদ সভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। দূরে দূরে গ্রামে, যে যার ঘরে সুখনিদ্রায় সুষুপ্ত। সকলের জন্যেই ঘর আছে, শান্তি আছে, ঠিকানা আছে। শুধু তারই কোন দিশা নেই। অন্তরে বহ্নিশিখায় জ্বলে জ্বলে ভাস্বর হয়ে উঠল নিখাদ প্রেম, মনে হলো সমস্ত নৈশ-প্রকৃতি তাকে অনুনয় করে বলছে যেয়ো না, যেয়ো না। সমস্ত প্রান্তরের বুক থেকে হা হা করে উঠল তারই অন্তরের হাহাকার।

খতখানা হাতে নিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন ঘোস—'ওস্তাদ, চলে যাবার আগে আপনার সঙ্গে আখেরী মোলাকাত হলো না, এই গলতি মাপ করবেন, কেননা আপনি মহানুভব। এই বুঝে নেবেন যে, দেখা করা সম্ভব ছিল না। আঁধারে আঁধারে লুকিয়ে চলে যাচ্ছি, কারণ সকালের আলোতে এই মুখ আর দেখাতে পারবো না। আপনাকে অনেক মুস্কিলে ফেলেছি, তার থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। আফতার হয়ে আশমানে শোভা পাবার ভাগ্য আমার হলো না যদিও আপনার মতো মুরশিদ মিলেছিল। নিশ্চয় আমি খুশনসীব নই। মুঝে এ্যায়সে ইয়াদ রাখিয়ে জৈসে হম্ হ্যায়ঁ য়োঁ বদ্‌বখত তারেঁ কা টুক্‌ড়া জিস্‌কো আশমান ভি কয়েদ্ রাখ্ সেক্‌তা নহীঁ—এই শ্বের একদিন আপনিই শুনিয়েছিলেন, আজ তাতেই মনের কথা জানিয়ে গেলাম। আপনি খুবই দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু নসীব যাকে ঘর লিখে দেয়নি, তাকে আপনি বাঁধবেন কি দিয়ে? পথই আমার ভালো।

খুদা আপনার ভালো করবেন। বাহ্‌রামকে আমার টাকাগুলো দিয়ে দেবেন, যাবার সময়ে সে আমাকে অনেক সাহায্য করল। এই রকম সাঁচ্চা দোস্তি কমই মেলে, আমি নিশ্চয়ই যোগ্য ছিলাম না। কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না।

আমার জিনিষ বলতে কিছু নেই। চান তো কোন কাঙালীকে

খয়রাত করে দেবেন—। আমার ঘোড়া তুফানী, বড় আদরে পালন করেছিলাম, ওকে আপনিই রাখবেন। আপনার বাহাদুরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, পথ থেকেই পাঠিয়ে দেবো লোকের সঙ্গে—চিন্তা করবেন না।—খুদাবক্স।'

বাহ্‌রাম আর ঘৌস দু'জনই চুপ করে রইলেন। ঘৌস চিঠিখানা নিয়ে পকেটে রাখলেন। তাঁকে আর একজায়গায় পৌঁছতে হবে এই খত! পরাজিত হয়েছেন নিশ্চয়, কিন্তু লাঞ্ছনা তখনও তার পুরো হয়নি আর একজনের কাছে হার স্বীকার না করা পর্যন্ত।

যদি সত্যিকার যোদ্ধা হয় তো হার স্বীকার করবার সাহস থাকা চাই। কাজেই এই সময় ঘৌসেরও বড় সাহসের প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

নতুন হাবিলদার খুদাবক্স খাঁ অজ্ঞাত কোন কারণে কাল রাতে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এই খবর বাতাসের মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শহরে। মোতির ঘরেও সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

ঘৌসের আগমন প্রতীক্ষাই করছিল মোতি। নিশাজাগরণ ও রোদনে চোখ মুখ লাল, চুল বিস্রস্ত, বসন ধূলিধূসরিত। পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল, কপালে একটু কাটা দাগ। দরজার দুই পাশে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল মোতি। মনের আগুনে চোখ তার জ্বলছিল।

নিজের আগমন ঘোষণা না করেই ত্রস্তপদে ঘৌস সেখানে উপস্থিত হলেন। মোতির দিকে এক পলক তাকিয়েই তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। আর তাঁকে দেখা মাত্রই মোতি জিজ্ঞাসা করলে—খুদাবক্স কোথায়?

নীরবে খত তুলে দিলেন তার হাতে ঘৌস। তর্জনী নির্দেশে ঘৌসকে দেখিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল মোতি। কান্নার চেয়েও ভয়ঙ্কর করুণ সেই হাসি। তার পরমুহূর্তেই চোখে নামল জল। কণ্ঠে তীব্র জ্বালা নিয়ে সে বললো—আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলে ধরে রাখবে বলে। কিন্তু ধরে রাখতে পারলে? নিজেও রাখতে পারলে না আমাকেও দিলে না। এ তুমি কি করলে!

শোকাবেগে পর্দায় পর্দায় উঠতে লাগল তার কণ্ঠ—আমি তার জন্যে সব ছাড়তাম, ঘর বাঁধতাম, তাকে বাঁধতাম, সে আমাকে নিতে চাইলে কিন্তু তোমার কথা সত্যি মেনে আমি গেলাম না।

সে বললো আমি নটী আর তুমিও বললে আমি নটী। তোমরা কেউ আমার মন বুঝলে না, হৃদয় দেখলে না। সব পরিচয় আমার ভেসে গেল, কারণ আমি নটী—আর তোমরা হলে খাঁটি মানুষ! তাই যদি হয়, তবে কেন সে চলে গেল? নিজের জিদ আর নিজের অন্ধ মনকে কী ভেট দিলে ওস্তাদ! দু'জনের জান্ নষ্ট করে দিলে? তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বেরিয়ে গেলেন ঘোষ। নিজের কাছ থেকে যেন নিজেই তিনি পালাতে চাইলেন। শোকাতুর তীব্র কণ্ঠ ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর কানে—আমি নটী। আমি ভালোবাসতে জানি না! আমি বেইমান!

এ গা রো

শ্রান্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত পা। তবু পথ বেয়ে চলে খুদাবক্স। দিনের পর দিন অবিরাম সে পথ-চলা। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে। কখনো আহার মেলে, কখনো মেলে না। পথচারী বা গ্রামবাসীর চোখে সহানুভূতি তার কাছে অসহ্য বোধ হয়। কোন কোমল হৃদয় রমণী কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে তার হাতে জল ঢেলে দেয়। আঁজলা ভরে পান করে খুদাবক্স। প্রতিদানে ধন্যবাদের কথা কইতেও ভুল হয়ে যায়। কোথাও জল আহরণ-নিরত তরুণীর দল এই সুপুরুষ পাঠানকে দেখে চোখে চোখে ইশারা জানায়। সে ইঙ্গিতে জ্বলে যায় খুদাবক্সের হৃদয়, আর তাদের সে মাধুরী মিছে হয়ে যায় তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে। চরণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেও মন থামতে চায় না। কোন সর্বনাশা বন্যার পথ মুক্ত করেছে মোতি! তার খরতর স্রোত তাকে কেবল ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে নিরন্তর!

বৃদ্ধা পৃথিবী সুনিপুণা কিষাণীর মতো তার কাজ করে চলে। নদীতে জল ভরে দেয়, ক্ষেতে ক্ষেতে আশ্বাসের রঙ লাগিয়ে দেয় গমের শীষে, পাখীগুলোকে লাগিয়ে দেয় ঘর বাঁধবার কাজে, অভিজ্ঞ চোখে সন্ধান করে ঠিক করে জল বাতাস আর রোদ কোথায়

কতটা দরকার। এখনই শরতের ফসল তোলবার সময়, তাই প্রয়োজন হয় তার দিবারাত্রি প্রহরার।

দূরে পাকা ফসলের তরঙ্গে মাথা তুলে ঘোড়ার পিঠে খবরদারি করে কিষাণ, মেয়েরা আল ধরে মাথায় খাবার নিয়ে পৌঁছাতে চলে। এই দৃশ্যের সঙ্গে সে আশৈশব পরিচিত। দেখে দেখে তার মনে ঘরের জন্য তৃষ্ণা জাগে। তার নদী, তার ক্ষেত, তার মাটি তাকে ডাক দিচ্ছে। অন্ধ একটা অনুভূতি, আর দুর্নিবার তার আকর্ষণ! যে তাগিদ তাকে দিবারাত্র ক্ষেপিয়ে নিয়ে চলেছে সেটা কি তবে তার মায়ের ডাক? দেশ, ঘর, গ্রাম, সেই কুয়োর জল টানবার চাকিয়ার ক্যাঁ কোঁ শব্দ-মুখর করুণ দুপুর, কানা কুকুরটার কান্নায় আর্ত ঘুম ভাঙা শরতের রাত, গমের গন্ধে আমোদিত মন্থর হেমন্ত বিকেল। সমুদয় পরিচিত স্মৃতিগুলো রূপ নেয় যেন তার মা'র চিন্তার মধ্যে। তার মা-ই হাজারখানা চেনা ছবির চিঠি যেন রোজ তাকে স্বপ্নে পাঠাচ্ছে। কিন্তু মা তো লিখতে জানে না! অজান্তে কখন চোখে জল নেমেছে, খুদাবক্স খেয়াল করতে পারেনি।

সামনেই কুয়োতলা। আঁজলা পেতে ধরে খুদাবক্স আর জল দেয় একটি বালিকা। কালো রঙ, নাকে গহনা, সরল চাহনি। সন্ধ্যা নামে। দূর থেকে কার কণ্ঠে ডাক আসে—মোতি! মোতিরে!

—আঙ্গ আম্মা!

সাড়া দেয় মেয়েটি। খুদাবক্স কুয়োর গায়ে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। গভীর মমতায় বলে, তোমার নাম?—হাঁ জী, বলে হাসে মেয়েটি। মনে তরঙ্গ খেলিয়ে অনুভূতি ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে খুদাবক্স গুঞ্জরন করে—মোতি, মোতি, মোতিয়া।

চলতে শুরু করে মেয়েটি। সে রাতের মতো পথের ধারেই রয়ে যায় খুদাবক্স।

হাজার হাজার তারার দীপালি জ্বালিয়ে বসে আছে আকাশ। একখানা চওড়া পাথরে হেলান দিয়ে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে খুদাবক্স এক আকাশ তারার একটাও দেখতে পায় না। মনে হয় সবগুলো যেন বাতি আর তার মোতির হাতে জ্বালা! এতগুলো বাতি জ্বালিয়ে মোতি তাকে ডাকছে!

পিপাসিত বুকের ভেতর থেকে মোতির জন্যে তৃষ্ণা জাগে। দুর্নিরুদ্ধ সেই প্রেম। বীজ যেন অঙ্কুর হতে চাইছে, তাই মাটির বুক থেকে সে মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। মোতি যে তাকে ঘরছাড়া করেছে, মোতি যে তাকে ঘা দিয়েছে, সে কথা তখন ভুলে যায় খুদাবক্স। এই তারাভরা নিশীথিনীর অঞ্চল তলে নিদ্রামগ্ন পৃথিবী জুড়ে মোতির কোমল ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে। এমন করে প্রাণ-মাতানো ভালোবাসা ছড়িয়ে গেল কি করে মোতি?

শীতল, বোবা পাথরে মাথা গুঁজে খুদাবক্স একটি নামই গুঞ্জরন করে। কত গান, কত শ্বের শুনেছে আর শিখেছে সে—একটাও তার মনে আসে না। শুধু বুক থেকে হাহাকার ওঠে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে তার প্রেম মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই নাম—মোতি, মোতি, মোতিয়া।

হঠাৎ কোন বিপদের অনুভূতিতে যেন মাথা তোলে খুদাবক্স। কোমরের তলোয়ারে হাত দেয়। অনতিদূরে তার দিকে অসীম বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে একটা চিতাবাঘ। তারার আলোয় তার বিচিত্রিত দেহ চোখ পড়ে, সবুজ জ্বলজ্বলে চোখে শুধু বিস্ময়।

ভয় হয় না খুদাবক্সের। শুধু সতর্কিত হয়। চিতাবাঘটা কিন্তু আক্রমণ করবার কোন লক্ষণই দেখায় না। কিছুক্ষণ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে নিরীক্ষণ করে এক লাফে রাস্তা পেরিয়ে নালার ধারে বসে। চক্‌চক্‌ করে পরম তৃপ্তিতে জল খায়। তারপর অবহেলে, সহজ ভঙ্গীতে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে মিলিয়ে যায় বনের মধ্যে।

আত্মরক্ষার জন্যে যে অস্ত্র ধরতে হলো না, তাতে বেশ কৃতজ্ঞ বোধ করে খুদাবক্স।

পথের হিসেব পথিক মনে রাখে না, পথ যদি লিখে রাখে তো সে আলাদা কথা। পথে চলতে চলতে কোন কিষাণ বালকের গানের ছন্দে নিজের মনের কথা খুঁজে পায় সে। গানটা যেন তারই মনের কথার প্রত্যুত্তর—

> 'প্যার প্যার কেয়া করতা রে তেরা প্যার না জানে কোঈ
> তেরে দিলকে লাগি কোঈ কেয়া মাঙ্গে—
> ঘায়েল কী দুখ ঘায়েল জানে ঔর না জানে কোঈ।'

খুব ঠিক কথা। কদরবান মানুষের কথা। কোন ঘায়েল মনের কথা। তবে হে গীতকার, ঘা তুমিও খেয়েছ! তোমাকেও তাহলে কেউ সহসা সব দাম কেড়ে নিয়ে একেবারে মূল্যহীন করে ছেড়ে দিয়েছে বাজারে! তোমার গানে তো সেই কথাই লেখা আছে।

তারপর একদিন সন্ধ্যে নাগাদ কৈন নদীর তীরে এসে পৌঁছায় খুদাবক্স। বাঁকে করে ছেলে বসিয়ে অন্যদিকে জামা-কাপড়ের পোঁটলা রেখে চলছে মেয়ে ও পুরুষ। উটের পিঠে পার হচ্ছে যাত্রী। রাজস্থানের ভবঘুরে লোহার ও লাম্বাডিরা মস্ত ধুনি জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছে। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে মা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বয়স্ক ছেলে বুড়ী মাকে পিঠে করে নদী থেকে হাত মুখ ধুইয়ে বয়ে আনছে, এইসব ঘরোয়া ছবি দেখে চোখ দুটো জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। মানুষের সঙ্গলাভের আশায় কতদিন ধরে যে তার মন পিয়াসী হয়ে ছিল! প্রশ্ন করে জানতে পারল, সাম্বৎসরিক মেলা বসেছে। বান্দার নবাবসাহেব অনেক পয়সা খরচ করে মেলার বন্দোবস্ত কায়েম করেছেন।

লাম্বাডি পরিবারের সঙ্গে বসে আরাম করবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে খুদাবক্স। ওপারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মেলার জন্যে তাঁবু পড়েছে কম করেও হাজার দুয়েক। পিতল তামার বাসন, রাজস্থানের ছাপা কাপড়, কম্বল, ইস্পাতের ছোরা-ছুরি থেকে শুরু করে ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, গরু, পাল্কি, গরুর গাড়ির চাকা, ঘোড়ার ডাকগাড়ি সবই কেনা-বেচা চলে। তাছাড়া গান, রামলীলা, যাদুখেলা, ভানুমতী, সাপখেলা, ভালুকনাচ সব আছে। কোন কোন তাঁবুতে বিলাসিনীদের নূপুর নিক্কণ অবধি বাজছে। কোন বারনারীকে নিয়ে সঙ্গী পুরুষ কাঁধে বুলবুলি পাখী বসিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরছে। নবাবের লোকরা ঢাক বাজিয়ে বলে বেড়াচ্ছে—ছেলেমেয়ে চুরি হতে পারে, চুরি ডাকাতি খুন হতে পারে, যে যার মতো সাবধান থাকবে। এরই মধ্যে কোথাও কোন সাধু ধুনির সামনে বসে জ্ঞান ও ওষুধ বিতরণ করছেন মহিমামুগ্ধ ভক্তজনকে। ভস্মের টিপ ধারণ করে পুত্রহীনা পুত্র পাবে, শত্রুর নিপাত হবে, আদিব্যাধি দূরে যাবে। এইসব প্রধান

গুণের সঙ্গে আরো অনেক গুণ আছে, যথা অর্থলাভ, ভূমিলাভ, বিপদআপদ দূর হওয়া। আবার কোথাও কোন বিগত যৌবন চপলা রমণী হেসে হেসে নানারকম ওষুধ বিষুধের ব্যবস্থা দিচ্ছে। প্রেমের ক্ষেত্রে এরা সিদ্ধ যাদুকর। এদের দেওয়া শিকড় ধারণ করলে পরে বাঞ্ছিত রমণী বা পুরুষ নিমেষেই করতলায়ত্ত হবে, সপত্নী মরে যাবে।

কোথাও আগুন জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্নাবান্না করছে। অদূরে বাঁশবাজির বাঁশ পুতেছে খেলা দেখাবার আসল লোক, ঐ ছেলে দুটো। বাঁশ বেয়ে তাদের উঠতে হবে, এই ভেবে তাদের চোখে প্রাণের আশঙ্কা ফুটেছে। কোথাও শাশুড়ী তিরস্কার করছে বৌকে যে, সে কেন নিলাজ হয়ে বাপের গাঁয়ের মানুষ দেখেই ছুটে গিয়ে কথা কইল? বাপের বাড়ি বলতে কি অতই টান?

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে খুদাবক্স চলেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে ভালোই লাগছে তার। অনেক দিন পর চোখ আরাম পাচ্ছে, মনও হালকা লাগছে। যেতে যেতে হঠাৎ কানে এল পুরনোদিনের এক পরিচিত কণ্ঠস্বর—আরে ভাই, সেইদিনের শোভাখানা ভাবো দেখি? চৌহান রাজাকে বন্দী করেছে দিল্লীর নবাব। রাজার তীরখেলা দেখবে বলে নবাব বসেছে। এদিকে রাজার দুইচোখ অন্ধ। অথচ কথা দিয়েছে বাঁশের আগায় বাঁধা লোহার তাওয়া এক তীরে বিঁধবে। রাজার মতলব অন্য। ভাইকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বলেছে—ভাই, তুই নিশানা দিবি আমি বিঁধব। এমন নিশানা দিবি যে, সোজা গিয়ে তীর বিঁধবে নবাবের বুকে। আগে দুশমনকে তো মেরে নিই ভাই, তারপর মরতে হয় তো মরবো।

যেমন দাদা তেমনি তার ভাই। সভায় দাঁড়িয়ে ভাই নিশানা দিলো। বললো—চব্বিশ বাঁশ, চল্লিশ গজ, আট আঙুল দূরে নবাব বসে আছে।

চব্বিশ বাঁশ চল্লিশ গজ, আঙুল আট প্রমাণ···মারো মারো মোটা তাওয়া, মাত্ চুকো রে চৌহান! রাজা মেরে দিলো তীর—কিন্তু নিশানাতে নয়, একেবারে নবাবের বুকে—কলিজা ছিঁড়ে মরে গেল নবাব। আরে ভাই, এমন রাজা ছিল চৌহাম। চৌহান

দেখবে তো। এই গল্প মনে রাখতে বলবে। এরপর চৌহান যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধে আর ভুল থাকে না কারো।

বিস্মৃতির জাল ছিঁড়ে ফেলে খুদাবক্সের সন্ধানী মন বের করে আনে লোকটির পরিচয়। মনে পড়ে যায় তার কৈশোরের কথা। আর সেই টিকমগড়ের মানুষ পরন্তপ চৌহানকে, যে তাকে নিয়ে গিয়েছিল অর্জুন সিং-এর কাছে। এ নিশ্চয় সে। নইলে চৌহান নিয়ে এত গর্ব আর কার হবে! মহা আনন্দে খুদাবক্স এগিয়ে যায়। ডাকে—পরন্তপ, পরন্তপজী!

—কে ডাকে রে? বলে সাড়া দিয়ে, জোড়া-গোঁফ, আকর্ণ-বিস্তৃত লাল চোখওয়ালা শ্যামবর্ণ একটি লোক বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই—খাঁ-সাহেব, বলে অভ্যর্থনা করে খুদাবক্সকে। জড়িয়ে ধরে, আদর করে, পিঠ চাপড়ায় আর বলে—শেরে শেরে মোলাকাত হয়ে গেল ভাই, তোমরা সব ফুর্তি করো!

তার শ্রোতৃমণ্ডলী একান্তভাবেই নিরীহ গ্রামবাসী। সহসা ফুর্তি করবার যুক্তি তারা খুঁজে পায় না।

পরন্তপ তাকে টেনে নিয়ে যায় এবং তাঁবুতে গিয়ে একবারে খাটিয়ার ওপর ফেলে দেয়। তারপর আবার দাঁড় করিয়ে নিরীক্ষণ করে। বলে—গরম পানি দিয়ে বাদশাহী গোসল করো, গরম দুধ পিও, আর আরাম করো—আরে জওহর!

উঁকি দেয় একজন ছোকরা। পরন্তপ বলে—শেঠজীকে বলবে তাঁকে ছুটি দিয়ে দিলাম।

শেঠজীরই তাঁবু, অথচ ছুটি দিচ্ছে তাকেই পরন্তপ, এই উল্টো যুক্তি বুঝতে না পেরে জওহর চেয়ে থাকে।

পরন্তপ বলে—আরে, তোমার মতো ভাতিজা থাকতে শেঠজীর তাঁবুর অভাব? যাও যাও, দেখে-শুনে যোগাড় কর আর একটা! তারপর খুদাবক্সকে বলে—তাজ্জব হবার কি আছে? শেঠজী একটা খুন করেছেন, আমি তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছি হৈ হাঙ্গামার হাত থেকে, আর টিকমগড় ফিরবার পথে এক সঙ্গে মেলা দেখছি—খুব সোজা কথা। এরকম তো হালফিলই হচ্ছে।

পরন্তপের কথা কইবার ভঙ্গীতে মনে হয়, এর চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক আর কিছুই হতে পারে না। সত্যি বটে সাত বছর আগে

তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুদাবক্সের কিন্তু এই রকম মেলা হলেই যে শেরে শেরে মোলাকাত হবে, তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? শেঠজীর ঘোড়া বেকায়দায় নবাবসাহেবের বুড়ো ডাকবরদারকে মেরে ফেলেছে, আর সেই শেঠকে দশটা হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যে পরন্তপ, সে কি তাঁর তাঁবুটাও এক রাতের মতো ব্যবহার করতে পারে না?

—ওসব কথা ছাড়ো। এখন বলো দেখি ভাই তারপরে কি কি হলো। আচ্ছা ক্রমে সব শুনবো, এখন একটু আরাম করো।

জওহর ঢোকে এক চ্যাঙারি খাবার নিয়ে। জল আসে কুর্সি আসে।

রাত বারোটা। মেলার অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু জেগে আছে নিশাবিলাসিনীরা আর তাদের হিমায়েতদার মানুষরা। ওদিকে কোন কোন নতুন দোকানী দেরীতে এসে পৌঁচেছে। তাঁবু খাটায় তার কুলীরা আর তাদের কথাবার্তা একটু কানে আসে।

তাঁবুর সামনে ধুনি জ্বেলে আর তার সামনে কম্বল বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ও পরন্তপ কথা বলে। মোতির কথা বাদ দিয়ে অন্য সব কথা বলে খুদাবক্স। শুনে পরন্তপ বলে—সব বুঝলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ করে ঘোঁসের কাজ ছাড়লে কেন?

খুদাবক্স জবাব দেয় না।

পরন্তপ বলে—অর্জুনের সঙ্গে যে তুমি থাকতে পারবে না, তা আমি জানতাম। ওরা তিন পুরুষ ধরে লুঠেরা। চৌথা পুরুষে সে নতুন করে বদলে যাবে, তা তো আর হয় না!—যাই হোক, এখন দেশে চলেছ?

খুদাবক্স সম্মতি জানায়।

পরন্তপ বলে—তোমার মনটা এখন নিশানা থেকে ছুটে এখানে ওখানে ঘুরছে বলে মনে হয় খাঁ-সাহেব, এই জন্যে বলছি এখন নয়, কিন্তু কাজ যদি কখনও করতে চাও, তাহলে আমার কাছে চলে এসো। এলাহাবাদের আগে, আমার এক বন্ধুর মারফত একটা রিসালা-হন্ট পেয়েছি। ঘোড়ার একটা আস্তাবল। দশটা ঘোড়া নিয়ে কারবার শুরু করবো, পরে ভালো হবে। তুমি ঘোড়াকে শিখাতে পারবে তো?

খুদাবক্স না হেসে পারে না। বলে—কি পারবো, আর কি পারবো না তা কি আমিই জানি ?

পরন্তপ বলে—এই তো, ব্যস—ঠিক হয়ে গেল। ঘোড়া আমার কিন্তু শিক্ষা দেবে, ট্রেনিং দেবে তুমি।

—কি দেবে ?

—ট্রেনিং দেবে। এটা অংরেজী কথা, ফৌজের কাছে শিখেছিলাম। বলো ভাই পরন্তপ চৌহান কি জানে আর কি জানে না! ফৌজে ছিলাম দু'মাস, কিন্তু যা শিখেছি, তা শিখতে অন্য লোকের কমসে কম ছয় মাস লাগতো। ট্রেনিং হচ্ছে শিখাই পড়াই। ঘোড়াকেও মখতবে বসে পাঠ শিখতে হয় জানো তো ? আমি আর তুমি, দু'জনে মিলে কারবার লাগাবো। ঘোড়া বিক্রি করবো চড়াদামে, ফৌজের সাহেবদের কাছে, এখানে ওখানে। কোন গোলমাল নেই।

—ফৌজের কাছে কেন ? ফৌজ তো তোমার না-পছন্দ।

পরন্তপ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো—এই কথা তোমাকে আমি বলেছিলাম কবে ? অংরেজী তেতাল্লিশ সালে তো ? এখন চলছে অংরেজী তিপ্পান্ন সাল। ও জবান বুড়ো হয়ে গিয়েছে, ওকে ফেলে দাও ভাই। এখনকার নতুন কথা হচ্ছে ফৌজের কাছেই থাকতে হবে, আর খুব ঘোড়া বেচতে হবে, ছাউনিতে আসতে হবে, যেতে হবে। বলে আগুনের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবে পরন্তপ। বলে—আমি ওখানেই থাকবো, তুমি যদি কাজ খোঁজ তো ওখানেই চলে আসবে। কারবারের জন্যে আগেই আমি আগাড়ি-পিছাড়ি দড়ি, যা ঘোড়া বাঁধতে লাগবে, তার ফরমায়েশ দিয়েছি।

খুদাবক্স বলে—ঘোড়া দেখেছ ?

—না-না, তবে যে আমাকে খবর দিয়েছে, সে মিথ্যা কথা বলবে না !

—আগেই ঘোড়া বাঁধবার দড়ি কিনেছ যে ? এমন অসম্ভব হাস্যকর লাগে ব্যাপারটা যে, খুদাবক্স না হেসে পারে না।

পরন্তপও খুব হাসে। বলে—দড়িও ঠিক আছে আর আমিও ঠিক আছি। এখন একবার ধরব কি শুরু হয়ে যাবে কারবার।

—যার ঘোড়া সে কি দড়ি রাখেনি? এতদিন কি করেছে তা হলে?

—আরে ভাই যা হয়ে গিয়েছে, তার কথা ছোড়। এখন ভাবো সামনের কথা, যা হবে, যা আসছে।

হাতের ওপর মাথা রেখে, অন্ধকারে চোখ চেয়ে থাকে খুদাবক্স। হয়তো পরন্তপের কথাই ঠিক। বিগত জীবনকে ভুলে যাওয়াই হয়তো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা কি সম্ভব? ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে খুদাবক্স।

গ্রামে পৌঁছয় তারও দিন দশেক পরে। যমুনা পেরিয়ে পাড় ভেঙে উঠে, ক্ষেতের পথ ধরে চলতে চলতে দেখে দুই পাশে পাকা গমের ভারে গাছগুলো মাথা নিচু করে আছে। তিতির, বটের, টিয়া, নানান রকম পাখী গমের দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তাদের বাড়ির দিক থেকেই তার গাঁ সুবাদের চাচা হাফিজ বেরিয়ে আসছে বোধ হলো। খুদাবক্স প্রায় ছুটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সম্ভাষণ ও আশীর্বাদের পর হাফিজ বললো—এতদিন কোথায় ছিলে বেটা? কেন কোন চিঠিপত্র লেখোনি? যে টাকা পাঠিয়েছ ঠিক ঠিক এসেছে সুজনের ছেলের হাতে। আমার খত তুমি পাওনি?

—কেন, কি হয়েছে?

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে হাফিজ। বলে—নিজেই দেখগে বেটা, তোমার চাচী ওখানেই রয়েছে, কোন ভাবনা নেই···ভাবীর বড় অসুখ খুদাবক্স, আজ বাইশদিন হয়ে গেল বুখার ছাড়ছে না।

পরী শুয়েছিল আনোয়ারের খাটিয়াতে। পায়ের থেকে গলা অবধি পুরনো লাল রেজাই দিয়ে ঢাকা। জ্বরে মুখখানা লাল হয়ে আছে। হাফিজের বৌ মুখ নিচু করে আস্তে ডাকল—দেখো কে এসেছে, দেখো?

খুদাবক্স আস্তে ডাকল—মা—

চোখ খুলল পরী। অবিশ্বাসীর চোখ নিয়ে তাকিয়ে চিনলো ছেলেকে। শীর্ণ মুখে হাসি খেলে গেল। তার পরেই চোখে জল ভরে এল। বললো—তোর সঙ্গে আমি তো কথা বলবো না!

পরে সব শুনল খুদাবক্স তার পড়শীদের কাছে। একে একে সবাই এল। বিষণ সিং, সুজন, বুড়ো লালা, হাফিজ, এমনকি পরমেশ্বর মিশ্রও দাঁড়িয়ে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলো। অনেক দিন বাদে চার-পাঁচখানা চারপাই পড়ল উঠোনে। সবাই তামাক খেতে খেতে মৌজ করে কথাবার্তা কইতে লাগল। বয়স্কদের প্রাপ্য সম্মান দেখিয়ে খুদাবক্স দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেককে জানালো অভিবাদন। দেখেশুনে তারিফ ফিরতে লাগল চোখে চোখে। হ্যাঁ, বেশ ছেলে হয়েছে। আজকালকার ছোকরাদের মতো বে-আদব নয়। আর চেহারা—তা হবে না কেন ? বাপকা বেটা তো!

প্রত্যেকের কাছেই পরম কৃতজ্ঞ বোধ করল খুদাবক্স। তার অনুপস্থিতিতে এরা তার মাকে দেখাশোনা করেছে—চাষ করেছে, ক্ষেতী দেখেছে, ফসল দিয়েছে। আগে কখনও মনে হয়নি তার, কিন্তু এখন দেখলো, এরাও তাকে ভালোবাসে। তাকে আলাদা কোন মানুষ হিসেবে দেখে না। তাদের বন্ধু আনোয়ারের ছেলে, এই গাঁয়েরই মানুষ। তাকে দেখাশুনা করা, ভালোবাসা, এ তো কর্তব্য কাজ মাত্র। প্রতিদানে তারা চায় এই গ্রামেই থাকো, বিয়ে করো, বসবাস করো। তোমার সন্তান যেন এই গ্রামেরই একজন হয়ে বড় হয়ে ওঠে। পরস্পর কাছে থাকবার, বেঁধে রাখবার জন্য এই স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন। বুড়ো লালার রেখাঙ্কিত মুখ, হাফিজের গোলগাল ফর্সা মুখ, বসন্তের দাগ চিহ্নিত বিষণ সিংয়ের মুখ, সবগুলো মুখ যেন এক কথাই বলে, একই অনুনয় জানায়। এই জীবনের আদলখানা বদলে দেবার বিদ্রোহী হাওয়া কোন আশমানে ফুঁসে উঠছে! এইসব কিষাণ ও জোতদার মানুষ যেন তার গন্ধ পাচ্ছে! একটা আশঙ্কার ছায়া তাদের চোখে মুখে লেগে আছে।

পরীর কথা বলে মাথা নাড়ল সকলেই। সকলেই তাকে ভালোবেসেছে, নিজে থেকেই করেছে তার জন্যে। কিন্তু পরী সেই দান এমনি এমনি নেয়নি। লালা বললো—খলিফার রুটি মেরে দিয়েছে তোর মা।

পরী নাকি জামা, পাজামা, মেয়েদের জামা, পুরুষদের মেরজাই, এইসব জিনিষ সেলাই করে দিয়েছে, গম পিষে দিয়েছে ঘরে ঘরে।

লালা আরও বললো—তুমি যা টাকা দিয়েছ তার একটি পয়সাও খরচ করেনি। শুধু সংসার সাজিয়েছে, গুছিয়েছে। শীত মানেনি, বর্ষা মানেনি, পরিশ্রম করেছে। বলেছে—এখন আমার ছেলে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সংসার হবে, সে বিয়ে করবে—আমি তখন আরাম করব। সেদিনও, রাত হয়ে গিয়েছে, দেখছি হাফিজের বোনকে মালিশ তাগিদ করে এত রাতে একলা ঘরে ফিরছে। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম—বেটি, খুদাবক্সের বাবাকে আমি ছোটটি দেখেছি, আমার কাছে তুমি শরমাও কেন? একটু হেসে তখন চলে গেল। এই এত কাজ করে করেই অসুখটা বেড়ে গেল আর কি!

খুদাবক্স শোনে মন দিয়ে। বুকের হাড়ে জখম আছে, সেখানে হয় ব্যথা, বুখার হয় আর তার সঙ্গে খুনও মাঝে মাঝে উঠে আসে গলায়। গাঁয়ের হেকিমের অনুরোধে, এলাহাবাদ থেকে ফেরবার পথে এক বড় হেকিমকে এনেছিল বিষণ সিং—কোন আশাই দিতে পারলেন না। বললেন বড় পাজি ব্যামো—ভেতরটা খেয়ে গিয়েছে, ঝাঁজরা করে দিয়েছে। এখন সেবা যত্ন খাওয়া-দাওয়ার ফলে যতটা ভালো হয়। কাছাকাছি কোন বটগাছের নিচে এক সিদ্ধ দরবেশ এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকেও তাবিজ এনে দেওয়া হয়েছে। কিছু ফল পাওয়া যায়নি।

মায়ের সেবা করে খুদাবক্স প্রাণমন ঢেলে। মা যদি চলে যায় তবে তার যে আর কিছুই থাকবে না। একটা বিরাট নিঃসঙ্গ শূন্যতা যেন তাকে গ্রাস করতে চাইছে, তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।

খুদাবক্স কাজ ছেড়ে আসার কথা বলে না, বলে ছুটিতে এসেছে।

পরী দেখে আর বলে—এবার কিন্তু তোকে বিয়ে দেবো। কত টাকা জমিয়েছি জানিস? তোর বৌকে গয়না দেবো।

মায়ের একটা স্বপ্নও ভাঙে না খুদাবক্স, হেসে হেসে বলে—তার জন্যেও তো তোমার ভালো হয়ে উঠতে হবে মা।

সন্ধ্যে হতে বাপের কবরে চেরাগ জ্বেলে দেয় খুদাবক্স। পরীর পাশে বসে কথা বলে।

পরী বলে—তোর মনের মতন বৌ আমি পাব কোথায়?

অন্য গাঁয়ে খবর করতে হবে তো। কিরকম বৌ চাস বল্ দেখি?

—তোমার মতন।

—শুধু ঠাট্টা, বলে হাসে পরী।

খুদাবক্স মমতাভরা গলায় বলে—তোমার চেয়ে সুন্দর বৌ দিয়ে কি হবে মা?

পরী বলে—কি যে বলিস! একটু চোখবুজে থেকে আবার বলে—তোর বাবার জামা, কামিজগুলো পরিস, পেটিতে তোলা আছে। আমার বৌ'কালের পায়ের গহনা আছে, সোনার ফুল আছে একটা, সব তুলে রেখেছি। টাকাগুলো পাবি পিতলের ঘটিতে। পোঁতা আছে পেটির নিচে মেঝেতে, একখানা ইটের তলায়।

সোনার ফুলটা বের করে এনে মাকে দেয় খুদাবক্স, দেখে দেখে পরীর চোখে কোমল মমতা ফোটে, বলে—তোর বাবার প্রথম উপহার। পাছে সামনে থাকলে অভাবের দিনে বেচে দিতে হয়, তাই আড়ালে রেখেছি। তোর বৌ এনে নিজের হাতে পরিয়ে দেবো, কি বলিস?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। কেবল একজনকে এই ফুল পরিয়ে দেখে তার মন। আর তার পরেই সে ছবিখানা বন্ধ করে দেয়। নিঃশ্বাস পড়ে একটা। এমন ছেলে, পরী ভাবে, কোন যাদুগরণী তো বশ করেনি! তার পরেই ভাবে, না না, তাহলে আমি বুঝতাম, জানতাম।

ফসল কাটবার সময় এল, এবার সবাই ডাক দেয় খুদাবক্সকে। বছর বছর তারাই কেটেছে, এবার যখন ঘরে আছে, তখন সেও আসুক, তাদের সঙ্গে যোগ দান করুক।

চাচীকে মা'র কাছে বসিয়ে ক্ষেতে যায় খুদাবক্স। হাতে পাশনি নিয়ে ক্ষেতে নেমে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয় খুদাবক্সের। সকৌতুকে তার পড়শীরা দেখতে থাকে, কেমন করে সে ফসল কাটে। প্রথমটা কষ্ট হয়, তারপর খুদাবক্স নিপুণ হাতে গম কেটে ভারা বাঁধে আর হাফিজের গরুর গাড়িতে তুলে দেয়। ঘর থেকে

মেয়েরা দুপুর বেলা নাস্তা আনে। সকলেই আহ্বান করে খুদাবক্সকে। একটু হাসি গল্পও চলে। তারপর আবার শুরু হয় কাজ।

তার রক্তে বুঝি এই পরিবেশ সাড়া জাগায়। পাকা ফসলের গন্ধ বুক ভরে নেয় খুদাবক্স। এমনি সময় দেখে বুড়ো লালা ঘোড়া চড়ে দেখতে দেখতে আসছে। নেমে পড়ে পাশনি তুলে নেয় লালাও। রেখাঙ্কিত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক গোছা গম হাতে ধরে। খুদাবক্সকে বলে—এমনি ধারা রঙের বৌ আনবে বেটা, ভুলে যেও না।

পিঠ নিচু করে কাটতে কাটতে হাসে আর সকলে।

লালা বলে—বৌ আনবে এই রকম সুন্দর, চাঁদি দিয়ে আঁজলা ভরে দিয়ে মুখ দেখব তোমার বৌ-এর।

সকলে আনন্দ অনুভব করে। গুনগুন করে গুঞ্জন করে। ওদিকে গানের সুর তোলে হাফিজ—একেবারে দেহাতী গান। সুরটা এক ঘেয়ে, কথায় বৈচিত্র্য নেই। তবু ফসল কাটার ঝোঁকে ঝোঁকে গানের মুখে তাল পড়ে, আর মুখে মুখে গানটা ছড়িয়ে পড়ে এদিক থেকে ওদিকে—সহেলী আঙিয়া রঙাবত আও রে—এস সখী আমরা আঙিয়া রঙে রঙাই—আনন্দের দিন এল।

বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সোনালী গমের ভারে নিচু হয়ে আছে। সরু সড়কে বয়াল-গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এই ফসলের সমুদ্রে মাথা নিচু করে ফসল কেটে চলেছে মেয়ে পুরুষ। একটা ঘোড়া নিস্পৃহ-ভাবে চরে বেড়াচ্ছে, মুখে তার জালবাঁধা। সমস্ত চিত্রপটখানা সুখ, শান্তি এবং আশার রঙে মনোহারী। তারই মাঝে গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে। নীল আকাশ প্রসন্ন মিঠে রোদের আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছে, বিচিত্র পেখম তুলে ময়ুর অপেক্ষা করছে কেঁদ গাছের ডালে। এই দৃশ্য খুদাবক্স সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে মনের পটে এঁকে নিলো। তারপর দীর্ঘদিন পরে, যখন এই শান্ত সুন্দর দিনগুলো চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিল খুদাবক্স তখন মাঝে মাঝে এই ছবি খানা মনের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতো, আবার রেখে দিতো স্মৃতির ভাণ্ডারে, যেন এই ছবিখানা এক মূল্যবান রত্ন,

রেখে দিতো আর মাঝে মাঝে দেখতো, ব্যবহারে কখনো মলিন করতো না তাকে।

দিনের পর দিন বিগত হয়। অনেক চেষ্টাতেও এতটুকু উন্নতি হয় না পরীর। অঝোরে কাঁদে পরী, ছেলের অজান্তে। যখনই বাঁচবার তার এত আকাঙ্ক্ষা, ভাল করে সংসার বাঁধবার প্রবল ইচ্ছা তখনই কিনা নিষ্ঠুর বিধানে তাকে চলে যেতে হচ্ছে! ছেলের কথা ভাবে সে। নিরাশ্রয়, অসহায়, নিঃসঙ্গ। কেউ নেই। যত কাঁদে তত বুকের ভেতরে ব্যথায় যেন হাড়পাঁজরা ভেঙে যেতে থাকে। নিঃশ্বাস নিতে বাতাস পায় না।

আর ছেলে ভাবে মা'র কথা। বাবার কথাও মনে পড়ে। আবার ভাবনা হয়, মা চলে গেলে কেমন করে থাকবে! মনে হয়, এই জীবনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? অথবা কোন প্রয়োজন আছে বলেই একটার পর একটা বাঁধন ছিঁড়ে তাঁকে মুক্তি দিচ্ছেন খোদা? এই মুক্তি সে চায়নি, এই পরিণতি তার কামনা ছিল না—তার সত্যিকার আরজি তো খোদা মানল না।

দুনিয়াতে শেষ যে ক'টা দিন মাপা ছিল পরীর, তার পরিসমাপ্তি হয় বড় শান্তির মধ্যে। আর শেষ সময়েই বাঁচবার আর সংসার বাঁধবার আকাঙ্ক্ষাটা তাকে যেন কেমন পেয়ে বসেছিল। প্রাণ যেন বেরিয়েও বেরোয় না।

তবু চলে যেতে হলো। রাত্রি তখন প্রভাতের তীরে উত্তীর্ণ প্রায়। পুব আকাশে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। হেকিম উঠে এলেন শয্যার পাশ থেকে। মেয়েরা কেঁদে উঠল কেউ কেউ। খুদাবক্সের অনুভূতিতে সেই মুহূর্তটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। মায়ের প্রশান্ত মুখ মনে পড়ে, আঙিনাভরা অনেক লোক, তাও মনে পড়ে, তারপর যে কি হলো, ঠিক মনে পড়ে না। দাঁড়িয়েই কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। সেই বিস্মৃতির ঘূর্ণিপাকে ফাতেহার গুঞ্জন কিন্তু প্রবীণ যন্ত্রীর হাতে সমের মতো ঠিক তালে তালে পড়ছে—হে আল্লা, দীনের প্রভু তুমি, এই মৃত্যুপথ যাত্রিণীকে দয়া করো, যা সে জীবনে পায়নি তাই তুমি তাকে পূর্ণ করে দিও, যেন কোন অসঙ্গতি না থাকে, বড় দুর্গম যাত্রা তার সামনে, হে আল্লা, তুমি তাকে সাহায্য করো।

তারপরই খুদাবক্সের চেতনায় সব এলোমেলো হয়ে গেল, ভেঙেচুরে পড়ল।

পরী আর আনোয়ারের কবরের পাশে চাঁপা ও কামিনীর দুটো চারা লাগাল খুদাবক্স। বিলিব্যবস্থা করল ঘরদোরের। গাঁয়ের লোক কত করে বোঝাল তাকে, এক মা চলে গিয়েছে তাতে কি অনাথ হয়েছে সে? এইখানে থাকুক খুদাবক্স, বাপ-পিতামহের ভিটেখানার মর্যাদা রক্ষা করুক। ঘাড় নাড়ল খুদাবক্স। এই ঘর, এই মাটি থেকে তার মন ছুটে গিয়েছে। ছেড়ে তো সে যাচ্ছে না, হেফাজত দিয়ে যাচ্ছে মাত্র। হাফিজ তার চাচা, হাফিজের বৌ তার দুধ-মা। তাদের হাতেই ঘর দিয়ে গেল খুদাবক্স। তারা বাস করুক, ব্যবহার করুক, ভোগ করুক ক্ষেতের ফসল, সন্ধ্যায় চেরাগ জ্বেলে দিক উঠোনে, তাতেই খুদাবক্স শান্তি পাবে। যদি কোনদিন ফিরে আসে তবে থাকবে এখানেই। তখন যা হয় ব্যবস্থা হবে। শুধু এখন যেতে চায় সে। এই শূন্যঘর তাকে তাড়না করছে। এই উঠোন তার পিতা ও মাতার স্মৃতি-বিজড়িত। এই মাটিতে, ঐ আমগাছের তলায় তার কত সুখের দিন কেটেছে। যখন শিশু ছিল, মায়ের কোলে শুয়ে গান শুনতো, বাপের কাঁধে চড়ে বেড়াতে যেতো, দুপুরে ছোট্ট লাঠি হাতে গমের ওপর থেকে পায়রা তাড়াতো। তার সেই শৈশব ও কৈশোর, সুখ ও শান্তির দিন, সবই এখানে বাঁধা পড়েছে। ঐ আমগাছটা জানে সেই মর্মান্তিক সকালের কথা, যখন সাহেবের গুলীতে আনোয়ারের কলিজা টুটে রক্ত বেরিয়েছিল, ঐ আমগাছটার তলার মাটিতেই মাটি নিয়েছে সেই বীর কিষাণ। খুদাবক্সের মক্কা মদিনা সবই ঐ আমগাছের তলায়। সেখানেই সব তীর্থের পুণ্য সমাহিত আছে। এই ঘর সে ছেড়ে যেতে পারে কি? আজ গেলেও কাল সে ঠিক ফিরে আসবেই।

খুদাবক্সের যুক্তি বুঝে কেউ তাকে আর বাধা দিলো না। রাতে দেখা করতে এল বুড়ো লালা। বললো—কি বেটা, কি কথা শুনছি? তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, কিছুদিনের জন্যে চাচাজী।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল লালা। বললো—মিথ্যে কথা বলো না বেটা, তুমি আর ফিরবে না। ভগবানের কি বিচার তা তো জানি না, নইলে এমনই বা ঘটবে কেন? আন্দাজ করি, তোমাকে দিয়ে তাঁর অন্য কোন কাজ আছে।

খুদাবক্সের চোখে অবিশ্বাস লক্ষ্য করে সে বললো—অবিশ্বাস করো না বেটা—তুনিয়াতে সকলেরই কিছু না কিছু কাজ আছে, ছোট পতঙ্গও ভগবানের কাজ করে চলেছে। তোমাকে তিনি অন্য কোন কাজের জন্যে তৈরি করেছেন হয়তো।

বৃদ্ধের গভীর বিশ্বাস দেখে নীরব হয় খুদাবক্স।

লালা বলে চলে—যদি একই লোহা থেকে হাল, ঢাল, তলোয়ার, সবই হয় তবে এক এক মানুষ এক এক কাজে লাগবে না কেন? তারপর বলে—একটা কথা খেয়াল রাখবে বেটা, যখন মন করবে, ফিরে আসবে। এই তোমার ঘর, এখানে তোমার মাটি আছে। টাকা লাগবে কিছু? সঙ্কোচ করো না—

খুদাবক্স অভিভূত হয়ে ঘাড় নাড়ে। না, তার মায়ের জমানো তিন বিশ টাকা আছে। তার পক্ষে অনেক। পঁচিশ টাকা সে রেখে যাচ্ছে। হাফিজ তার মা'র নামে দাওয়াত দেবে। তার বড় সখ ছিল শহর বাজারের মতো মা আর বাবার কবর বাঁধিয়ে দেবে।

—ভগবান জরুর দিন দেগা, লালা বলে। তারপর খুদাবক্সকে সস্নেহ আলিঙ্গন করে বিদায় নেয়।

ভোররাতে নিজের জিনিষপত্রের ঝোলা কাঁধে ফেলে খুদাবক্স। প্রত্যুষের তারার চাহনি যেন তার মায়ের চোখের মতো মধুর উজ্জ্বল। উঠোনের একটু মাটি নিয়ে কাপড়ে বেঁধে পকেটে রাখে। আমগাছের তলায় বাতিটা নিজের হাতেই জ্বালে। তারপর বিদায় নেয়। শূন্য ঘর, শূন্য আঙিনা, বিদায় জানায় সকলকে। বিদায় জানায় শৈশব ও কৈশোরকে। বিদায় জানায় মা ও বাবাকে। বোবা ভাষায় তাঁদের জানায় যে, না গিয়ে তার আর উপায় ছিল না। কিন্তু সে তাঁদের ভোলেনি, তার কলিজা ছিঁড়ে এখানেই রেখে যাচ্ছে। এত কথা জানিয়ে সে তাঁদের দোয়াভিক্ষা করে। সে একলা, সে নিঃসম্বল, তবু তাকে চলে যেতে হচ্ছে। আর চলতে হবে, যতদিন না তাঁদের মতো তারও সময় আসে। এই জীবন

তাকে শুধু আঘাত দিচ্ছে, অমৃত পাবার আশা করে তাই সে দোয়াভিক্ষা করে বার বার।

প্রভাতের বাতাস তার তপ্ত ললাট চুম্বন করে আশীর্বাদ জানায়। দুটো একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। তারপর ঘরটা বন্ধ করে চলতে শুরু করে খুদাবক্স।

এলাহাবাদের পথে চলতে চলতে কোম্পানীর ডাকসওয়ারের সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হয় খুদাবক্সের। একই সরাইখানায় তারা বিশ্রাম করছিল। খুদাবক্সের প্রশ্নের জবাবে সে জানায়—হ্যাঁ, ঝাঁসীতেও তাকে যেতে আসতে হচ্ছে সম্প্রতি। 'ঝাঁসী' নামটা শুনেই কেমন যেন লাগে খুদাবক্সের। তার হাজারটা সাগ্রহ প্রশ্নের জবাব ডাকসওয়ার দিতে পারে না। একটা শহর মাত্র, এমন কি দেখবার আছে, এত কি জানবার আছে? তা ছাড়া এখন তো একটাই খবর, ঝাঁসীর রাজ্য থাকে কি যায়! রাজাসাহেব সম্প্রতি মারা গিয়েছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় খুদাবক্স। প্রশ্ন করে—কি হয়েছিল?

—কি জানি! ভাই, মৌত যখন পরওয়ানা জারী করে, তখন কিছু কিছু বাহির নিশানা দেখায়—আসলে কি হয়েছিল জানো? মৌত ধরেছিল, আর কিছু নয়।

রাজার জন্য সহানুভূতি হয় খুদাবক্সের। মন ভরে ওঠে অনুশোচনায়। সময় মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

বা রো

বীণার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদে মোতি। কাঁদে আর বলে—সব সাধনা মিছে হয়ে গেল গুরুজী, আমি গান করতে পারি না, সাধনা করতে পারি না। গান করতে যখনই মন স্থির করি, ধ্যান ঠিক করি, সেই ধ্যান আমার ভেঙেচুরে কোন একজনের ধ্যানে বিলীন হয়ে যায়, এ কি হলো!

কান্নায় ভেজা মুখ, অধরোষ্ঠ থর থর করে কাঁপছে। চন্দ্রভানের কাছে সকরুণ মিনতি করে মোতি।

এত বিদ্যা চন্দ্রভানের, এত মানবচরিত্র দেখেছেন তিনি, তবু এই হতভাগ্য নর্তকীর অনুশোচনার সামনে সব জানা তাঁর মিথ্যা হয়ে যায়। নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, মানুষের বেদনাই সবচেয়ে মহান সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতের 'অরমাঁ' কণ্ঠে বেজে সার্থক হবে যে সঙ্গীতে, সেই সিদ্ধি তাঁর তো নেই। যাঁরা সঙ্গীতের তীর্থে বাউরা যাত্রিক, তাঁদের কথা স্মরণ করে এতদিনে মনে হয় যে, মানুষের হৃদয় শ্রেষ্ঠতম বীণা, আর মানুষের বেদনাই শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত।

সে কথা বোঝেন বলেই প্রিয় শিষ্যাকে সান্ত্বনা দিতে ভাষা খুঁজে পান না চন্দ্রভান। শুধু হাত বুলিয়ে দেন মাথায়। প্রত্যহ আসেন, আর বসে বসে চলে যান।

মোতির মধ্যে যেন কোন বিস্মৃত বেদনার স্মৃতি খুঁজে পান চন্দ্রভান। মোতির বিভ্রান্ত মুখ, দিশাহারা চাহনি দেখে চল্লিশ বছরের যবনিকা ভেদ করে নিজের যৌবনের মদমত্ত দিনগুলির কথা স্মরণ করেন তিনি। মনে পড়ে পান্নার রাজবাড়িতে দশহরার চন্দ্রালোকিত রজনীতে জল-মহলের একটি করুণ দৃশ্য। মনে পড়ে তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন, আর কার মিনতি তাঁর পায়ে পায়ে লুটিয়ে পড়ছে—যেও না! যেও না! শুনে যাও। মনে পড়ে ঘৃণাভরে তিনি বলেছিলেন—আমার ভালোবাসা পণ্য নয়—মিষ্টি হাসির দামে তাকে কেনা যায় না। তাঁর রূঢ় কথার আঘাতে বিবর্ণ হয়ে গেল একখানি অপরূপ মুখ। নিজেকে তিরস্কার করেন চন্দ্রভান। মনে হয় আজ যেন মোতির মধ্যে সেই অবহেলিতার প্রকৃত রূপ দেখছেন তিনি।

গানে যদি শ্রীরাধিকার কথা থাকে তো, গাইতে গাইতে সে কথা বিস্মৃত হয়ে নিজের কথায় চলে যায় মোতি। কুকুভা ও খম্বাবতী, গুর্জরী ও ভূপালীকে কণ্ঠে আহ্বান করতে বাধে তার। প্রিয়সঙ্গসুখ-নিমগ্না, মালতীপুষ্প শোভিতা হে কমলাননা রাগিণী, তুমি কি আমার দুঃখ বুঝবে! কেবল এই কথা মনে হয় তার।

বিরহিণী রাগিণীমালা পটমঞ্জরী, আশাবরী ও ললিতার ছবি

দেখে মোতি। দিগন্ত রেখা থেকে পুঞ্জে পুঞ্জে যখন মেঘ উঠে আসে তখন তার মনে হয় এমনি দুর্যোগের মধ্যে তার দয়িত চলেছে একা, মনে হয় সেই পথ যদি সে হতে পারত, যদি তার প্রিয়তম পদক্ষেপে দলিত করেও যেতো, তবু কিছু সান্ত্বনা মিলতো তার। যখন মনে হয় সুখ, অর্থ ও নিরাপত্তার সব সম্ভাবনা পদদলিত করে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে গিয়েছে তখন মোতি আর নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। তার পরিবেশ, তার অর্থ, ঐশ্বর্য, কাঁটার মতো বেঁধে তাকে।

সান্ত্বনা দিতে ভয় পায় জুহী। মোতির কাছে কাছে থেকে শুধু সকরুণ চোখে চেয়ে ফেরে। পাখীর শখ ছিল মোতির, পিঁজরায় তারাও বসে বসে ঝিমায়, আদর যত্ন পায় না। ঘরে ঘরে গালিচার ওপর ধুলো জমে আর ঝাড়লণ্ঠনে মাকড়সা জাল বোনে। দাসীদের কাজেও শৈথিল্য দেখা দেয়।

কখনও শয়নকক্ষে তার নাচবার পোষাকগুলো সাজিয়ে রেখে দেখে মোতি। বিরহে, মিলনে, হোলিতে, অভিসারে, রাধিকার এক এক রকম পোষাক। মনে হয় কোনদিনও এগুলো আর কাজে লাগবে না তার। দিন উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু রাত্রি আর কাটে না। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে নগরী, তবু তার চোখে ঘুম আসে না। নিদ্রাহীন রাতে তানপুরাতে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে গান গায়, 'নিদ নহী আবত সৈয়াঁ—' গাইতে গাইতে গান আর গান থাকে না, সুর হয়ে যায় অশ্রু। তখন তানপুরা নামিয়ে রেখে মোতি বলে,—কান্না এনে দিস্ কথায় কথায়, তুই কি আমার সতিন?'

কখনো নির্জন ঘরে প্রসাধন করে মোতি, সযত্নে বেণী রচনা করে, কপালে টিপ পরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখে আয়না ধরে। বিছানায় বসে পায়ের ওপর দিয়ে ঘাগ্‌রার প্রান্ত বিছিয়ে দেয় আর ভাবে সেই দিনগুলোর কথা—এমনি করে সেজেছিলাম দেখে সে একদিন বলেছিল—রোজ রোজ এত প্রসাধনের কি প্রয়োজন? কোন হরিণকে ঘায়েল করতে চাও? আমার হৃদয় দেখো জর্জরিত, আরো আঘাত কি সহ্য হবে? মনে পড়ে গান গেয়ে কত রাত কেটে গিয়েছে। তারপরেই আবার মনে পড়ে সেই শেষ দিনের কথা। তার কথার চাবুকে পাংশু হয়ে গিয়েছে খুদাবক্সের মুখ,

বিস্মিত ও আহত দৃষ্টি। যত মনে পড়ে ততই মনের জ্বলুনি বেড়ে যায় তার। দুঃখে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদে মোতি।

কখনও মনে হয় সেই ব্লা কি কম নিষ্ঠুর! আঘাত দিলো মোতি আর সেটাই সত্যি মেনে চলে গেল? সেই আঘাত যে ফিরে মোতিকেই হানল, তা তো দেখলো না, বুঝলো না খুদাবক্স? তখন খুদাবক্সকে কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর মনে করলে তার খানিকটা শান্তি হয়। আবার ভাবে জীবনটাই আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। আর ব্যর্থ হয়ে গেল জেনেও এই ব্যর্থতার থেকে আমি মুক্তি পেলাম না। এ এক আশ্চর্য প্রেম, যাতে তার কোন অধিকারই স্বীকৃত হলো না।

> 'ন গুল আপনা, ন খার আপনা
> ন জালিমবাগবানে আপনা—
> বনাইয়া হ্যায় কিস্ গুল্‌শন মেঁ
> ম্যয়ঁ ঘ্যর আপনা?'

ফুল আমার নয়, কাঁটা আমার নয়, নিষ্ঠুর বাগানের মালী, সেও আমার নয়। তবে কোন গুলবাগিচায় আমি আমার ঘর বাঁধলাম!

প্রেম আমাকে শুধু বন্দী করেই রেখে গেল, অথচ প্রতিবাদ করেও উপায় নেই—

> ইয়ে কাফসোঁ কো কয়েদীয়োঁ কা
> আঁসু বহানা হ্যায় মনা—

এই কারাগারের বন্দীদের অশ্রুমোচন করতে নেই।

একদিন স্নানান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে কার সুস্বর গান শুনে তাঞ্জাম থামালো মোতি। চৌকে দাঁড়িয়ে একটি অন্ধ রমণী গাইছে—

> তেরে কারণ ময় প্রীতম যোগান বনি যাঁউ
> যোগান বন্ যাঁউ ॥
> অঙ্গ ভূষণ ছোড়ি প্রীতম
> গৈর বসন পহ্‌নাউঁ
> একনাম গাবত প্রীতম তীরথ তীরথ ভরমাউঁ
> যোগান বন্ যাঁউ ॥

প্রেমিকের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের এই নিবেদন শুনে মোতির হৃদয়ে বর্ষণান্তে পুষ্পিত কামিনী গাছের মতো দোলা লাগল—অশ্রু বিন্দু চ্যুতবৃন্ত ফুলের মতো ঝরে পড়ল নিমেষে। শিবিকা থেকে নেমে দাঁড়াল মোতি। ভিখারিণীর হাতে গলা থেকে সোনা ও মুক্তার

বহুমূল্য হার খুলে দিলো। রাজপথে প্রকাশ্যভাবে তখনো মোতিকে দেখতে অভ্যস্ত নয় মানুষ। তারা সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। ভিখারিণী একটু হেসে বললো—মাল্‌কিন, তুমি মেহেরবান, কিন্তু আমি সামান্য ভিখারিণী, এই অলঙ্কার আমার হাতে দেখলে যে লোকে কেড়ে নেবে, কয়েদ করবে—তা ছাড়া এ তো আমার কাজে লাগবে না। এ তুমি ফিরিয়ে নাও।

—তোমার ঘরে কেউ নেই ?

—আমার পিতাজী আছেন।

এমনি সময় পিছন থেকে জলদগম্ভীর স্বরে কে বললেন—তুমি নির্ভয়ে ঘরে চলে যাও বেটি। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। সাগর একে ঘরে পৌঁছে দাও।

জনতা ঘোসের সম্মানে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল। মোতি ও ঘোস পরস্পরের দিকে তাকালেন। ত্বরিতে শিবিকায় উঠে মোতি পর্দা টেনে দিলো।

ঘরে ফিরে চন্দ্রভানকে ডেকে পাঠালো মোতি। বললো—গুরুজী আপনি আমাকে ভজন শিক্ষা দিন। আমি ভজন শিখবো।

চন্দ্রভান বুঝলেন। বললেন—ভজন তুমি গাইতে পারবে মোতি। সব গান সকলে গাইতে পারে না। ভজনের অরমাঁ চরিত্রে সঞ্জাত হবার পূর্বে প্রয়োজন হয় কিছু চিত্তশুদ্ধির—তা হয় কখনো দহনে, কখনো অশ্রুতে। মীরার কথা খেয়াল করো।

উত্তর না দিয়ে একটু হাসে মোতি। সে ভাবে, তবে কি আমার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে ? আমি যোগ্য হয়েছি ?

চন্দ্রভান ভাবেন, জীবনের পশ্চিমে চলে এলাম, তবু শিক্ষা শেষ হলো না। আখ্‌রী পাঠ নিতে বাকি ছিল। সে শিক্ষা তাঁকে দিলো এই নর্তকী, মানুষকে আরো ভালোবাসতে শেখাল এই মেয়ে। তাঁর অহঙ্কারেরও মোচন হলো। বলেন—তম্বুরা বাঁধ বেটি, বলো কোন ভজনে পাঠ শুরু করবে !

মুখ নিচু করে মোতি বলে—সেই 'যোগান বন্‌ জাউঁ'—শেখান গুরুজী।

চন্দ্রভান গান শুরু করেন বিনা প্রতিবাদে।

যোগান বন্‌ জাউঁ, যোগিনী হয়ে যাবো তোমারই জন্যে—এই

কথার মধ্যে শান্তি পায় মোতি। তার হৃদয়ের ধূপ জ্বলে জ্বলে এই সুরের আরতিকে মধুর ও পবিত্র করে।

•

ঘোস ও বাহ্‌রাম পাশাপাশি চলেন নীরবে। দু'জনেই এক কথা ভাবেন। সহসা বাহ্‌রাম বলে—মাপ করবেন ওস্তাদ, ও কাজ আপনি ঠিক করেননি।

—সেকথা আমি জানি বাহ্‌রাম।

—মোতি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল!

—মানুষ যে কত দুঃখ বহন করতে পারে বাহ্‌রাম! পাহাড় হলে দীর্ণ হয়ে যেতো!

দু'জনেই দু'জনের মন বোঝেন। তাই বেশি কথা হয় না। বাহ্‌রাম জিজ্ঞাসা করে—আপনি যে টাকা আর খত পাঠালেন, তার কি হলো?

—কিশোর এখনো আপস আসেনি, তবে খবর পাঠিয়েছে এলাহাবাদ থেকে। ওর মা মারা গিয়েছেন, সে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

তারপর বলেন—বড় অন্যায় আমি করেছি বাহ্‌রাম, বড় অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছিল। একটা জান দেবার ক্ষমতা নেই, অথচ দু'জন মানুষকে ঘা দিলাম!

—আপনিও ঘা খেলেন।

—দু'জনের কথাই কেবল ভাবি বাহ্‌রাম, তিস্‌রা জনের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু এই পাপ আমি মোচন করে যাবো।

—তাও জানি ওস্তাদ, আপনি চেষ্টা করবেন।

বাহ্‌রামের এই আশ্বাসে কিছুটা বল পান ঘোস। একটু সান্ত্বনা মেলে।

তে রো

সরাইখানায় বসে কোম্পানীর ডাকসওয়ারের হাতে ঘোসের কাছে একখানা খত পাঠায় খুদাবক্স, লেখে: ওস্তাদ,

আমার শেষ বন্ধন কেটে গিয়েছে। মা আমাকে ছুটি দিয়ে গিয়েছেন। অনেকদিন হলো আপনাকে ছেড়ে এসেছি। আপনার কুশল জানতে ইচ্ছে করে। একটা ছোট সরাইখানায় বসে আছি। কোম্পানীর ডাকসওয়ারের মুখে জানলাম রাজাসাহেব আর নেই। জেনে দুঃখিত হয়েছি। আমার বন্ধু পরন্তপ চৌহানের সঙ্গে এলাহাবাদের কাছে একটি রিসালা-হল্ট কারবার করবার কথা হয়েছে। আপনি আমার ভালোমন্দের কথা ভাবেন বলে জানি, তাই এত কথা লিখলাম। এ কাজে হয়তো ভালোই হবে। নতুন কোন নোকরী আর করবার ইচ্ছে নেই। আপনার কুশল কামনা করি। আপনার মতো হিমায়েতদার, বাহ্‌রামের মতো বন্ধু মিলেছে বলেই জীবনের এই কারোয়াঁতে মিশে পড়েও আফসোসের কিছু নেই। খুদাহাফিজ।—খুদাবক্স।

থলি বের করে ডাকবরদারকে মাশুল গুণে দিলো খুদাবক্স। লোকটা খুদাবক্সকে বললো—তুমি নতুন বেরিয়েছ পথে। তাই সব নিয়ম জানো না। এমনি করে কখনও টাকা বের করো না। বেঘোরে বদমায়েশের হাতে জান চলে যাবে।

পরদিন পথ চলতে চলতে দুপুর নাগাদ একজন বুড়ো সঙ্গী জুটে গেল। পথের পাশে বসে সে সযত্নে খুদাবক্সকে মিঠাই বের করে দিলো, এক রকম শরবতও বানালো। খেতে দিয়ে বললো—আমার টাকাকড়ি আর মালপত্র একটু দেখো। আমি স্নান করে আসি।

কম্বলের ওপর চিত্ হয়ে শুয়ে খুদাবক্স ভাবল : এত ভালো লোক রয়েছে দুনিয়াতে, তবু সবাই শুধু সাবধান হতে বলে। তারপর তার ভারী ঘুম পেতে লাগল। চোখ বুজল খুদাবক্স।

সহযাত্রীকে আফিম বা ধুতুরা খাইয়ে জিনিষপত্র নিয়ে উধাও হবার নজীর তখন বিরল নয়। ভাগ্যক্রমে খুদাবক্সের অচৈতন্য দেহ কোম্পানীর রেজিমেণ্টের চোখে পড়েছিল—সড়ক ধরে কুচ চলেছিল নারায়ণপুরের দিকে। রিসালার সহিসদের চোখে পড়তে তারা খবর দেয়।

জ্ঞান হতে খুদাবক্স বুঝল যে সে কোন ফৌজের হল্টের তাঁবুতে রয়েছে। শুনতে পেল দূরে কোথায় যেন উর্দিবাজনা

অভ্যাস করাচ্ছেন উর্দিমেজর। হঠাৎ তাঁবুর দরজা সরিয়ে ঘরে ঢুকল একজন শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক। সাদা আচকান ও পায়জামা পরনে। সুগঠিত, ঈষৎ স্থূল দেহ। তাকে বললেন—হুঁশ এসেছে আপনার! কতক্ষণ জেগেছেন?

—এই তো! আমি কোথায়?

—নারায়ণপুর হল্ট-এ। কি হয়েছিল মনে করতে পারেন?

খুদাবক্স ভদ্রলোকের বারণ সত্ত্বেও উঠে বসে। বলে—নারায়ণপুর হল্ট? এলাহাবাদ থেকে কতদূর?

—পঁয়ত্রিশ মাইল পুবে। কেন, এলাহাবাদে আপনার কাজ ছিল?

একটু অবাক হয়ে থাকে খুদাবক্স। তারপর বলে—হ্যাঁ। কিন্তু কি হয়েছিল আমার?

ভদ্রলোক তাকে একটু ওষুধ খেতে দেন। তারপর টুলে বসে বলতে শুরু করেন। আস্তে আস্তে থেমে থেমে কথা বলবার অভ্যাস তাঁর। খুদাবক্স শোনে, তার সঙ্গী তাকে ধুতুরা খাইয়ে টাকা-কড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল। রামপুর ফোর্থ নেটিভ ইনফ্যান্ট্রীর রাইট উইং ও রিসালার দুটো ট্রুপ কুচ করে চলেছিল। সহিসদের চোখে পড়েছিল, তারাই তুলে এনেছে খুদাবক্সকে। তিনি বাঙালী ডাক্তার, নাম শিবচন্দ্র গাঙ্গুলী।

—আপনিই আমার জান বাঁচিয়েছেন।

—আপনি স্বীয় ভাগ্যজোরে বেঁচে গিয়েছেন। আমি সাহায্য করেছি মাত্র।

—কুচ-এর সঙ্গে আমি তো থাকতে পারবো না—নিয়ম নেই শুনেছি।

—হ্যাঁ, স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড সাহেব আপত্তি করেছিলেন। তবে আমি বলে কয়ে রাজী করিয়েছি।

—এখান থেকে আপনারা কতদূর যাবেন?

—চারদিন পরে এলাহাবাদে ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কাশী যাবার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল।

—কেন?

—আমরা আদেশ পালন করি মাত্র। কোন প্রশ্ন করবার

এক্তিয়ার নেই। মনে হয় কোন জরুরী খবর এসে গিয়েছে।

—আমাকে ছেড়ে দিন তবে ?

এতক্ষণে একটু হাসেন ডাক্তারবাবু। বললেন—আপনি তো কারো কয়েদ নন্। তবে যাবার মতো তাগদ আপনার শরীরে নেই। কুচের সঙ্গে কোন কাজ করবেন ?

খুদাবক্স কি যেন একটা আঁচ্ করতে পারে। বলে—জনাব, আপনি আমার জান বাঁচিয়েছেন, ও-ই বড় কথা। ফির 'আপনি' বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। বলুন কি কাজ করব ?

—হাসপাতাল, সাফাখানার জন্যে আমি একজন লোক চাই। হল্টে যে ওষুধপত্রের তদারক আর সাফাখানার বন্দোবস্ত করতো, সে পথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ছুটি দিয়েছি, সে এলাহাবাদে আমাদের সঙ্গে মিলবে। তুমি থাকতে চাও তো আমি সাহেবকে বলবো। বুঝতেই পারছ, তোমাকে রেজিমেণ্ট কোন মাইনে দেবে না। এখান থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে। খরচ যা, আমি দেবো।

রাজী হয়ে যায় খুদাবক্স। সাহেব, রেজিমেণ্ট, এইসব কথা সে কতবার শুনেছে। ঝাঁসীতে থাকা কালীন দেখেছে এলিস সাহেবের সঙ্গে ঘোসের সেলাম বিনিময়ের সম্পর্ক। দু'জনেই সামান্য মাথা হেলিয়ে পরিচয় স্বীকার করতেন। ঝাঁসীর সাহেবদের সে কখনো আগ্রহ করে কাছে গিয়ে দেখেনি। যদিও সে জানতো সব সাহেব আর ডেভিডসন নয়, তথাপি তার রক্তে সাহেবদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। কিন্তু তা সত্বেও সে রাজী হয়ে গেল। মনে হলো এও একটা সুযোগ।

স্নান শেষ করে পরিষ্কার চিপা ও কুর্তা পরে যখন মুরেঠা বাঁধল খুদাবক্স, সকলেই একবার তাকে তাকিয়ে দেখল। পরে ডাক্তারবাবু তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন সাহেবের তাঁবুতে। বললেন—আজ রবিবার। কাজ কম। স্ট্র্যাটফোর্ড সাহেবকে সেলাম পেশ করতে হবে—খেয়াল রেখো।

স্যামুয়েল হেনরী স্ট্র্যাটফোর্ড সাহেবের ছাব্বিশ বছর কাটল ইণ্ডিয়াতে। তবু গরমে অভ্যস্ত হতে পারলেন না। তাঁবুর ভেতর টেবিলে কি যেন লিখছিলেন। ডাক্তারবাবু ভেতরে ঢুকতে বললেন

—অনেকদিন বাঁচবে তুমি, তোমার কথাই ভাবছিলাম। সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের হাতের ব্যথাটা তুমি একবার দেখবে।

—দেখব স্যার।

—চিতাবাঘের আঁচড়—একটু গোলমাল হতে পারে কি ?

—মনে হয় না। বাচ্চা বাঘ তো ?

—বড় ill fated কুচ এবারকার। তোমাকে তো বলেছি গাঙ্গুলী, ঐ লোকটাকে তুমি ছাড়ো। ও সঙ্গে থাকলেই গোলমাল শুরু হয়।

—সে তো অসুখ হয়ে ছুটিতে চলে গিয়েছে স্যার।

সাহেব পাইপ নামিয়ে বলেন—কিছু বলবে আর ?

—হাঁ।—খুদাবক্সের কথাটা পেশ করেন তিনি।

খুদাবক্স তাঁর নির্দেশে ঘরে ঢুকে সেলাম করে দাঁড়ায়। একটু অবাক হয়ে দেখেন সাহেব। বলেন—যাও। ঠিক আছে। গাঙ্গুলীকে বলেন—এ রকম striking চেহারা, good carriage খুব কমই দেখা যায়। He is not used to serve বলে বোধ হয় গাঙ্গুলী। কোন গোলমাল করবে না তো ?

—সামান্য ক'টা দিনের জন্যে।

—ঠিক আছে। Serve করেনি কথাটা কেন বললাম জানো ? আমি ছাব্বিশ বছর ধরে তোমার দেশের লোকদের দেখছি। কোন নেটিভ, সাহেবের সামনে ওভাবে দাঁড়ায় না। How free he looks. You know me quite well. তাই ভুল বুঝবে না আশা করি। এরা বেশিদিন serve করতে পারে না। Better under Native States, ফৌজী জীবনে চলতে পারে না।

গাঙ্গুলী চলে আসেন। অন্য সাহেবদের কথা আলাদা। স্ট্র্যাটফোর্ডকে তিনি ভালোভাবেই জানেন। ভারতীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের জন্য, সরলতা ও সংবেদনশীল স্বভাবের জন্য তিনি ভারতীয়দের মধ্যে যতটা প্রিয় ততটা স্ব-জাতীয়ের মধ্যে নন। মীরাট, এলাহাবাদ ও বেনারসে ক্যান্টনমেণ্ট ক্লাবে তাঁকে দোস্ত সাহেব নামে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়, তাও তিনি শুনেছেন। স্ট্যাটফোর্ডের রেজিমেণ্ট তাঁকে ভালোবেসে রিসালার দোস্ত বলে। সেই নামই বুঝি অন্য ভাষণ পেয়েছে সাহেব মহলে ? স্ট্র্যাটফোর্ডের

কথাটা হয়তো সত্যি। অনেক দেখেছেন তিনি, বেশি দেখেছেন ভারতীয়দের। হিন্দী, হিন্দুস্থানী এবং তাঁর প্রথম কর্মস্থল রাজস্থানের কিছু স্থানীয় ভাষাও তিনি জানেন। রিটায়ার করার পরে রেওয়া ও পান্নার জীবজন্তু ও পাখীর ওপর একখানা প্রামাণ্য বই লেখবার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করছেন। এই সব ভাবতে ভাবতে সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে গলা ঝেড়ে নিজের উপস্থিতি জানালেন গাঙ্গুলী। ব্রাইটের মেজাজ স্ট্র্যাটফোর্ডের থেকে একেবারে আলাদা। জড়িত কণ্ঠে একটা গালাগালি দিয়েই তাঁকে ঢুকতে বললো বলে বোধ হলো।

ফৌজের জীবন বড় আগ্রহের সঙ্গে দেখে খুদাবক্স। একেবারেই নতুন রকম লাগে।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার খানা তুমিই বানাবে তো?

—আপনাদের যা আদত।

কি বুঝেছিলেন ডাক্তারবাবু কে জানে, তাঁর সাফাখানার মুসলমান বেয়ারা খুদাবক্সকে খানা পেঁাছে দিয়ে গেল তাঁবুতে।

ভোরবেলা উর্দি বাজে, তখন উঠে পড়ে ফৌজ। বাঁশির পরেই ড্রাম বাজে। সঙ্গে সঙ্গে পোষাক পরে, বন্দুক নিয়ে সিপাহীরা প্যারেড করে।

বানিয়ার তাঁবুতে এগারোটার সময় সিধা নিতে যায় সিপাহীরা। বানিয়া সিপাহী ও রিসালার সওয়ারদের মেপে মেপে সিধা দেয়। অড়হরের ডাল আর আটা, লবণ আর সামান্য ঘি। এই একই খাদ্য দিনের পর দিন দুই বেলা। —কেন রোজ একই খাবার খাও? জিজ্ঞাসা করেছিল খুদাবক্স একদিন। পরমেশ্বর আহীর তার দিকে চোখ মট্‌কালো। অর্থাৎ প্রশ্ন করো না। পরে বললো—বৃহস্পতিবার প্যারেড নেই, সাহেবরা শিকার খেলতে যাবেন, নারায়ণপুরের ঠাকুরসাহেব নেমন্তন্ন করেছেন। সেদিন গল্পসল্প করবো।

কেউ যেন কাউকে বিশ্বাস করে না। জাত, জাত,—জাতের কথা খুব শোনে খুদাবক্স। ভাবে, জাতের মধ্যে দুটো তো জাত দেখলাম। কিছু মানুষ ভালো, আর কিছু মন্দ। হ্যাঁ, তবে হিন্দু

মুসলমান জানি। কিন্তু এখানে এসে অনেক ভাগ বিভাগের নজীর পেল খুদাবক্স। পূরবিয়া হিন্দুস্থানীরা এসেছে প্রধানতঃ এলাহাবাদ, অযোধ্যা থেকে। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, আহীর বা গোয়ালা ও গড়েরিয়া আছে। ফৌজে এরা ভালো ভালো পদে আছে। আবার তারাই সুবেদার, জমাদার ও হাবিলদার হতে পারে যারা একটু ভালো ঘর থেকে এসেছে। এরা মাছ মাংস খায় না। এক বেলা আহার করে আর জাতের গর্ব করে।

শিখরা ভালো সিপাহী হয়। তারা নিজেদের মধ্যে থাকে, মাংস খেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেরা জবাই করলে তবেই খায়, অন্যথায় মাংস তাদের কাছে হারাম।

গুর্খারা এক আশ্চর্য জাত। বেঁটে, পেশল চৌকো শরীর, ছোট ছোট চোখ। এরা এসেছে নেপাল থেকে। ইংরেজ অফিসাররা গুর্খা আর শিখদের ভারী খাতির করেন। বড় পরিশ্রমী আর স্বল্পে তুষ্ট গুর্খারা। মাছ, মাংস, বুনো শুয়োর, যা যখন সংগ্রহ করতে পারে, খায়।

পাঠান, আফগান ও মকরানী মুসলমান ভালো সওয়ার হয়। তারা দু'বেলা আহার করে।

জাত নিয়ে বড় কথা হয়। এ ওর সঙ্গে খাওয়া-পরা ওঠা-বসা করে না। গুর্খাদের নিয়ে শিখরা হাসে আবার শিখদের দেখে গড়েরিয়ারা ঠাট্টা করে।

সাহেবদের তাঁবুতে, বাবুর্চিখানার সামনে, মেস-তাঁবুতে, সাফাখানার সামনে, উর্দি তাঁবুতে, সর্বত্র পাহারা দেয় সিপাহীরা। ডিউটি পড়ে তাদের। ছোকরা একজন সিপাহী সাফাখানার সামনে দুই ঘণ্টার কাছাকাছি পায়চারি করছে পা গুণে গুণে, দেখে একদিন খুদাবক্স বলেছিল—বসো না তুমি! ক্লান্ত হয়ে গিয়েছ তো?

—এরকম বলবেন না খাঁ-সাহেব। জমাদার সাহেব জানলে আমারই কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে।

খুদাবক্স একথা গাঙ্গুলীকে জানাতে তিনি বলেছিলেন—দুইঘণ্টা পায়চারি করে পাহারা দেওয়া ওর ডিউটি। দু'ঘণ্টার ভেতরে একবার থামলে, কি বললে, কোর্টমার্শাল হয়ে যাবে তাও যেমন সত্যি আবার না বসলেও কোর্টমার্শাল হতে পারে কেউ যদি

রিপোর্ট করে যে, তুমি ওকে বসতে বলেছ। বেত খেতে ওই খাবে, কেননা জমাদার বলবে নিশ্চয় ও তোমার কাছে কোন রকমে ওর যে পরিশ্রম হচ্ছে, সেই অভিযোগ করেছে, নয় তো তুমি বলবে কেন?

—সে তো অন্যায় হবে।

—এই রকম করে সিপাহীদের ছলছুতো দেখাতে পারলেই তো জমাদারের উন্নতি হবার ভরসা থাকে।

বেত মারবার বহরও একদিন দেখলে খুদাবক্স। দু'জন রিসালার সহিস নাকি বাবুর্চিখানা থেকে আলু চুরি করেছিল। শাস্তি ঠিক হলো পাঁচ ঘা করে বেত। শুনে মনে হলো সামান্য কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল এমন কাতরভাবে কাঁদছে সহিসরা যেন তাদের বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'জন সিপাহী তাদের ধরে নিয়ে এল। চামড়ার জোড়া বেত অপেক্ষা করছিল। তুলে নিলো তার একখানা রিসালার সুলতান। মিনিট দশেক সময় মাত্র। কিন্তু খুদাবক্সের মনে হলো মনুষ্যত্বের কোন দোহাই আর রইল না। মানুষকে একেবারে নগ্নভাবে অসহায় করে ফেলে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলো কে জানে!

বেত মারা হচ্ছিল সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার ব্রাইটের তত্ত্বাবধানে। কারণ স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড সাহেব গ্রামের ঠাকুরসাহেবের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছেন। বেত মারা হয়ে যাবার পর গাঙ্গুলী সহিস দু'জনকে সাফাখানার তাঁবুতে নিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। ব্রাইটের প্রশ্নের জবাবে বললেন—এখন তো ওদের ওষুধ লাগিয়ে দেওয়াই দরকার।

সাফাখানার তাঁবুর বাইরে হঠাৎ একটা তৈলাক্ত মোলায়েম গলা শোনা গেল—ডাক্তারসাহেব আছেন? ছোট ছোট চোখ, কালো রঙ, দাস্য-সুখে পরিতৃপ্ত চেহারা লোকটাকে দেখেই কি রকম যেন লাগল খুদাবক্সের। গাঙ্গুলী তার হাতের শিশিটাতে খানিকটা মলম ভরে দিতে দিতে বললেন—সুখচাঁদ আর বংশীকে ধরিয়ে দিয়েছে কে, তুমিই তো? তুমি রূপচাঁদ না?

—হ্যাঁ হুজুর আমিই। মেহেরবান আপনি, নাম মনে রেখেছেন। ওরা চুরি করছিল হুজুর।

—আলুর সের দু'পয়সা রূপচাঁদ, আর সুখচাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছে। শরম আসে না তোমার?

তেমনি হেসেই লোকটা বললো—ভুল হয়ে গিয়েছে হুজুর। কোম্পানীর ওপর চুরি দেখে মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল।

ঝরনার ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসে তিন চারজন সিপাহীর সঙ্গে কথা বলছিল খুদাবক্স। গিরধারীলালের কথায় একটা চরম হতাশার ছবি ফুটে ওঠে। বলে—যখন ফৌজে সিপাহী হয়ে ঢুকেছিলাম, ভেবেছিলাম সুবেদার হয়ে বেরুবো। সাত বছর হয়ে গেল। এখন বুঝি, সুবেদার আমি আর হবো না। মাসে সাত টাকা মাইনেতে ঢুকেছি। খাইদাই, কাপড়-লত্তা বাবদ বেনিয়া মুদীর খাতা চুকিয়ে হাতে পেয়েছি বড়-জোর এক টাকা, কি দেড় টাকা। এমন অনেক মাস গিয়েছে যখন এক আনাও মেলেনি। বেনিয়ার ধার শুধে সাত টাকার একটা পয়সাও বাঁচেনি। কোম্পানীর হয়ে খাটলাম, লড়লাম, চাবুক খেলাম, আর সারা জীবনটা ডাল রুটি খেয়েই কাটিয়ে দিলাম। ঐ দিন তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, কেন ডাল রুটি খায় ফৌজ! জানবে বাড়িতে আমরা হরদম যে সব্জী চাষ করি, এখানে তা মেলে না। তরকারি সে-ই খাবে, যার পয়সা আছে। ঘরে টাকা পাঠাতে পারবো এই ভরসায় ফৌজে এসেছিলাম, কিন্তু হাতে করে টাকার চেহারা না নিজে দেখলাম, না ঘরের কেউ জানলো সাতটা টাকা কি রকম দেখতে!

পরমেশ্বর আহীর বলে—এসেছিলাম আঠারো বছর বয়সে। অযোধ্যাতে গণ্ডক নদীর ধারে আমার গ্রাম। আমের জন্যে আমাদের জেলার খুব নাম। যদি মাসে পাঁচ টাকা কামাতে পারো তো রাজার মতন থাকবে আমাদের গাঁয়ে। আমার বাপের দুই বিয়ে। মাকে বাবা বড় কষ্ট দিয়েছিল। তাই ভাবতাম, মাকে আমি সুখে রাখব। জ্যেঠাই-মা আমাকে আর মাকে শুতে ঘর দিত না। ঝোপড়ীতে শীতের মধ্যে দু'জনে তুঁষের বোরা চাপা দিয়ে ঘুমোতাম আর ভাবতাম, একটু জমি, একখানা ঘর, দুটো বকরী আর একটা ছোট বৌ—পঞ্চাশ টাকা যদি জীবনে কামাতে পারি তো সব হবে। কিন্তু কিছুই হলো না। আট বছর ধরে কাজ করছি, পায়ে হেঁটেছি কম করে কয়েকহাজার মাইল।

জলে ভিজেছি, রোদে পুড়েছি, অনেক তক্‌লিফ করলাম। কিন্তু ঐ পঞ্চাশ টাকা আজও ছুঁতে পারলাম না।

—রিসালার সওয়ার কত পায়?

—সিপাহীর অনেক বেশি। খাতায় লিখা হয় সাতাশ টাকা, কিন্তু হাতে পায় নয় টাকা। সহিস, ঘোড়া, ইত্যাদি খরচ থেকে শুরু করে তাঁবু, কাপড়, ধোবি, নাপিত বাবদ সব টাকাই কেটে নেয়। রিসালাতে ঢুকতে অনেক টাকার ধাক্কা। দু'শ' আশী টাকা ঘোড়ার জন্যে দিতে হয়, আর দেড় মাসের মাইনের টাকা দিতে হয় আমানত ফাণ্ডে। তিনশ' থেকে চারশ' টাকা ঘর থেকে না আনলে সওয়ার বানায় না কোম্পানী।

সকলেই বলে—বড় পরেশানীর কাজ। না করেছ, ভালো আছ। যদি ঘরে জমি থাকতো, টাকা থাকতো, আর ঠিক ঠিক মতো পৌঁছাতে পারতাম যাবতীয় ভেট, তাহলে হয়তো উন্নতি হতো আমাদেরও।

কোম্পানীর কাজ, সরকারী চাকরি, কথাটা শুনতেই ভালো। আসলে জান নিংড়ে নেয়। সিপাহীর চোখে সুবেদার হবার স্বপ্ন জ্বলে ঠিক আলেয়ার আগুনের মতোই। আশা কুহকিনী! তারপর সেই আগুনেই সে বেঘোরে প্রাণ হারায়! ফৌজী জীবন যেন দিল্লীর লাড্ডু—যে খেয়েছে, আর যে খায়নি সবাই পস্তিয়েছে। এও বোঝে খুদাবক্স যে, যা সে শুনল, সবই বাইরের কথা। ভেতরে আরো অনেক গলতি আছে, অনেক কথা জমা আছে। সহজ স্ফূর্তির অভাব, স্বচ্ছন্দ জীবনের অভাব, অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার যেন সমাধি হয়ে গিয়েছে, এমনি ধারা ক্লান্তি এইসব মানুষের চোখে-মুখে লেখা আছে।

এদের পাশাপাশি আরেকটা জীবনস্রোত প্রবহমান।

কুচে যে সব সাহেবরা এসেছে তাদের এক একজনের জন্যে পাঁচটা করে তাঁবু পড়েছে। বসবার কামরা, খানা-কামরা, শোবার কামরা, গোসলখানা—। আসবাব এসেছে: খাট, টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আর তিনটে বড় ঘোড়া। সাত আটজন সহিস তাদের দেখাশোনা করছে। পাঁচ ছয়টা টাট্টু ঘোড়াও রয়েছে। সাহেবদের আসবাব উটে বয়ে এনেছে। বেয়ারা, বাবুর্চী, মশাল্‌চী, খানসামা

হামেশা সাহেবদের সুখবিধানে ব্যস্ত। বিলিতী মদও দুষ্প্রাপ্য নয় হল্টে। গ্রাম থেকে ঠাকুরসাহেবের লোকরা বয়ে আনে হরিণের মাংস, খাসী, বড় বড় মাছ, ফল, ঘি, দুধ। প্রত্যহ খাবার সময়ে বাজনা বাজে মিঠে সুরে। বিকেলে কোনদিন এমনিই ঘোড়া চড়েন সাহেবরা, আবার কোনদিন শিকার খেলতে যান জঙ্গলে। তখন সিপাহীরা গ্রামবাসীদের জুটিয়ে আনে। টিন বাজিয়ে জঙ্গল তাড়িয়ে বরাহ আর হরিণ বের করে। কখনো হয়তো বেরিয়ে আসে চিতাবাঘ। শিকার খেলতে গিয়ে দুটো একটা বে-কায়দার ঘটনা বে-নজীর নয়। তখন হাতে টাকা গুঁজে দিতে হয় কিছু। মিটে যায় হাঙ্গামা।

ফিরতি পথে সাহেবদের জোশ্ বেড়ে যায়। এতদিন গ্রামে পড়েছিল, ক্লাব আর সভ্যজগতে ফিরতে না পারলে স্বস্তি নেই। জোরে, আরো জোরে চলতে পারে না কেন এরা? তেজী ঘোড়ার পিঠে বসে, বড়ই অধৈর্য লাগে, মনে হয় কুচের কদম বড় মন্দা। কখনও মনে হয়, দেশের জন্যে কি স্বার্থ ত্যাগটাই না করছি! কোন দূর দেশে, এই যে পথে, জঙ্গলে, গ্রামে, কত দুরবস্থার মধ্যে চলছি, একি কম কৃতিত্বের, কম ত্যাগের কথা!

এরপর ক্লাবের সভ্য-পরিবেশে একটা আলোঝলমল সন্ধ্যা, তার দাম অনেক। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে একজন আর একজনকে বলে :—বাজি ফেলে বলতে পারি নেটিভগুলো তাদের রেজিমেণ্টের বাজারে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে···বলেই কদর্য একটা ইঙ্গিত করে দু'জনে হা-হা করে হাসে।

সিপাহীরা তিনজন মিলে একটা করে তাঁবু বয়। শবদেহ বহন করবার মতো ভঙ্গীতে। ধীরে ধীরে চলে। খাকি পট্টি জড়ানো খালি পা টেনে টেনে চলে। যতদূর দেখা যায় সিপাহী আর রিসালা, লাইন-ডুরি গার্ড, রসদ গার্ড, ভিস্তি, মেথর, দফাদার, জমাদার, নায়েকের একটা বিরাট মিছিল। চলবার যান্ত্রিক ছন্দের মধ্যে ফৌজী জীবনের অনেক ইতিহাস লেখা আছে।

পথ, পথ, আর পথ! বড় বড় চওড়া সড়ক বাঁধিয়ে একদিকে আম্বালা, মীরাট, কানপুর, কর্নাল, আগ্রা, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা, অন্যদিকে সাগর, নীমাচ্, জব্বলপুরের মধ্যে

কোথাও আর তফাত রাখেনি কোম্পানী। সব দূর এক হয়ে গিয়েছে। যত পথ, তত অনির্দিষ্ট যাত্রা। সব সময় চলো তাল রেখে, সোজা হয়ে, সাহেবদের সম্মান বাঁচিয়ে।

সিপাহী থেকে সুবেদার, সওয়ার থেকে পহেলা রিসালাদার হওয়ার স্বপ্ন তাদের সামনে থাকে। তাকে নিশানা করে চলো। চলতে চলতে একদিন চলা ফুরিয়ে যাবে। আর তুমি হয়তো ঠিকানা মতন কবর অথবা চিতায় ঠিক পৌছে যাবে, তাতেও এই মিছিল থামবে না। ভালো সাহেব, মন্দ সাহেব, দয়ালু, রাগী, হিংস্র অথবা যে কোন মেজাজেরই সাহেব হোক না কেন, কোন না কোন সাহেব তোমাকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবে। অর্ডার পেয়ে যাবে ঠিক।

তার পরেও যদি জিজ্ঞাসা জাগে মনে? যদি মন ও হৃদয় বুভুক্ষু হয়? সে জন্যও ব্যবস্থা আছে। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স পাওয়া কিছু বিলাসিনী পোষা আছে। সরকারের চালাঘরে কুপীর আলোয় তার কাছে বসে মাইনের টাকার বিনিময়ে কিছু নিরালা মুহূর্ত কিনতে পার। সকালের আলোয় বাজারে যাকে দেখলে হয়তো তোমারই ঘৃণা হবে, দুঃখ হবে। তাতে কারো এসে যাবে না।

এই জীবন কাটাতে কাটাতে রক্তে ও মজ্জায় এই বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসবে যে, সাহেবরা শ্রেষ্ঠ জাতি, আর তোমরা তাদের অনেক নিচে। তখন সহজ হবে সেলাম করা, আনুগত্যের হাসি আপনিই ফুটবে। আর প্রশ্ন করবে না। সেই দিন হয়তো এখনও অনেক দূরে। তাই সাহেবদের চেষ্টার অন্ত নেই।

এলাহাবাদ কাছে আসতে গাঙ্গুলীবাবু জানতে চাইলেন যে, খুদাবক্স কাজ করতে রাজী আছে কি না। কোন কাজ কি সে চায়?

খুদাবক্স মাথা নাড়ল।—ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু সে কাজ করবে না। একটা কথা জানতে তার ইচ্ছে করে, দেশঘর ছেড়ে এতদূরে যে কাজ করেন ডাক্তারবাবু, তাঁর ভালো লাগে?

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বলেন—আমার কাজটা তবুও ভালো! —আর সবাই যদি সব সুবিধার কথা ভাবে খুদাবক্স, তবে রোগীর

রোগ সারাবে কে বলো? রোগ তো সারাতে হবে, ব্যথা তো আরাম করতেই হবে?

অকাট্য যুক্তি। সশ্রদ্ধ হয়েই স্বীকার করে খুদাবক্স। তা যদিও বা মানা গেল, তবু এ কাজে কি তাঁর মন তুষ্ট হয়?

তখন ডাক্তারবাবু যে কথা বলেন, বড় মূল্যবান মনে হয় খুদাবক্সের কাছে। তিনি বলেন—তুমি তরুণ, আমি প্রৌঢ়। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি আমার বুঝ দিয়ে যা মনে করি তাই বলছি। আমি কার নোকরী করছি তা বেশি ভাবি না খুদাবক্স। শুধু আমি কী কাজ করছি, তাই ভাবি। আর আমার ভাবনা আমি ভাববো কেন? সে কথা নিশ্চয় ভগবান ভাববেন। আমার শুধু মনে হয়, এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অবিচার, এত যন্ত্রণা যদি এতটুকু আরাম করতে পারি, যদি এতটুকু ভালো করতে পারি। চেষ্টা করতে তো দোষ নেই!

বড় দামী কথা। স্পর্শ করে খুদাবক্সকে। সে বলে—ডাক্তারবাবু, আপনার মতো যদি আমিও পারতাম!

ডাক্তারবাবু আরো বলেন—তোমার সঙ্গে আলাপই হলো না! স্বল্প পরিচয়, আর তারপরই তুমি চলে যাচ্ছ। কোথা থেকে এলে, কি তোমার পরিচয়, কিছুই জানি না। ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। তারপর হেসে বলেন—আমার রিটায়ার করবার আর চার বছর আছে। তারপর কলকাতা যদি না ফিরি তো এখানেই কোথাও রয়ে যাব। তখন দেখা হতেও পারে।

কলকাতার নাম শুনেছে খুদাবক্স। বলে—খুব বড় শহর, তাই না?

—খুব বড় শহর। সাহেবদের আসল ঘাঁটি সেখানে। অনেক ঘরবাড়ি, অনেক মানুষ।

খুদাবক্স ডাক্তার গাঙ্গুলীকে অভিবাদন জানায়। ডাক্তারবাবু দেবো দেবো করেও কিছু টাকা হাতে তুলে দিতে পারেন না তাকে। কেমন যেন মনে হয়, তাকে হয়তো অপমান করা হবে!

যাবার সময় পরমেশ্বর আহীর একটু আনমনা হয়ে যায়। বলে—আমার কথা মনে রেখো ভাই।

পথ চলতে চলতে খুদাবক্স ভাবে কোন কথা? কোন কাহিনী?

এক একটা মানুষের জীবন যেন একটা কাহিনী। একখানা ঘর, একটু ক্ষেত, একজন মল বাজানো ছেলেমানুষ বৌ—সব স্বপ্ন ভেঙে গেল পরমেশ্বরের চোখে শুধু পঞ্চাশটা টাকার জন্যে! আট বছর ধরে খাতায় কলমে ছয়শ' সত্তর টাকা রোজগার করল পরমেশ্বর, কিন্তু হাতে পেল মাত্র একশ' টাকা। এ গল্পও তো কম আশ্চর্যের নয়! আরো বিস্ময়ের এই যে, কথাটা সত্যি।

আবার এই ফৌজী জীবনেই ডাক্তারবাবুর মতো লোকের দেখা মেলে, এও কম অবাক কথা নয়। অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নীরবে অবিচলভাবে মানুষের মতো কর্তব্য করে যাবার মধ্যে যে হিম্মৎ আছে, তাও খুদাবক্সকে কম স্পর্শ করেনি। তাই ডাক্তারবাবু তার শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

তারপর একদিন খুদাবক্স পরন্তপের ঠিকানায় এসে উপস্থিত হয়। শুধু দড়িই নয়, ইতিমধ্যে ঘোড়াও যোগাড় করেছে পরন্তপ। কিছু টাকা জলখাই দিয়ে হুকুমনামাও বের করেছে ফৌজী দফতর থেকে। ফৌজকে ঘোড়া বেচবার এক্তিয়ার তার মিলেছে। তার ও খুদাবক্সের জন্য একখানা নিচু দোতলা বাড়ি। পাশে ঘোড়ার আস্তাবল। ছয়জন সহিস, চারজন চাকর। বাড়ির নিচটা শুধু শালকাঠের খুঁটি, মই দিয়ে দোতলায় উঠতে হয়। বৃষ্টি হলে নিচ দিয়ে জলের স্রোত চলে। পরন্তপ একটা চাকর আর সহিস নাকি পেয়েছে তার কোন খুড়শ্বশুরের কাছ থেকে। মারা যাবার সময় এদের লালন-পালনের ভার দিয়ে গিয়েছেন পরন্তপকে। জামাইবাড়িতে কাজ করে জামাইকে লজ্জায় ফেলে না তারা, অধিকাংশ সময়ই ধুতরো পাতার বিড়ি খেয়ে ঘুমোয়। তাদের থাকবার ঘরটাই খুব গর্ব করে দেখায় পরন্তপ। ঘরের মেঝেতে একটা ফুটো তক্তা দিয়ে ঢাকা আছে। পূর্ববর্তী কোন মালিককে নাকি ডাকাতরা ঐ ফুটো দিয়ে বর্শা মেরেছিল!

—কিন্তু কি জায়গা ভাই, তারিফ তো কর!—বলে জানলা খুলে দেয় পরন্তপ। চোখ জুড়িয়ে যায় খুদাবক্সের। শেরশাহী সড়ক চলে গিয়েছে প্রায় সামনে দিয়ে। পেছনে যমুনা নদী, পুবে এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিমে কানপুর। তাদের ঘরের ঠিক পেছনেই

একটি স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী বয়ে গিয়েছে। তার মাঝে বড় বড় কালো পাথর পড়ে আছে। সেখান থেকে জল ভরে নেয় গোয়ালিন-মেয়েরা। রাখাল স্নান করায় মহিষকে। এইসব অখ্যাত নদী-গুলো যেন গাঁয়ের মেয়েদের মতো। কল্যাণ হস্তে তৃষ্ণার্তের অঞ্জলিভরে জল ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণ করে চলেছে অবিরাম। আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুয়াশাচ্ছন্ন করুণ দিগন্ত। এমনি দিনে ঘর, প্রিয়জনের সঙ্গ, কাঠের আগুনের সামনে বসে গল্পগুজব বড় ভালো লাগে। কিন্তু যার ঘর নেই তার পক্ষে এই চিন্তা বিলাস বই কি!

রাতে বসে বসে পরন্তপকে কত কথা বলে খুদাবক্স। শুধু মোতির প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করে। বলে—কাজ দিতে পারো? অনেক কাজ, যাতে সব ভুলতে পারি, যেন কখনো নিজের কথা মনে না পড়ে?

পরন্তপ বলে—কাজের দিন তো সবে শুরু হলো খুদাবক্স। এখন তুমি অনেক কাজ পাবে।

রিসালায় ভর্তি হতে যখন সওয়ার আসে তখন সাহেব জিজ্ঞাসা করে—রূপেয়া মজুদ হ্যায়? দু'শ' টাকা সওয়ারকে ঘর থেকে আনতে হয়। সে বলে—হাঁ হুজুর, হ্যায়। তার টাকা দিয়েই ঘোড়া কিনে দেওয়া হয় সওয়ারকে। সেই ঘোড়া সরবরাহ করবার অনুমতি মিলেছে পরন্তপের। আপাততঃ দশটা ঘোড়া আছে। আগ্রা থেকে দিন দশেকের মধ্যেই আরো ঘোড়া এসে পড়বে। তারপর চাহিদামতো খবর আসবে ফতেপুর, বিন্দ্‌কী, কাল্পী ও হামীরপুর থেকে। ঘোড়া নিয়ে পেঁাছবে কখনো খুদাবক্স, কখনো পরন্তপ। অনেক ভেবে চিন্তে সড়কের ওপরে জায়গা বেছে নিয়েছে পরন্তপ। এই পথ যোগ করেছে উত্তর হিন্দুস্থানের বড় বড় শহরগুলো। এই পথ দিয়ে ডাক চলাচল করে, কুচ যায়, আর যাত্রীরা যাতায়াত করে। সব খবরাখবর পাবে তারা।

—এ কাজে অনেক টাকা দরকার, তাই না?

পরন্তপ গভীর চোখে তাকালো। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট একটা পেটি এনে নামাল। বললো—খুলে দেখো। খুদাবক্স নড়ল না। পরন্তপ নিজেই খুলে ফেলল পেটি। তুলে ধরল একমুঠো সোনা ও রূপোর টাকা। বললো—এখানে তিন হাজার আছে।

যখন দরকার হবে টিকমগড় থেকে টাকা আসবে আরো। তোমাকে সব কথা বলিনি খুদাবক্স। টিকমগড়ে আমার একটা গদী আছে। পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা যে কোন সময়ে আমি যোগাড় করতে পারি। কিন্তু রাহী মানুষের কাছে বেশি টাকা থাকা তো কাজের কথা নয়!

খুদাবক্স বললো—আমাকে এত কথা বলছ কেন পরন্তপ, তুমি আমাকে কতটুকু জানো?

—সে দায়িত্ব আমার।

—বেশ, মানলাম। কিন্তু পরন্তপ, আসল কথাটা এবার বলো। শুধু শুধু ঘোড়ার কারবার করবার জন্য ক্ষেপে উঠেছ কেন? এর মধ্যে কি কিছু ফন্দী আছে?

—চৌহান কাউকে কৈফিয়ত দেয় না। বলে অনেকদিন পর হা-হা করে হাসল পরন্তপ। বললো—হবে হবে সব কথা হবে।

—এখনই হোক না কেন?

—দাঁড়াও। বলে, একটু আগুন জ্বালালো পরন্তপ। মাঝখানে রাখল তার তলোয়ার। তারপর আবার বললো—খুদাবক্স, তোমার আর আমার ধর্ম আলাদা, এরকম শুনি, কিন্তু আমি মানি না। তাহলে তোমার আর আমার এই দোস্তি সম্ভব হতো না। তুমিও যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা। তোমার আর আমার কাছে এই তরবারি পবিত্র। তাই একে সাক্ষী করে বলো, যা শুনবে তা দ্বিতীয় লোকের কাছে বলবে না।

খুদাবক্স ছুঁলো না। তীক্ষ্ণ চোখে তাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বললো—পরন্তপ, আমি মেয়েমানুষ নই যে নিশানা ছুঁয়ে শপথ করবো। আমি নিজের জবানকে দমন করতে জানি।

অধর দংশন করল পরন্তপ। তারপর বলে—খুদাবক্স, তুমি অনেক আদত জয় করেছ, আমি বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তুমি সহজে অস্বীকার করবার জোর রাখ, এই দেখেই তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি। তবে শোন। আগে ফৌজে ছিলাম, তুমি জানো বোধ হয়?

—শুনেছিলাম তোমারই কাছে।

—ফৌজের কিছু কিছু তুমিও দেখেছ, অবশ্য বাইরে থেকে। তবে ও দেখা কিছুই নয়। দেখে থাকবে ইংরেজ আর হিন্দুস্থানের

সিপাহীতে আকাশ-পাতাল তফাত। এও জেনো, ইংরেজ এই দেশে এসেছে প্রায় একশ' বছর হতে চললো। তাদের সব আইনকান্থন সবাই মনে মনে মেনে নিতে প্পারেনি। গত তিরিশ বছরের মধ্যে বারবার সিপাহীরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আখেরে কিছুই মেলেনি। ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের লড়াই। গত চার পাঁচ বছরে ইংরেজ কোম্পানী এমন অনেক কাজ করেছে, যাতে খাঁটি হিন্দুস্থানী মনে মনে ভয় পাচ্ছে। এরা জাত মানছে না, ধর্ম রাখছে না। দেশী সরকারগুলোকে নিয়ে নিচ্ছে একে একে। রণজিৎ সিংহের মতো রাজা, যে নাকি কাশীর বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা মন্দিরের চূড়ো বাঁধতে বাইশ মণ সোনা ঢেলেছিল, যার নামে লাটসাহেব তিনবার কেঁপে যেতো, তাঁর পাঞ্জাবও হয়ে গেল কোম্পানীর তালুক। ছোটখাটো রাজ্যগুলো তো বাঘের মুখে হরিণের মতো একে একে চলে যাচ্ছে। একেবারে কায়েম হয়ে বসছে কোম্পানী, আর সব জায়গায় হিন্দুস্থানের মানুষকে একেবারে বিগর দাম, মূল্যহীন করে ছেড়ে দিচ্ছে। কোন কিছুর দাম দিচ্ছে না। না ইজ্জতের, না জানের। কিন্তু একেবারে ফুটো টাকা হয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই দাম আদায় করবার কথা উঠেছে। অনেক জায়গায় অনেক লোক অনেক কথা ভাবছে। ভাবছে স্থবিধে হলেই এই কোম্পানীকে মেরে তাড়াতে হবে। ফৌজের মধ্যে অনেকেই গরম হয়ে আছে। এ কথাও শোনা গিয়েছে যে, ফৌজকে যদি না টানা যায় তো কিছু হবে না। কেননা, ফৌজের হাতে আছে কামান, বন্দুক, তোফাখানা। আজকে তাই হিন্দুস্থানের সাঁচ্চা মানুষ মাত্রেই ফৌজী ছাউনির সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে চাচ্ছে। বড় দরকার হয়ে পড়েছে ফৌজের সঙ্গে আনাগোনা, মেলামেশা। সেইজন্যেই এই কাজ নিয়েছি আমি। অনেকের মধ্যে আমিও তো একজন। আমার কাজে বেশ স্থবিধেই হবে।

—তারপর ?

—তারপর দেখা যাবে কি হয়। তাই এই মৌকা নিয়ে নিয়েছি। এখন শুধু দেখে যাবার সময়। আসল কাজের সময় পরে আসবে।' কারণ কেউ তৈরি নেই, দেখছ না ? কতজন কত

জায়গায় আমারই মতন কাজ করছে। আগে তো তৈরি হতে হবে। আমার মতন জেনো কম করে কয়েক হাজার মানুষ আছে।

পেছনের নদীটার নাম চূণারকি। তাই নিজেদের ডেরার নামকরণ করে পরন্তপ—চূণারকি রিসালা হল্ট। ধীরে ধীরে চূণারকি রিসালা হল্ট একটি পরিচিত ঘাঁটি হয়ে ওঠে। মুৎসুদ্দীর চিট্‌ঠা নিয়ে লোক আসে, চৌথা রেজিমেণ্টে দশটা ঘোড়া চাই, বিন্দ্‌কীর পহেলা রিসালাদার নিজের জন্যে দুটো ঘোড়া চান। ঘোড়া আর সহিস নিয়ে খুদাবক্স বা পরন্তপ চলে ছাউনিতে। পুরনো ফৌজী বাপ ছেলেকে নিয়ে নাম লেখাতে আসে রিসালাতে। গাছের তলায় রান্নাবান্না করে। কিষাণ ঘরের ছেলে সরল চোখে ছাউনির কাণ্ডকারখানা দেখে। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হলে ঘোড়া কেনে দেড়শ' থেকে দু'শ' টাকা দিয়ে। আশী টাকা জমা দেয় চাঁদা ফাণ্ডে, জিনপোষ, লাগাম, এইসব বাবদ। দুই নম্বর রিসালাদার সাহেব দাঁড়িয়ে থেকে এই সব কেনা বেচা করান। বাপ চোখটা ঈষৎ কুঁচকে থলি থেকে গুণে গুণে টাকা দেয়। এই টাকা শেষ জীবনে ফেরত পাবার কথা জেনেও সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। টাকা দেবার পর বাইরে এসে যখন খাই দাই-এর প্রসঙ্গ ওঠে, তখন প্রাণে ধরে এক পয়সার সব্জী কিনতেও চায় না সে। ছেলেকে ধমক দিয়ে বলে—আজকের মতো আচার দিয়ে রুটি খা! তারপর ছেলেকে ভজিয়ে রেসাইদারকে আর একে তাকে কিছু কিছু দর্শনী দিয়ে খুশি রাখে।

টাকা নিয়ে খুদাবক্স সহিসদের খাবার ছুটি দেয়। পরন্তপের শেখানো কায়দায় বাজার থেকে খাসী, মাছ, দুধ, ঘি, সব্জী কিনে কিনে ডালা সাজিয়ে রিসালাদার মেজর সাহেবকে ভেট লাগায়। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই ছাউনিতে বসে দুটো কথা কইবার সুবিধে মেলে। তারই জন্য অল্পস্বল্প গল্প করা যায় ফৌজের সঙ্গে। আবার কাছাকাছি গাঁ যাদের, তাদের চিঠিও কখন কখন পৌঁছে দেওয়া যায়।

হল্টের সম্মুখের শেরসাহী সড়ক বিশ্রাম জানে না। বাদশাহ শেরসাহ, যাঁর মতো শাসক দিল্লীর সিংহাসনে বসেনি, তাঁরই অক্ষয়

কীর্তি এই বিশাল সড়ক। গোটা উত্তর হিন্দুস্থানে আর তফাত রইল না। সব দেশে দেশে যোগাযোগের সেতু বাঁধল এই পথ। পাশাপাশি গাঁয়ের ঠাকুরসাহেব বা তালুকদার যখন কীর্তি অর্জন করতে চায়, এই পথের ধারে তারা গাছ বোনে, সরাইখানা বসায়, ইঁদারা খুঁড়ে দেয়, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে জলসত্র খোলে। তাপিতকে ছায়া দাও, তৃষ্ণার্তকে জল দাও, পরিশ্রান্তকে দাও রাতের মতো আশ্রয়। ধর্ম হবে, পুণ্য হবে, মুক্তি পাবে।

যেন কোন অতন্দ্র জাগর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে এই পথ। দিনরাত্রি চলাচলের বিরাম নেই। কোম্পানী বাহাদুরের ডাক আসে, ঘোড়ার পিঠে, গাড়ি করে, রানারের কাঁধে। কোন রেজিমেণ্ট কুচকাওয়াজ করে চলে। রিসালা রেজিমেণ্টের শত শত ঘোড়া, ইংরাজ অফিসারের ঘোড়া, ভারতীয় অফিসারের ঘোড়া, মালবাহী টাট্টু ও অশ্বতরের পিঠে তাঁবু, রসদ, পোষাক, উটের পিঠে আসবাব, অনেক মানুষ ও জন্তুর পায়ের শব্দে একটা জীবন্ত ঝড় চলেছে বলে বোধ হয়। কখনো ইংরেজ অফিসার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে চলেন। সাহেবদের সঙ্গে কোন কোন উৎসাহী মেমসাহেবও ঘোড়ার পিঠে চলেন। কখনো তাঁরা চলেন পাল্কিতে আর মেম সাহেবের আয়া, দাসী, ছেলেমেয়েদের আয়া, দাই, সাহেবের খানসামা, আবদার, খিদমতগার, বাবুর্চী, মশালচী, ধোবি, ইস্ত্রীওয়ালা দর্জী, ডোরিয়া, সর্দারবেয়ারা, মেটবেয়ারা, পাংখাবেয়ারা, মুর্গীওয়ালা, মালী, কুলী, কোচ্‌ম্যান, সহিস, ঘেসেড়া, ভিস্তি, বঢ়াই মিস্ত্রী, চৌকিদার, দারোয়ান, চাপরাশী, সবাই পেছনে পেছনে চলে সারি সারি গরুর গ[illegible]তে. যেন এক বিরাট মিছিল চলেছে। কখনো তীর্থযাত্রায় চলেন কোন রাণীসাহেবা। সারিসারি ঘোড়া আগে আগে চলে, পাল্কিতে চলেন রাজপরিবারের বধূ ও কন্যারা। পুরুষরা কখনো পাল্কিতে কখনো ঘোড়াতে চলেন। দাস, দাসী, আশ্রিত, পরিজন, গরুর গাড়ি, পাল্কি, ডুলি, সে যেন একখানা নগর চলেছে শোভাযাত্রা করে। কখনো আসে গ্রামের বিয়ের যাত্রীরা। লাল জামা কাপড়, পাগড়ীতে সাজানো বালক-বরকে সামনে নিয়ে বরের বাবা ঘোড়া বা উটের পিঠে বসে মিছরী ও মোরব্বা বিতরণ করতে করতে

চলেন। বাজনা বাজাতে বাজাতে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায়, আর পাল্কিতে বসে নথ ও হলুদরঙের কাপড় পরা বালিকা বধূ কাঁদতে থাকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। তাকে সান্ত্বনা দেয় বৃদ্ধা দাসী শ্বশুরবাড়ির গুণগান করে।

আবার কখনো মহাযাত্রার পথিকদেরও দেখা যায় এই সড়কে —রাম নাম সত্য হ্যায়—জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে। নদীতীরে দাহ করবার দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চায় না বলে দূর দূর গ্রাম থেকে ডোলা সাজিয়ে, লাল রেশমী কাপড়ে ঢেকে প্রিয়জনকে বয়ে আনে মানুষ। রাম নাম উচ্চারণ করে প্রতি পদক্ষেপে শুধু শ্মশানই নয়, স্বর্গকেও যেন কাছে টেনে আনে।

রাহী চলে, কিষাণ চলে, সাধু, সন্ন্যাসী ফকির, দরবেশ চলে, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সবাই চলে এই পথ দিয়ে।

বহু মানুষের পদচারণায় পথ হয়েছে তীর্থ। আর সেই তীর্থের এক পাশের চূণারকি হল্‌ট আস্তে আস্তে সকলেরই পরিচিত হয়ে ওঠে। কেউ বিশ্রাম করে, কেউ কিছু খাদ্য চায়, কেউ বা চায় অর্থ, আবার কেউ আসে নিছক গল্প করতে ও সময় কাটাবার জন্যে।

যখন কাজকর্ম থাকে না, তখন পরন্তপ আর খুদাবক্স মাঝে মাঝে চূণারকিতে মাছ ধরতে যায়। একটু এগিয়ে গেলে শিকারও মেলে। কিন্তু শিকারে খুদাবক্সের উৎসাহ আসে না। মাঝে মাঝে পরন্তপ বলে—কি খুদাবক্স, দিনগুলো ঝুলে যাচ্ছে বুঝি? একটু জোশ্ লাগিয়ে দেবো?

হৈ চৈ বাধাবার ক্ষমতা পরন্তপের অপরিসীম। রাস্তা থেকে একদল ভানুমতীর খেল্ যোগাড় করে। তখন সহিসরা কাছাকাছি গাঁয়ে খবর দেয়। তামাশা লাগবে হল্টের সামনে। খবর পেয়ে ভিড় জমে যায় চট্‌পট্। ভানুমতীর খেল্, বাঁশবাজী, ভাল্লুক নাচ বা মুরগীর লড়াই, সবতাতেই মাঝখানে বসে বিচারক হয় পরন্তপ আর খুদাবক্স। টাকা ইনাম দেয়, কখনো কাপড়ও দেয়, তারপর উদারভাবে মিষ্টি বিতরণ করে।

এইসব ব্যাপারে সবচেয়ে আগে ছুটে আসে লখিয়া। চূণারকির গয়লাদের মেয়ে সে। বিয়ে হয়েছে, স্বামী নেয়নি, এমনি কোন গোলমাল আছে। রঙ কালো, স্বাস্থ্য সুন্দর, বয়স বড়জোর

পনেরো হবে। গাঁয়ের অনেক ছেলেই লখিয়ার মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত। আর সেই মনোযোগ পেয়ে লখিয়াও খুব আত্মসচেতন।

পরন্তপ বলে—তুমি ওকে ঘায়েল করেছ খুদাবক্স।

খুদাবক্স হেসে উড়িয়ে দেয় পরন্তপের কথা।

ভোরবেলা গাছের ফল, সব্জী ডালায় করে হল্টে বেচতে আনতো লখিয়া। একবার মাছ ধরতে গিয়েছিল খুদাবক্স একা, তখন তাকে খুব সাহায্য করেছিল লখিয়া। কলকণ্ঠে গল্প করেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে মাছ বয়ে নিয়ে ফিরেছিল। পরদিন স্নান করতে গিয়ে খুদাবক্স অবাক হয়ে দেখে লখিয়া সেখানে বসে আছে। তাকে দেখে লখিয়া বলে—আজ মাছ ধরবেন না হুজুর? খুদাবক্স না বলাতে মনে হয়েছিল যেন আশাহত হলো লখিয়া। কিন্তু তারপর থেকেই তার আনাগোনা বেড়ে গেল হল্টে। কখনো মধু নিয়ে আসে, কখনো আনে পাকাকলা আবার কখনো বা এমনিই গল্প করতে আসে। ময়লা হলদে ঘাগ্‌রীটা বিছিয়ে বসে। বলে—কি করছ, এখানে একলা কেন থাক, তোমার ঘর আছে কি নেই, কখনো বলে—একটা কিস্‌সা শোনাও।

ক্রমে খুদাবক্সেরও সন্দেহ হলো। আরো সচেতন করল লখিয়ার ভাই দুখ্‌রী। মায়ের তিন ছেলে মরে গিয়ে সে হয়েছে, তাই তার নাম দুখ্‌রী। খুদাবক্সের খুব ভক্ত এই পনেরো ষোল বছরের কিশোরটি। সে বললো—খাঁ-সাহেব, লখিয়ার সঙ্গে আপনি কথা বলেন, তাতে মনে মনে কি মেনেছে লখিয়া কে জানে! তাকে শ্বশুরঘর থেকে নিতে আসবে শুনেই কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। আমার আর এক বহিন্‌কে বলেছে—ও গাঁয়ে গেলে আপনাকে দেখতে পাবে না, তাই সে যাবে না।

শুনে স্তম্ভিত হলো খুদাবক্স। পরন্তপ তো তাকে বকে বকে কিছু রাখল না। বললো—তুমি একটা পয়লা নম্বরের বুদ্ধু। আমার বুড়ো ঘোড়াটারও তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে।

খুদাবক্স বললো—একেবারে বাচ্চা মেয়ে, কি যে তুমি বলছ পরন্তপ!

পরন্তপ বললো—খুদাবক্স, তুমি নিশ্চয় কোন আঠারো বছরের ফাঁদে পড়েছ, তাই ওকে বলছ বাচ্চা মেয়ে গাঁয়ের মেয়ে,

পনেরো বছর বয়েস, সে হলো বাচ্চা? কোন শহরের মানুষ হে তুমি?

সত্যি কথা। খুদাবক্স মানল তার যুক্তি। পরদিন নিকটবর্তী গাঁ থেকে কাজ সেরে ফেরবার সময় দূর হতে দেখে পথের বাঁকে লখিয়া দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলো। তারপর কয়দিন একেবারে এড়িয়ে চলল লখিয়াকে। একবার বিন্দ্‌কীতে থেকে গেল দিন দশেক। এসে জানল লখিয়া শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। পরন্তপ বললো—খুব কেঁদে কেটে তবে গিয়েছে লখিয়া। শুনে দুঃখই হলো খুদাবক্সের। সেই নিতান্ত সরলা গ্রাম্য মেয়েটি তাকে নিশ্চয় মনে রাখবে না উত্তরকালে, তবু খুদাবক্স—অজানিতে হলেও তার মনোকষ্টের কারণ হয়েছে বলে নিজেকে সে অপরাধী মনে না করে পারল না।

একবার টিকমগড় থেকে অনেক টাকা নিয়ে এল পরন্তপ। গাঁয়ের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে ছেলেছোকরাদের মধ্যে খেলা লাগিয়ে দিলো। সাতদিন ধরে, আজ ভেড়ার লড়াই, কাল মুরগীর লড়াই, ঘোড়দৌড়, বর্শা, তীর আর ভাল্লার জোর, পাল্লাছুট, এইসব নিয়ে হৈ হৈ চললো। আর প্রবীণ বিচারকের মতো পরন্তপ জোয়ানদের, তলোয়ার, পাগড়ী, বর্শা, এইসব ইনাম দিলো।

এতে ইজ্জত আরো বেড়ে গেল রিসালা হন্টের। গাঁয়ের ছেলেদের সহযোগিতা মিলল। মাতব্বররাও খুদাবক্স আর পরন্তপকে নিজেদের লোক বলে মেনে নিলো। সাপে কামড়ালে কি করতে হবে, কার মেয়েটা গাঁয়ের ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, কৃপাদয়ালের গোঁড়ালেবুর গাছটা ইন্দ্র মিশির নিজ প্রয়োজনে কেটে ফেলতে পারে কিনা, কলিযুগ পূর্ণ হলে রামচন্দ্র আবার আসবেন কিনা, কালিয়া কাহারের মোষটা বিক্রি হবে কি রাখা উচিত, এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসাতেও প্রায়ই পরন্তপ মধ্যস্থ হয়। ছোট ছেলেমেয়েরাও নানারকম আরজি নিয়ে আসে। খুদাবক্সের মধ্যস্থতায় সুলতান ও রাজুর গত দশদিনের বিবাদ মিটে যায়। খরগোশের সঙ্গে কাকাতুয়া বিনিময় করে পরস্পরে আবার বন্ধুত্ব করে। ছয় বছরের সোনা ও সাত বছরের পঞ্চীর পুতুলের বিয়েতে পরন্তপ পুঁতির মালা এবং মিঠাই-এর

বন্দোবস্ত করে। ছোটদের প্রয়োজনে খুদাবক্সকে পাখী ধরবার ফাঁদ, ঘুড়ির লাটাই এবং তীরধনুক বানিয়ে দিতে হয়। ঘোড়াও চড়াতে হয়। একদিন দুপুরে খুদাবক্স দেখে—তিন বছরের লছমনকে পিঠে বসিয়ে পরন্তপ ঘোড়া হয়ে ঘুরছে। খুদাবক্সকে দেখে উঠে দাঁড়াল পরন্তপ। বললো—তিনদিন থেকে ঝামেলা লাগিয়েছে ভাই। তারপর দু'জনেই হেসে ফেলল।

বাইরের দুনিয়ার চলন ভিন্ন হলেও রিসালা হল্টের জীবন একটা নিজস্ব ছন্দে চলতে থাকে। ঘোড়াগুলোকে শেষরাত্রিতে ছুট করিয়ে আনে সহিসরা, নতুন কোন বেয়াড়া ঘোড়া এলে খুদাবক্স নিজে তাকে তালিম দেয়। ফৌজের ঘোড়ার দলাইমলাই করা, তাজা ঘাস আর দানা খাওয়ান, সমস্ত তত্ত্বাবধান করে খুদাবক্স। ভোর না হতেই শেরশাহী সড়ক ধরে তরি তরকারি আর শাক সব্জীর ঝুড়ি মাথায় বেপারীরা সব হাটে যায়। পরন্তপ তাদের ধরে ধরে কাঁচা বাজার সওদা করে। নিজেদের খাই-দাই ছাড়া উঠকো ব্যবসাদার অতিথিদের জন্য ভোজন ও বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছায়া লম্বা হয়ে বেঁকে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে চারপাইগুলো সব উঠোনে পড়ে যায়। ব্যবসাদার অতিথ মেহ্মানের আনাগোনা শুরু হয়। সরকারী ডাকপিওন, তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ, আবার কখনো কোন সাধু সন্ন্যাসী দূর থেকে রিসালা হল্টের দোতলা কুঠিটা দেখে সোজা চলে আসে। শালগাছের খুঁটির ওপর ঘর দু'খানাকে ইতিমধ্যেই পরন্তপ মেরামত আর রং করিয়েছে কারিগর ডেকে। অতিথিদের কেউ চায় পানীয় জল, কেউ চায় ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশ, আবার কেউ আসে নিছক প্রার্থী হয়ে।

একদিন এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যারাতে এল এক বুড়ো বাজিওয়ালা। সঙ্গে একটা ভাল্লুক, একজোড়া রামছাগল, আর একটি তরুণী। দুইদিন তারা সেখানে রইল। বৃদ্ধটির শরীর রোগে জীর্ণ, মেজাজ তিক্ত। মেয়েটি তাকে যে কত রকমে সেবাযত্ন করল। পাছে খুদাবক্সদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়, সেজন্য সে সর্বদাই হাত জোড় করেই থাকত। যাবার সময়ে তরুণী অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে

গেল। বলে গেল, এ আমার স্বামী। একসময়ে খুব শক্তি ছিল, ভালো খেলা জানতো। এখন একটু কমজোরী হয়ে পড়েছে। তাদের দেশ না কি কোথায় কোন দূরে, হায়দ্রাবাদ জিলাতে। দেশঘর ছেড়ে অনেক দূরে অন্য মানুষের মধ্যে, অন্য জায়গায়, একটি তরুণী তার বৃদ্ধ স্বামী, একটা ভাল্লুক ও একজোড়া ছাগল নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ছবিটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা খুদাবক্সকে স্পর্শ করেছিল।

প্রতি সন্ধ্যায় বাতি জ্বেলে চশমা নিয়ে বসে পরন্তপের চাকর প্রভুদয়াল সুস্বরে তুলসীদাস পাঠ করে—যবসে রামচন্দ্র রাজসুখ ছোড় গেই—

সেই সময়টা পরন্তপ খুব শ্রদ্ধা ভরে চুপ করে বসে থাকে! প্রভুদয়াল ভক্ত মানুষ। বলে—শুনছেন যখন চৌহানজী, হাতে তামা ও তুলসী নিয়ে বসুন। কিছু খেয়াল তো রাখুন। তার কথা শোনে পরন্তপ।

দিন চলে যায়। হৈমন্তিক-শস্যসম্পদ-রিক্ত পৃথিবীতে কখন বৈরাগী শীত আসে খুদাবক্স তার হিসাব রাখে না। শীতের পরে পুনর্বার বসন্তের সূচনায় ধীরে ধীরে মধ্যাহ্নের বাতাসে উদাস সুর লাগে, গাছগুলো সাজে নবকিশলয়ের ভূষণে। এমনি একদিনে মোতিকে দেখেছিল খুদাবক্স। সে কবেকার কথা! কতদিন আগের ঘটনা! তবু কাজের ফাঁকে যখনই সময় মেলে, তখনই সেই কথা, সেই গানই খুদাবক্স মনে মনে নাড়াচাড়া করে। একটি নামই ব্যথা ও আনন্দে অনুক্ষণ গুঞ্জরন করে ফিরে তার কানে কানে।

এমনি সময়ে একদিন সন্ধ্যা যখন তার কুয়াশার উত্তরীয় পরিহার করে, বসন্তের মধুর আবেশ গায়ে জড়িয়েছে, খুদাবক্স নিশ্চুপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। বটগাছের তলায় শিবলিঙ্গের সামনে ঘিয়ের প্রদীপটির এক ফোঁটা আলোর সাহায্যে হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন পথিক যেন ঘোড়ার পিঠে তারই ডেরার দিকে আসছে। কে হতে পারে? অস্পষ্ট হলেও তার মনে হলো যেন লোকটি তার একান্ত পরিচিত। বারান্দার নিচে এসে সে যখন দাঁড়ায় তখন তার সহিস প্রশ্ন করে—কি আরজি? খুদাবক্স আগন্তুককে বলতে শোনে—খুদাবক্স

খাঁ-সাহেবকে খবর দাও, ঝাঁসীর বাহ্‌রাম খাঁ তাঁকে মিলতে চান। দ্রুত নেমে আসে খুদাবক্স। বাহ্‌রামও ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে। দু'জনে সোল্লাসে দু'জনকে আলিঙ্গন করে।

খুদাবক্স অবাক হয়ে বলে—বাহ্‌রাম ভাই, আমার সন্ধান তুমি কেমন করে পেলে?

তারপর দুই বন্ধুতে পাশাপাশি বসে অনেক কথা হয়। তন্দুরী রুটি আর কাবাব দিয়ে খুদাবক্স বাহ্‌রামকে অভ্যর্থনা করে।

খেতে খেতে অনেক কথার পর বাহ্‌রাম বলে—তোমাকে ধরবার জন্যে কত খোঁজ করেছি জানো? খুঁজতে খুঁজতে শেষে টিকমগড়ে একদিন পরন্তপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। নিশানা করেই আসছি। অনেক কথা আছে দোস্ত। তবে পহেলা কথা হলো, ঝাঁসী চলে গিয়েছে অংরেজের হাতে। আরো কত কি যে হয়ে গেল খুদাবক্স তুমি তার কিছুই জানো না। খুদাবক্স বাহ্‌রামের সব কথা চুপ করে শোনে। বাহ্‌রাম আবার বলে—তুমি ভুল করেছ খুদাবক্স। সবচেয়ে বড় ভুল করেছ ঝাঁসী ছেড়ে চলে এসে।

এ প্রসঙ্গ তুলতে খুদাবক্স নারাজ। কিন্তু বাহ্‌রাম তার বারণ শোনে না। বলে—এ কথার প্রতিবাদ করে যদি তুমি চিরদিনের মতো সম্পর্ক কাটিয়ে দাও, তাতেও আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু আমার কথা আজ তোমাকে শুনতে হবেই। আরো বুঝবে তুমি ওস্তাদের খত পড়লে। এই নাও।

ঘোসের চিঠি! কম্পিত হাতে চিঠি খোলে খুদাবক্স। শিষ্টাচার করে তাকে সহস্র আশীর্বাদ জানিয়ে ঘোস লিখেছেন যে, খুদাবক্সের কাছে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। নিজেই তিনি আসতেন, কিন্তু বড় দুর্দিন আজ। বাঈসাহেবের অবস্থা শোচনীয়। নগরীর ওপরে দুঃখের ছায়া। কেল্লার ওপরে উড়ছে কোম্পানীর পতাকা। তাঁরই প্রাণাধিক প্রিয় কামানগুলি ইংরেজের সম্মানে গর্জন করছে—তাও তাঁকে শুনতে হচ্ছে; আরো শুনছেন যে, ইংরেজের মহারাণীর জন্মদিনে কেল্লা বাতি দিয়ে সাজাতে হবে। এইসব নানা বিপদ ও দুর্ঘটনার জন্য তিনি নিজে আসতে পারলেন না। কিন্তু খুদাবক্স কি একবার আসবে না? অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, আল্লার

বিধানের উপর টেক্কা দিতে গিয়ে তিনি তার ও আর একজনের জীবন বরবাদ করেছেন। আজ তিনি মনে করছেন, ভুল সংশোধন করবার সময় বয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁর মিনতি—

চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল খুদাবক্স। তারপর সযত্নে সেটাকে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিলো। বাহ্‌রাম বললো—সেদিন ওস্তাদের একান্ত অনুরোধেই তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে ঘা দিয়েছিল মোতি। কিন্তু তারপর তুমি যদি তাকে দেখতে খুদাবক্স! শুনেছি সেই থেকে কতদিন খায়নি, কারো কথা মানেনি, এমনকি কতদিন তানপুরা, ঘুঙুর একেবারে ছোঁয়নি, শুধু কেঁদেছে। আর তারপরে সে মানুষও একেবারে বদলে গিয়েছে॥ এমন বদলে গিয়েছে যে, চোখে না দেখলে তুমিও বিশ্বাস করবে না। এখন ভজনের পাঠ নেয় চন্দ্রভানজীর কাছে। বাঈসাহেবকে গান শোনায় কখনো কখনো। ওস্তাদের ওপরে আগে বড়ই রাগ করেছিল, কিন্তু এখন তাও মেনে নিয়েছে। ওস্তাদের সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হয়। শুধু তোমার কথা, তোমার ধ্যান নিয়েই বেঁচে আছে মোতি। তুমি এবার ফিরে চল খুদাবক্স।

খুদাবক্স ঘাড় নাড়ে। বলে—তা হয় না। পরন্তপ আমার ওপর হপ্ত ছেড়ে দিয়ে টিকমগড় গিয়েছে। দুই মাসের আগে সে ফিরবে না। কাজেই আমি এখন যেতে পারবো না। আর কি জানো, মনে হয় এত দিনই যখন কেটে গিয়েছে, অন্যরকম হয়ে গিয়েছে হালচাল, তখন একেবারে ভাঙা জলসায় গিয়ে যদি দাঁড়াই, তবেই কি আবার বাতি জ্বলে উঠবে, গাওনা শুরু হয়ে যাবে? আর ধরো যদি প্রাণমনেও চাই বাহ্‌রাম, তাহলেই কি আগেকার মতো সব হবে?

বাহ্‌রাম মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানায় খুদাবক্সের কথার। বলে—কেন হবে না খুদাবক্স? সব হবে। নইলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে আসতাম না।

খুদাবক্স বলে—বেশ, ওস্তাদকে আমি খত লিখে দেবো। আর তুমিও এই খবর পৌঁছে দেবে যে, আমিও কম অপরাধ করিনি। কষ্ট দিয়েছি, কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এখনো আমি তৈরি হইনি বাহ্‌রাম। জেনো সময় হলেই আমি উপস্থিত হবো।

বাহ্‌রাম বলে—সব হবে খুদাবক্স, আরও ভালো করে হবে। সব ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। তুমি বিশ্বাস করো।

খুদাবক্স শুধু একটু করুণ হাসে। কিছু বলে না।

বাহ্‌রাম আবার বলে—কালই আমাকে যেতে হবে খুদাবক্স। আমাদের তো চাকরি চলে গেল। বাট্টা, ভাতা, সব নাকি দুই মাসের করে হাতে হাতে মিলবে। ঝাঁসীতে এখন ফৌজ আসবে বাইরে থেকে। হল্টে তো আছ, ফৌজী ছাউনির কিছু খবরাখবর রাখো ?

—কি খবর ?

—কি রকম দেখছ ? ওখানে তো আমরা হরদম শুনতে পাই, এদিকে ওদিকে ফৌজ নাকি কোম্পানীর ওপর খুশি থাকছে না।

—কে জানে ভাই। কত খবর উড়ে আসে, দেখবে সব সত্যি নয়।

—না, সত্যি হতেও তো পারে। কারণ আমরা মৌ, সাগর, আগ্রা, অনেক জায়গার খবর পাই। শুনি নানারকম গোলমাল চলেছে ছাউনিতে। কিছু যদি না ঘটবে তো এত কথাই বা রটবে কেন ?

খুদাবক্স জবাব দেয় না। বলে—তুমি এবার আরাম করো বাহ্‌রাম। আমি ততক্ষণ ওস্তাদকে খত লিখি।

কম্বল টেনে আরাম করে শুয়ে শিয়রের জানলাটা খুলে দেয় বাহ্‌রাম। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসে। বাহ্‌রাম বলে—এইরকম একটা ডেরা পেলেই আমি বিয়ে করি। বৌ ওখানে বসে রান্না করে আর আমি তার সঙ্গে গল্প করি। বাড়ির সামনে মাচা বেঁধে একটা জুঁইফুলের গাছ উঠিয়ে দিই।

—পরমেশ্বর আহীরও এইরকম কথা বলতো।

—আরে ভাই সবাই এই রকম কথাই বলবে, দিলদার মানুষ হলেই বলবে। আর অন্য কথা কি আছে বলো ?

—তাও ঠিক।

বাহ্‌রাম ঘুমিয়ে পড়লে পরে খুদাবক্স কাগজ কলম হাতে নেয়। প্রথমে ঘোসের কাছে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারপর লেখে

—কারো ওপর আর তার কোন অভিযোগ নেই। তার জীবনে যা যা ঘটেছে, সব কিছুর জন্যে কেউ দায়ী নন। এই কথা রাগ করে সে বলছে না, এ তার অন্তরের কথা। ঘোস সে কথা নিশ্চয় বুঝবেন।

কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে খুদাবক্সের গোপন অন্তরে যে দুঃখ ঘুমিয়ে ছিল তাই আবার জেগে উঠল। খুদাবক্স বুঝল যে, সে-জখম তার তখনও আরাম হয়নি।

খুদাবক্স খানিক থেমে আবার লেখে—কেন সে এখন যেতে পারবে না তার আপাত কারণগুলো ঘোস বাহ্‌রামের মুখ থেকেই শুনতে পাবেন। ঘোস যেন সেই দুখিয়ারীকে শুধু জানিয়ে দেন যে, খুদাবক্স তার ধ্যানে এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে এতদিনে একটু মাটি পেয়েছে। পেয়ে একটু দম নিচ্ছে। তাই এখনই সে যেতে চায় না। আরো যেতে চায় না এই জন্যে যে, তার এখনো সময় হয়নি। সময় হয়েছে বুঝতে পারলেই সে চলে আসবে। দুর্লভ সৌভাগ্য লাভের সুকৃতি তার ছিল না, তাই হয়তো ভালো বুঝেই ভাগ্য তাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ে। এখন সে বোঝে, সেই একজন যেমন করে নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ছে, তেমনি খুদাবক্সও সেই কাজেই ব্যস্ত আছে। একই আশাকে সে সযত্নে লালন করছে মনের গোপনে, নতুন করে নতুন আসরে তাকে বরণ করবে বলে। এইসব কথা ঘোস তাকে বললে সে নিশ্চয়ই বুঝবে। আর সে বুঝেছে জানলে খুদাবক্সও শান্তি পাবে।

চিঠিটা শেষ করে খুদাবক্স সযত্নে ভাঁজ করে। কাপড়ের থলির ভেতর বন্ধ করে মুখে গালা দিয়ে মোহর করে।

বাহ্‌রাম ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে। পাশের ঘরে গিয়ে খুদাবক্সও শুয়ে পড়ে। মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসে। সেই বাতাসে স্বপ্নচারিণী হয়ে আসে মোতির প্রেম, আর ভেসে আসে তার সেই গান—কৈসে বীতাউঁ দিন রাতিয়া—হে প্রিয় তুমি যদি চিঠি না পাঠালে, তবে কেমন করে আমি দিন আর রাত কাটাবো। সেও তো তাই ভেবেছিল। কিন্তু আশ্চর্য তবু কেমন করে কতদিন কেটে গেল! নসীব

বড় খেলাই খেললো খুদাবক্সের সঙ্গে। ছয় মাস আগে হলে হয়তো খুদাবক্স এখনি চলে যেতো। কিন্তু বারবার ভালোবাসতে গিয়ে সে বারবার কেবলই হারাল। আর সব দিক থেকে যখন সব বাঁধন খসে পড়ল তার, তখন আবার নতুন করে বাঁধন জড়াতে যেন ভয় হয়। মনে হয়, সময় হয়নি। মনে হয়, একবার তো দেখলাম লোভীর মতো দুই হাতে ধরে, অন্ধের মতো বুকের কাছে রেখে। তাতেও তো চলে আসতে হলো। হৃদয় ভেঙে-চুরে খানখান হয়ে গেল। এখন তাই বিশ্রাম নিচ্ছে খুদাবক্স। আবার যাবে, কিন্তু তখন আর সময় বৃথা বইয়ে দেবে না। একটু দেরী হচ্ছে, হোক। তাতে কোন ক্ষতি নেই। কোথা থেকে যেন প্রত্যয় এসেছে মনে—কোন ক্ষতি হবে না।

ক্ষমা করবার কথা ভেবো না মোতি। তুমি তো জানো তোমার ওপর আমার কোন অভিমান থাকতে পারে না। এ কথা আজ এখন যেমন বুঝছি, আগে তেমন বুঝিনি। অভিমান হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু সে দিন তো পেছনে রেখে এসেছি। আমার মনে তুমি আর ভিন্ন হয়ে নেই মোতি, একেবারে এক হয়ে গিয়েছ। একদিন তোমার প্রেম আমাকে আঘাত করেছিল, আর ঘর ছাড়িয়ে দিওয়ানা করেছিল। মোতি, তাই আমার চারপাশের দুনিয়াটা আজ এত বড় হয়ে গিয়েছে। এখন মনে হয়, অনেক বড় আমার ঘর, আমার আপন মানুষও অনেকজন। আমি ছিলাম কিষাণ আর তুমি ছিলে নটী, দুই দুনিয়া ছিল আমার আর তোমার। ভাবতাম প্রেম দিয়ে সেতু বাঁধবো। তাহলে তোমার আমার মাঝখানে আর কোনও ব্যবধান থাকবে না। কিন্তু আঘাত দিয়ে আজ আমাকে তুমিই প্রেমিক করেছ আর অনেক বেশি ভালোবাসতে শিখিয়েছ তোমাকে। আজ এক বিশাল ঘরে আমি বাস করি, এক মস্ত আঙিনায় তোমার পথ চেয়ে থাকি।

এই আকাশ তোমার আমার চন্দ্রাতপ। এই বাতাসে তোমার সৌরভ পাচ্ছি। তুমি বিশ্বাস করো। তোমার পায়ের ঘুঙুরের শব্দে আমার কান ভরে আছে।

তুমি শুনিয়েছিলে, বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দ্‌লালা। আমার হৃদয়ে তুমি সেই প্রেমই এনে দিয়েছ।

জানি এই প্রতীক্ষা কষ্টকর। তবু অপেক্ষা করবো মোতি। তোমার চাওয়া আর আমার চাওয়ায় যেদিন একাকার হয়ে যাবে সেদিন জেনো আর কোন অন্তরালই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না।

চৌ দ্দ

সর্বত্র জটলা চলে—ঝাঁসী নাকি পরহস্তগত হয়ে গিয়েছে। দুঃসংবাদ পেয়ে স্পর্ধিত উক্তি করেছিলেন রানী, কিন্তু সেই উক্তির মর্যাদা রক্ষা হলো কোথায়! এখন একটা মস্ত তোলপাড় চলেছে। বুঝি রদ-বদলের পালা এবার।

নাট্যশালা গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে। দৃশ্যপট, ঝাড়লণ্ঠন, পোষাকের পেটি, বাজনা, কুর্সি, গালিচা টানাপাখা, চিকণের পর্দা, সব ফর্দ ধরে মিলিয়ে জড়ো করা হচ্ছে। গরুর গাড়ি বোঝাই করে সব প্রাসাদে যাবে। বন্ধ থাকবে একটা ঘরে। তারপরে সেই ঘরে তালা দিয়ে শীলমোহর করে দেওয়া হবে। নাট্যশালা, অতিথিশালা, ধর্মশালা, মন্দির, চতুষ্পাঠি, মক্তব, পিঁজরা পোল, অন্নসত্র, গ্রন্থাগার, যা যা রাজসরকারের ব্যয়ে প্রতিপালিত হতো সব কিছুর স্থায়িত্বই অনিশ্চিত হয়ে গেল। নতুন মালিক রাজী না হলে সব বন্ধ করে দিতেই হবে। তখন ধুলো পড়বে ঘরগুলোতে, মানুষ বাধ্য হয়ে বিদায় নেবে। তারপর সবাই আস্তে আস্তে সরে যাবে শহর থেকে। রাজারাজড়াদের অকারণ ব্যয়-বাহুল্য এখন আর প্রশ্রয় দেবেন না কোম্পানীরাজ।

রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কিছু দেশীয় কারিগর নানা শিল্প গড়ে তুলেছিলেন। পিতল, তামা ও রূপার বাসন, গালিচা, আতর, আর কাঠের আসবাব নির্মাণের খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছিল এখানে ওখানে। কারিগররা স্বতঃই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। বেন্টিঙ্ক সাহেব ও শ্লীম্যান সাহেবের প্রশংসাপত্র কতজনকে দেখিয়েছেন গালিচা শিল্পীরা, আর বলেছেন—কি সব সাহেব ছিল! শ্লীম্যান সাহেব

চারপাই-এ বসে তামাক খেয়ে গিয়েছে আমার ঠাকুর্দার হাতের কাজ দেখে। সে সব দিন কি আর আসবে? কিন্তু এবার কি হবে কারবারের! কে কিনবে এইসব জিনিষ! এই গালিচায় পা রাখবে কে, হাতীর দাঁত ও রূপোতে কারুকাজ করা আয়নায় মুখ যদি না দেখল কেউ, তবে কী হবে তার! হাজার হাজার টাকা দিয়ে কে কিনবে এই সব সৌখীন জিনিষ?

গায়ক, বাদ্যকর, অভিনেতা, চিত্রকর, পণ্ডিত, গুণীজনের প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখতো রাজ-দরবার। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল সব বড় বড় প্রতিভার বিকাশ। তাঁদের জন্য অবারিত দ্বার ছিল রাজসভায়। আজ সে-দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল!

দরবারের কর্মচারী ও সৈনিকরা কেল্লাতে চলেছে হিসেব বুঝিয়ে দিতে। তাদের ছুটি হয়ে যাচ্ছে। আর তাদের প্রয়োজন হবে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি আশ্রয়কেই তারা ঘরবাড়ি বলে জেনে ছিল। আজ হঠাৎ নতুন করে ঘর খোঁজবার কথা ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে সকলেই। কোম্পানী সরকার ছুটি দিয়ে দিলে, বলে দিলে ঘরে চলে যাও। সেখানেই তো সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কার ঘর কোথায়? কারো পূর্বপুরুষ একদা এখানে এসেছিল প্রথম বাজিরাও-এর আমলে মাতৃভূমি মহারাষ্ট্র পরিত্যাগ করে। তারপর ধীরে ধীরে সাতারা, রত্নগিরি, পুণা, সাগর, বিঠুর, কোঙ্কন, —কত জায়গা থেকে কতজনই না এসেছিল! কোম্পানীর শাসনের প্রথম আমলে সেদিনও এমনি করেই ছুটি মিলেছিল তাদের। তারপর এখানেই এসেছিল তারা শেষ মরাঠা রাজ্যের আশ্রয়ে। এতদিন পরে আজ আবার এখানেও টালমাটাল। তাই সবার মলিন মুখ, বিভ্রান্ত চাহনি—পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গিয়েছে।

ভিখাজীনানার নেতৃত্বে লড়েছিল যারা, শ্লীম্যান সাহেবের সঙ্গে ঠগীর বিরুদ্ধে লড়েছিল যারা, ভূমিয়াওয়াতী রাজপুত সামন্তদের অভ্যুত্থান দমনে প্রাণ বিপন্ন করেছিল যারা, বণিকরাজ তাদের আজ শুধু রজত মূল্য দিয়েই সম্পর্কের পূর্ণচ্ছেদ টানছে। আজ তারা উর্দি ও অস্ত্র জমা দিয়ে কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে শহর ছেড়ে চলে

যাচ্ছে। পথে রানীমহালের দিকে তাকিয়ে তারা সেলাম জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রানীমহালের জানলা বন্ধ। জানলার একটি শার্সিও খোলা নেই আজ।

•

নিজের শয়নকক্ষে বসে ছিল মোতি। সামনে বসে কথা বলছেন ঘোস। রাজ্য পরদেশীর হাতে চলে গিয়েছে। ঘটনার আকস্মিক আঘাতে যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছেন ঘোস। ক্লান্তি আর চিন্তার রেখা পড়েছে মুখে। চামড়ার খাপে ঢাকা তরবারি কোলের ওপর রেখে তিনি পরম স্নেহে মোতিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন, বাবাসাহেব তাকে অনেক টাকা আর জমি দিয়ে গিয়েছেন।

মোতি বললে—শুনেছি। আমাকেও এ সংবাদ জানিয়ে গিয়েছে দরবার থেকে।

—তোমার তো আর কোন ভাবনা রইল না বেটি, জীবন তোমার কেটে যাবে ভালোই।

উত্তরে মোতি একটু হাসে। বলে—টাকা দিয়ে আমি কি করবো বলুন? একটা তো জীবন, ও ঠিক কেটে যাবে।

আজ অবশ্য ঘোসের ওপর বিদ্বেষ ভাব নেই মোতির। যেদিন থেকে মোতি বুঝলে, ঘোসও খুদাবক্সকে ভালোবাসেন, সেদিন থেকেই নেই। আজ সে বুঝেছে এক জায়গায় তারা দু'জনেই এক। তাই তাদের দু'জনের মধ্যে একটা নীরব বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছে। একটি প্রসঙ্গের সূত্রেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ। অথচ খুদাবক্সের নামোল্লেখ নেই কারো কথায়। কেননা ঐ একটা জায়গায় দু'জনেরই আঘাত লাগে।

আর এই যে মোতির প্রসাধনে বৈরাগ্য, তার জীবনযাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধনা, তার ব্যবহারে ধৈর্যশীলা রমণীর মতো প্রগলভতাবর্জিত মাধুর্য, এ-ও ঘোসকে মুগ্ধ না করে পারেনি। সঙ্গে সঙ্গে মোতিও শ্রদ্ধা করেছে এই দরদী হৃদয় প্রবীণ সৈনিককে।

মোতির কথা শুনে ঘোস বললেন—হ্যাঁ, তোমার নিজের জন্যে ভেবো না বেটি, সে ভাবনা আমার। কিন্তু এই অর্থ দিয়ে তুমি এখন কি করতে চাও?

নম্র অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে মোতি বললো—আপনি আমার পিতার মতো। তাই আপনাকে বলি, আমার বড় ইচ্ছা যে, ঐ টাকা দিয়ে একটি মসজিদ তৈরি হোক আর তার সঙ্গেই একটা মুসাফিরখানা। বাকি অর্থ যা থাকবে তা আপনার উপদেশ মতো কারো কাছে আমি গচ্ছিত রাখবো। তার থেকে কিছু কিছু দান ধ্যান করতে পেলেই আমি সুখী থাকবো। আমার এই বাড়ি আমি চন্দ্রভানজীকে নিতে অনুরোধ করেছি। ইচ্ছা হলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন। আমি আর একটি ছোট বাড়ি নিয়ে চলে যাবো। চন্দ্রভানজী বলেছেন, তাহলে নাট্যশালার পুরনো সঙ্গতীয়ারা এই বাড়ি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি তো জানেন, তাদের যাবার আর কোন জায়গা নেই।

অভিভূত হয়ে যান ঘোস। বলেন—সব ছেড়ে দেবে মোতি? সব দিয়ে দেবে? জানি তুমি বুঝে শুনেই বলছ, তবু মনে হয় যদি কষ্ট পাও, কোন মুস্কিল হয়—

নিঃসঙ্কোচ কণ্ঠে মোতি বলে—তখন আপনাকে জানাবো। তারপর আবার বলে—আপনি তো জানেন, আমি বড় দুর্বল। শুধু চেষ্টা করি যাতে আর কোন অন্যায় না হয়, কেহ বেদনা না পায়। কত কম দিনের মামলা বলুন,—তবু তো ভুল করি, অজানতে গুণাহ্ হয়ে যায়।

মোতির কণ্ঠে কোন অভিযোগ নেই। শুধু আছে তাপসী সাধিকার ব্যাকুলতা। কাউকে আঘাত দিতে চায় না সে। কত কমদিনের জীবন! অভিভূত ঘোস তাকে আশীর্বাদ করেন অন্তরে। তারপর বিদায় গ্রহণ করেন। পথ চলতে চলতে ভাবেন, এত সহজ করে, এমন সবিনয়ে, এত দামী কথা কি করে বললো মোতি! আজও কি তাকে ক্ষমা করেনি সে!

ঘোস বিদায় নিলে মোতি বাতি জ্বালে ঘরে। তানপুরায় মৃদুমৃদু ঝঙ্কার দেয়। বলে—হে শ্যাম, আমার সাধনা নেই, তাই কি তোমাকে পেলাম না? যদি হতাম বনের রাখাল, তাহলে গোচারণের আনন্দের মধ্যে তোমার শৈশবকে পেতাম, কোয়েল হলে তোমার প্রেমিক সত্তার বন্দনা গাইতাম, যোগীয়া হলে

ভিক্ষা করে নিতাম তোমার আশীর্বাদ। আমার যে কোন সুকৃতিই নেই।

সাধিকা রাজকুলবধূর অন্তরের আকুলতাকে নন্দিত করে মোতির কণ্ঠ। অগ্নিশিখার মতো সুন্দর অনামিকায় জ্বলজ্বল করে প্রবালের একটি অঙ্গুরীয়। অযত্ন কবরীবদ্ধ-কেশ শুভ্র গ্রীবার ওপর এসে পড়েছে। মৃদু আলোতে এই স্বপ্নময় পরিবেশে মনে হয় মোতি যেন নিজেই রূপান্তরিত হয়েছে গানে। এমনই কোমল, সুন্দর ও অপার্থিব এক রূপ ফুটে ওঠে তার মধ্যে। বিন্দু বিন্দু অশ্রুতে আঁখিপল্লব চিক্‌মিক্ করে ওঠে।

সন্ধ্যা সমাসন্ন। তবু আলো জ্বলেনি আজ দরবার কক্ষে। আসাবরদাররা কাষ্ঠপুত্তলির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ তাদের কোন কর্ম-ব্যস্ততা নেই।

প্রায়ান্ধকার বিশাল দরবার গৃহে দাঁড়িয়ে বাঈসাহেবের প্রতীক্ষা করেন ঘোস। আর তাঁর মন অনুসরণ করে ফেরে বিশ বছর আগের ঘটনাবলী। মনে পড়ে কতদিন কত কারণে এই ঘরে জাঁকজমকে দরবার বসেছে। ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি কতবার অভিবাদন করেছেন রাজাকে। অদূরে মসলিনের পর্দার অন্তরালে রাজসিংহাসন, আবছা চোখে পড়ে। শূন্য সেই আসন। তবু ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মনে হয় যেন ঐখানেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন শোকাতুরা রাজলক্ষ্মী, আর তাঁর কান্নার রেশ ঘরময় ভেসে বেড়াচ্ছে। নির্জন দরবার কক্ষে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চকিত হয়ে ওঠেন ঘোস। মনে হলো যেন কে এসে দাঁড়িয়েছেন পর্দার ওপারে। যেন কার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পড়েছে তাঁর ওপরে! তাঁর শুভ্রচন্দেরীর থান মহারাষ্ট্রীয় ঢং-এ দেহ বেষ্টন করে কাঁধ ছাড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর তাঁর তর্জনীতেও যেন অনুশাসনের বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে।

পরমুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে এল ঘোসের। ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম জানালেন বাঈসাহেবাকে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে স্বীকৃতি এল—গুলাম ঘোস, আপনি দেখা করতে চেয়েছেন?

—জী সরকার।

—আমি তো আর সরকার নই!

—আমার আর কোন সরকার নেই বাঈসাহেবা।

রাণীর কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন অতি কষ্টে আবেগ সংবরণ করলেন তিনি। তবু ভারী হয়ে এল কণ্ঠস্বর। বললেন—সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কিছুই তো হলো না খাঁ-সাহেব!

চুপ করে রইলেন ঘোস। তারপর ভগ্নকণ্ঠে বললেন—সরকার, যা হলো তা আমার মতো সামান্য মানুষের বুদ্ধির অগম্য। সবাই বলছে আমার ছুটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার ছুটি কেমন করে হবে সরকার? আপনি মালিক, আমার সরকার, আপনি তো আমাকে ছুটি দেননি। তাই আমার কথা পেশ করি, এই শমসের নিয়ে আমাকে ছুটি দিয়ে দিন। একদিন এই ঘরে দাঁড়িয়ে পুণ্যস্মৃতি শিবরাও ভাও এই তরবারি···

অনুভূতির আবেগতরঙ্গে ডুবে গেল ভাষা। ঘোসের স্মরণে এল অতীত দিনের কথা: যখন তিনি তরুণ যুবক এবং মৃতরাজা কেবল মাত্র বালক। উত্তরাধিকারের জটিল সমস্যার ঘূর্ণিপাকে সকলে ব্যস্ত। তখন সেই পিতৃমাতৃহীন বালককে তিনিই সঙ্গ দিয়েছিলেন, সাঁতার কাটতে ও বন্দুক ধরতে শিখিয়েছিলেন। তারপর যবনিকার ওপারে দণ্ডায়মান বিধবা রাণী যেদিন প্রথম বধূ হয়ে এলেন, সেদিন তাঁর পাল্কির পাশে পাশে ঘোড়া চড়ে তিনিও এসেছিলেন। বিবাহের দিন তাঁরই সম্মানে তিনিই কামান গর্জনের হুকুম দিয়েছিলেন। বহু স্মৃতি-বিজড়িত এই রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ তো একদিনে ছিন্ন হবার নয়!

রাণীরও স্মরণে এল: এই প্রৌঢ় পাঠানের সম্পর্কে কত প্রীতির উক্তি শুনেছেন স্বামীর কাছে। যখন তিনি বালিকা ছিলেন, তখন ঘোসকে কতবার দেখেছেন কেল্লায় শিবপূজা দিতে গিয়ে। এক একটা কামানের নাম ডেকে তাতে অগ্নিসঞ্চার করতেন ঘোস আর গম্ভীর গর্জন করে সে প্রণতি জানাতো। বুঝলেন এইরকম বিশ্বস্ত অনুচররাই তাঁর দুঃখের দিনগুলির একমাত্র ভরসা। তাদের ওপরই নির্ভর করছে রাজপরিবারের শুভাশুভ।

তিনি বললেন—খাঁ-সাহেব আপনি আপনার তরবারি গ্রহণ

করুন। আপনাকে ছুটি দেবার সময় আজও আসেনি। ঈশ্বর করুন যেন কোনদিন না আসে সেই দুঃসময়।

অভিভূত হয়ে ঘোস অভিবাদন জানালেন।

রাণী পুনর্বার বললেন—আপনার দেশ কোথায় খাঁ-সাহেব?

ঘোস করজোড়ে জানালেন, ঝাঁসী ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছা তাঁর নেই। আর কোন ঘরের ঠিকানাও তিনি জানেন না।

দু'জনেই চুপ করে রইলেন। বড় মর্মস্পর্শী সেই নীরবতা। আসাবরদাররা আলো নিয়ে এল। পিতলের আধারের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিলো। চোখ নামালেন ঘোস। তারপর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাণী পিছন ফিরতেই ঘোসের মনে হলো যেন সেই ক্ষীণ আলোকে তিনি রাণীর চোখে জল দেখতে পেলেন। সত্যিই চোখের জল, না কি তাঁরই বিভ্রম?

বেঁকে ভেঙে গেল কপালের রেখা। চোখ দুটো অজস্র কাঁটায় কর কর করে উঠল পাঠান অধিনায়কের।

চন্দ্রভানের কাছে হৃদয় উজাড় করে সব কথা নিবেদন করল মোতি। চন্দ্রভান আশীর্বাদ জানালেন। তারপর বললেন—তোমাকে দেখে দেখে আমার মনও বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি তীর্থযাত্রায় যাবো স্থির করেছি।

—আমি কোন অপরাধ করেছি গুরুজী?

—তুমি নিরপরাধ মোতি। আমি নিজেই বোধ করছি আমার মন আজও স্থির হয়নি। বয়স অনেক হয়ে গিয়েছে মোতি, আর হয়তো সময় পাবো না। তাই ঠিক করেছি চলে যাবো। প্রথমে মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রয়াগ আর গয়াজী ভ্রমণ করবো। তারপরে চলে যাবো হরিদ্বার।

কোন খেয়ালীর খেয়ালে পৃথিবীতে এমন বেহিসেবী কাজ হয় তা জানে না মোতি। বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও আবার কোন্ জিজ্ঞাসা নতুন করে জাগে মানবচিত্তে, যার জন্য মনে হয় গতজীবনটাই অসম্পূর্ণ আর তাকে পূর্ণ করতে হবে বলে বেরিয়ে পড়তে হবে অজানার সন্ধানে!

বারংবার আকুতি জানায়—প্যালা মুঝে ভর ভর দে—তবু পেয়ালা ভরে না। যে তৃষ্ণা সেই তৃষ্ণাই থেকে যায়!

সেদিন চন্দ্রভান অনেক কথাই বললেন মোতিকে, যে কথা পরে কতবার তার স্মৃতির বীণাতে মন্ত্রের মতো ঝঙ্কৃত হয়েছে। তিনি বললেন—জীবনে আমার সবই অতৃপ্ত মনে করো না। আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষকে দেখবার সুযোগ মিলেছে আমার। আর তাই মানুষকে আমি বড় ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি মোতি। তওয়ায়েফ্ ঘরে আমি এমন দিল্ওয়ারীর পরিচয় পেয়েছি যার স্মরণ মাত্রে হৃদয় ভরে যায়। কাশীর রৌশন, লক্ষ্মৌ-এর গুলাব, তাদের কথা যখনই মনে হয় তখনই মাথা আমার নিচু হয়ে যায়। আজ তারা এই পৃথিবীতে নেই। কিন্তু প্রথম যৌবনের মস্তিতে যে-মাথা উঁচু করে আমি তাদের অবহেলা করেছি, আজ সেই মাথাই নিচু করে আমি তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তুমি আমার মেয়ের মতন। তা ছাড়া বড় শৌখ করে তোমাকে গান শিখিয়েছি। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, সুবিধা মতো তোমাকে কাশী, আগ্রা ও গোয়ালিয়ারে নিয়ে যাবো। আরও ভালো ভালো গান শোনাবো। আমার সে আশা অপূর্ণ ই রয়ে গেল। কিন্তু তবু আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সারাটা জীবন তুমি সঙ্গীত চর্চা নিয়েই থাকো।

মুদিত কমলকলি যেমন আনত হয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি গ্রহণ করে, তেমনি বিনম্র চিত্তে মোতি গুরুর কথা শোনে। চন্দ্রভান পুনরায় বললেন—সব ইচ্ছা যে আমার মনের মতন হয়ে পূর্ণ হবে, সে-ও হয়তো আমার অহংকার। তবে যেটুকু পাই সেটুকুই আমার কাছে সত্যি, আর যা ঘটে তারও নিশ্চয় কোন কারণ আছে! কাজেই আমার আর কোন অভিযোগ নেই।

পুষ্পার্ঘ্য দানের মতো নত ।শরে মোতি তার আপন কথা নিবেদন করে। বলে—গুরুজী, আমি তো না-লায়েক। আপনার অধীন। আপনি যা-ই বলবেন, আমি মানবো তাতে আপনার মেহেরবানী আর সখাওত্ আছে।

—হ্যাঁ মোতি, সে কথা ঠিক। কিন্তু আজ এই দিনে আমার তোমার কথা তুঁলে রাখো। একটা গান শুনাও।

—হুকুম করুন গুরুজী। কিন্তু—

—কি মোতি?

—এক কথা পেশ করবো?

—বলো।

—আপনার মন যদি চায় তো সেই আশাওরি শুনতে কামনা করি। আজ থেকে ষোল বছর আগে দিল্লীতে বিশ্বেশ্বর মিশ্র খেয়ালীয়ার ঘরে যে গান আপনি শুনিয়েছিলেন।

—সেই গানের কথা এখনও তোমার স্মরণে আছে! চন্দ্রভানের কণ্ঠে বিষাদ মিশ্রিত বিস্ময়। চোখের দৃষ্টি উধাও হয়ে যায় তাঁর কোন বিস্মরণের দিগন্তে। যেখানে চন্দ্রভান ফেলে এসেছেন তাঁর কুসুমিত দিনগুলি। স্মৃতিতে সেই সৌরভই খুঁজে পান তিনি। সেদিন যদি বা বোধ হয়ে থাকে, ভ্রমরের সঙ্গে গোলাপের হৃদয়ের কারবারের মাঝখানে কাঁটার বাধা আছে, আজ আর কোন কাঁটার কথাই স্মরণে আসে না তাঁর। স্মৃতির প্রলেপে মনে হয় সবই সুরভিত, সবই সুন্দর। তারপর বলেন—সে কি আজকের কথা!

দু'জনেরই স্মরণে আসে সব্জিমণ্ডির পেছনে সরু গলি পথের শেষে সেই নিচু দোতলা পাথরের বাড়ি। বাড়ির একতলায় নিঃসন্তান মিশ্রজীর ভক্তিমতী স্ত্রীর পূজার জন্যে ছিল ছোট্ট একটি শিবমন্দির। দোতলায় মিশ্রজীর সঙ্গীতের আসর বসতো পুবমুখো ঘরে। ঘরে সাদা চাদরের ফরাশ। কোণে চৌকিতে সাজপোষে ঢাকা জোড়া তম্বুরা, আলমারিতে সারি সারি তবলা। পাশে রবাব, সুরশৃঙ্গার, সেতার, দিলরুবা, এস্রাজ, পাখাওজ ও করতাল। আসরের মাঝখানে রূপোর থালাতে জল সিঞ্চনে সুরভিত জুঁইফুলের গোড়ে মালা। চন্দন ধূপের মৃদু গন্ধ ভেসে আসতো সেই ঘরে শিবমন্দির থেকে। মনে পড়ে রাজস্থান থেকে বহু মূল্যে সংগৃহীত পটাবলীতে সজ্জিত সেই প্রাচীর। শুধু তো খেয়ালীয়া ছিলেন না বিশ্বেশ্বর মিশ্র। বিশিষ্ট রাজোয়াড়া ঘরের দেওয়ান বংশীয় এই সুপুরুষ কলাবিদের মধ্যে শিল্পরস ঢেলে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। প্রভূত অর্থ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সেই অর্থের সদ্ব্যবহার। চন্দ্রভানের মনে পড়ে মিশ্রজীর অনুরোধে তিনি

পায়ের নিচে আর মাটি নেই। একেবারে ফাঁকা বাতাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। কার কান্নার শব্দ যেন কানে বাজ্‌ছে?

পরন্তপ কাঁদছে। একটু বিস্ময়ে চেয়ে দেখলো মোতি। শোক করছে পরন্তপ! কিন্তু সে তো কাঁদতে পারছে না? সে তো ভেঙে পড়তে পারছে না! তা হলে কি তার আরো কাজ বাকি আছে? হ্যাঁ-আরো একটা কাজ বাকি আছে বৈকি। ঘৌসকে তো খবর দিতে হবে। ঘৌস রয়েছেন ঘনগর্জ-এর কাছে। দিশেহারা পা ফেলে এগিয়ে চললো মোতি। কিন্তু ঘনগর্জ্‌ নীরব কেন? কেন কোন কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে না? একেবারে বোবা কেন কেল্লাটা? কাকে জিজ্ঞাসা করবে সে? দৌড়ে চললো মোতি। ভয়ঙ্কর কোন শঙ্কা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তার মনে। এই নীরবতা তার অসহ্য লাগছে।

—ঘনগর্জ নীরব কেন? তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না রঘুনাথ সিং রিসালদার। কাঁদতে লাগলেন বালকের মতো। চওড়া কাঁধ দুটো কাঁপতে লাগল তাঁর। তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে পুনর্বার প্রশ্ন করলো মোতি—ঘনগর্জ নীরব কেন?

রঘুনাথজীর আকুল ক্রন্দনে তার জবাব মিললো। চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের ভিত্‌ টলে গিয়েছে। ঘনগর্জের গর্জন চিরদিনের মতো নীরব হয়ে গিয়েছে। আর গর্জন করবে না ঘনগর্জ। অতর্কিতে গোলা লেগে খতম হয়ে গিয়েছেন ওস্তাদ গোলাম ঘৌস খাঁ।

মোতির পায়ের তলার মাটি ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল। একি হলো? তবে সে কোথায় যাবে? কি করবে?

ঘনগর্জ-এর পাশে বসেছিলেন রাণী। রক্তবর্ণ পতাকায় আচ্ছাদিত ঘৌসের দেহ। ঘৌসের মাথা কোল থেকে নামিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কুর্তার পকেটে দুই হাত রেখে এগিয়ে গেলেন। প্রাচীরে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর অনুচরবৃন্দ, সংগ্রামী যোদ্ধা নরনারী।

—আপ রোঁ রহীঁ হ্যায়ঁ সরকার? বড় বিস্মিত হলো মোতি। কাঁদছেন রাণী? রঘুনাথ, দিলীপ, জবাহির, পরবার রাজপুত

বংশের দুর্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃন্দ, আজ তাঁরা কাঁদছেন? বাহ্‌রাম গুল-মুহাম্মদ, খুদাদাদ, বিশ্বস্ত সৈনিক সব—তাঁরাও কাঁদছেন? চুপ করে আছে সবাই? এমনি করে কি শোক করে? যোদ্ধার শোক প্রকাশের ভাষা কি এই অশ্রুজল?

ভুল করছে এরা! এরা বধির, এরা অন্ধ। মোতি যা দেখতে পাচ্ছে, এরা তা দেখছে না কেন? কেন এরা শুনছে না মোতি যা শুনতে পাচ্ছে? মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে নির্দেশ, পূষণ্ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে পন্থা, তবু তো কেউ এগিয়ে আসছে না? কি মহামূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে তাও কি এরা বুঝবে না?

তুমি আমাকে কি বলছ খুদাবক্স? এই রকম করে কি তোমার জন্য শোক জানাবো? তাই কি তুমি চাও? তাতেই কি তোমার মৃত্যুর মর্যাদা হবে?—

—কভি নহীঁ মোতি।

—ওস্তাদ গুলাম ঘৌস খাঁ, আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তো হৃদয়ের কোন্ অতল গভীরে দৃঢ়বন্ধনে বাঁধা—বলুন, আপনার কাছে যে ঋণ, তা কি অশ্রুজলেই শোধ দেবো?

—কভি নহীঁ বেটি।

এগিয়ে গেল মোতি। স্পষ্ট কণ্ঠে বললো—আপনারা পেছনে যান। ঘৌস খাঁ তো কামানের আওয়াজ ছাড়া অন্য জবান্ শেখাননি। তাঁর জবান্ দিয়েই তাঁকে সেলাম জানাতে হবে। কেউ এগিয়ে আসুন।

কশাঘাতে ফিরে এল চেতনা। এগিয়ে এলেন শুভ্র কেশ বৃদ্ধ কিশোর সিং পরবার। বারুদ ও গোলা তুলে দিলেন। গর্জন করে উঠলো ঘনগর্জ। গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করলো যে সে পরাজয় স্বীকার করেনি।

স্তম্ভিত হলো প্রতিপক্ষ। রজনী প্রথম যাম। শত্রুপক্ষকে আজ অন্তিম চোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

তবু কেমন করে আসে জবাব? তারাও কামানের পাল্লা ঠিক করলো।

কাঁপতে থাকে আকাশ। আঁধার ছিঁড়ে অগ্নিপিণ্ডের মতো

গোলা এসে পড়ে কেল্লায়। অশ্রুহীন চোখে লড়তে থাকে মোতি। এই তো ভালো হলো খুদাবক্স। এতদিনে আমি তোমার খুব কাছে এলাম। আর কোন দূরত্বই রইল না।

. ইংরেজের গোলা এসে ফেটে পড়ে। স্থির সঙ্কল্পের অগ্নিশিখা হয়ে লড়ে মোতি। কাপু টেক্‌রীর উপর তৈরি নূতন ইংরেজ ব্যাটারী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কি বিশাল তোমার প্রেম খুদাবক্স, কত প্রেম দিলে তুমি। এখন তো তুমি আমার পাশে আছ, আমার মধ্যে আছ, আমাকে ঘিরে আছ, বলছ আমাকে লড়াই চালিয়ে যেতে—তবে আর কিসের আফসোস বলো ?

ইংরেজের গোলা এসে পড়ে ঘনগর্জ-এর সামনেই—ভীমগর্জন ও প্রখর আলোতে প্রলয় রচনা করে। হাহাকার ওঠে পেছনের সৈনিকদের মধ্যে। সর্বনাশ ঘটেছে মনে করে উৎফুল্ল ইংরেজ গোলন্দাজ পুনর্বার গোলা তুলে নেয়।

আলো, আলো আর আলো—। কি জ্যোতির্ময় এই আলোর বন্যা। এত আলো কোথায় ছিল ? এই আলোর মন্ত্রে তুমি আর তুমি রইলে না খুদাবক্স, আমার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলে। একাকার হয়ে গেলে !

দিনের আলোর মতো প্রখর আলো উদ্ভাসিত করে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো, তার ধোঁয়া কমতে তবে দেখা গেল মোতিকে—রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কয়জন মিলে ধরাধরি করে এনে ফাঁকা জায়গায় শুইয়ে দিলো।

মনে হলো কোনও কথা বলতে চাইছে মোতি—থরথর করে কাঁপছে ওষ্ঠ। ঝুঁকে পড়লো বাহ্‌রাম। বললো—মোতি।

—খুদাবক্স !

—মোতি !

—খুদাবক্স !

—হ্যাঁ মোতি, জরুর—

তখন প্রায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো মোতি। সকলের মুখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার চোখ ফিরে এল। চোখ বন্ধ করলো মোতি। এক মৃত্যুঞ্জয়ী হাসির রেখা ফুটলো মুখে—সে হাসি বড় মধুর। বললো—আঈ···।

মোতি! মোতি! মোতি! বাহ্‌রাম ডাকলো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। সাড়া মিললো না।

চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাহ্‌রাম।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। পাশাপাশি সমাধি খনন করলো বন্ধু সৈনিকগণ। রাণীর আদেশে মহাল থেকে বহুমূল্য রেশমের আস্তরণ এল, ফুল এল, আতর এল। তারপর সন্তর্পণ শ্রদ্ধায় বহন করে আনা হলো দুটি কাফন।

লাল রেশমের আস্তরণে মুড়ে তরবারি ও পাশখুব সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হলো।

সমাধি ঘিরে নগ্নমস্তক অবনত করে দাঁড়ালেন পরন্তপ, বাহ্‌রাম, রঘুনাথ, জবাহির, কিশোর, গুলমুহাম্মদ—সবাই। নীরব অশ্রুমোচনে নিবেদন করলেন শ্রদ্ধা। বন্ধু সৈনিকদের শোকার্ত হৃদয়ের অনুভূতিই হলো মহাযাত্রার পথে খুদাবক্স ও মোতির শেষ পাথেয়। সেই পাথেয় নিয়েই তারা চলে গেল।

সেই মহান্‌ মুহূর্তে বন্ধু সৈনিকদের মনে উদ্ভাসিত হলো এক চরম উপলব্ধি—মৃত্যুরও মরণ আছে। প্রেম যে কত অজেয় তাই প্রমাণ করে দিয়ে গেল খুদাবক্স আর মোতি। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন মানুষ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে—আর মানুষের সেই নিরন্তর সংগ্রামকে পরাজিত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হবে মৃত্যু। মানুষের অপরিসীম প্রেমে জন্ম নেবে নতুন দিন, নতুন ইতিহাস, আর পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দরতরো।

অশ্রু মুছে ফেললো বন্ধুরা। নতজানু হয়ে বসলো বাহ্‌রাম ও পরন্তপ। মুঠো মুঠো মাটি তুলে নিলো।

মাটির ওপর পড়তে লাগল মাটি। পূর্ণ হলো সমাধি।

নক্ষত্রখচিত আকাশ, মাঝরাতের উত্তাল বাতাস, অশ্রুত কোন মহান সঙ্গীতে জানালো তাদের শেষ প্রণতি। পরম মমতায় তা গ্রহণ করলো মৃত্তিকা।

তম্বুরা গ্রহণ করেছেন, উতরি রেখাবে আশাওরির মুহ্‌রা কায়েম করেছেন ললিত কণ্ঠে, নিখুঁত সুরে, অপূর্ব কারিগরীতে।

কঁহা বৈসে মন যাঁহা তুহারি চরণ,

গানের কথাগুলি নব নব মুহ্‌রা বিস্তার ও বিরতির তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল মুঠো মুঠো ফেণার ফুলের মতো শ্রবণের বেলাভূমিতে। তারপর বিস্তারে বিস্তারে তিনি সৃজন করলেন আশাওরি সুরের একটি জোয়ার। সময়ের বোধ হারিয়ে গেল, শুধু অনুভূতি জেগে রইল পরম আগ্রহে। সেদিন সেই আশাওরি যেন প্রকৃতই স্বর্গনিঃসৃত সুরতরঙ্গিনীর পবিত্রধারা বইয়ে দিয়েছিল।

সুরের পূজায় সার্থক সেই সুন্দর প্রভাতের পবিত্র স্মৃতি চন্দ্রভানের চোখে অশ্রু এনে দিলো। বললেন—আজ এতদিন পরে সেই গানের ইয়াদ্‌গারী জাগিয়ে দিলে তুমি বেটি! ভাগ্যবান মিশ্রজী কবে চলে গিয়েছেন পরপারে, আর আমি পড়ে আছি স্মৃতির বোঝা নিয়ে। আ-হা-হা, কী সব দিন চলে গেল! সে-দিন আর কি আসবে?

স্মৃতিসিক্ত ব্যথিত হৃদয়ে মোতি বলে—গুরুজী, আপনার সেই জর্দা মুরেঠাও আমার স্মরণে আসে। আপনার গান শুনে আমার মনে কি ভাব এসেছিল তা তো ভুলতে পারি না। বড় যত্ন করে রেখেছি সেই স্মৃতি। যখন মনে দুঃখ আসে, তখন সেই সব কথা স্মরণ করি। গুরুজী, আপনার মতো সমঝদার লোক তো চিরদিন কায়েম থাকবেন না, তখন আমাদের মতো না-লায়েক মানুষ আপনার নামওয়ারি জাহির করবে আর কোন্ জমানা চিরতরে হারিয়ে গেল সেই কথা বলে হায় হায় করবে।

চন্দ্রভান সস্নেহ দৃষ্টিতে মোতিকে মুবারক করলেন বলে বোধ হলো। তারপর বললেন—আজ তবে গান থাক মোতি। কোনদিন সময় আসে তো শোনাবো। তুমি শুধু এক ভজন শোনাও।

গুরুর ইচ্ছা মাত্রেই যেন পুরস্কৃত হলো মোতি। তম্বুরা কোলে নিয়ে বসল। কবীরের ভজনে নিবেদন করল তার শ্রদ্ধা—

'কৈসে দিন বীতি ম্যয় বাত্‌ ন বাতায়ো—।'

ভক্ত হৃদয়ের একান্ত আকুতির মধুর সুরে মুগ্ধ হলো শুক্লকেশ শ্রোতার বিদায়ী মন।

গান সমাপনে চন্দ্রভান স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আজ বিদায়ের প্রাক্কালে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই মোতি। সেটা তোমার কাছে থাকলে আমি ধন্য মানবো।

পরম শ্রদ্ধায় আশীর্বাদ গ্রহণ করল মোতি। একটি মুক্তার চন্দ্রটিকা। রাজস্থানের রাজোয়াড়া ঘরের মেয়েরা সিঁথিতে এই গহনা ধারণ করেন। মোতি বললো—এ যে বহুমূল্য গহনা গুরুজী?

পুনর্বার বেদনা মধুর হাসলেন চন্দ্রভান। বললেন—তোমার চেয়ে নয়।

চন্দ্রটিকা গ্রহণ করে তাঁকে প্রণাম জানাল মোতি।

আজ এই বিদায়ক্ষণে জাতি ও বর্ণের কথা যেন মনে রইল না চন্দ্রভানের। কম্পিত হাত তার মাথায় রেখে সস্নেহ আশীর্বাদ জানালেন। বললেন—জানো মোতি, গুরু কখনো শিষ্যকে শেখায় আবার শিষ্যও কখনো গুরু হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বয়সের বিচার করলে চলে না বেটি। তাই মনে করে নাও, আমিই তোমাকে দক্ষিণা দিচ্ছি।

—গুরুজী!

পুনর্বার প্রণাম করতে যাচ্ছিল মোতি। তাকে তুলে ধরলেন চন্দ্রভান। বললেন—সুখী হও, সার্থক হও, বিশ্বাস রাখো, দুঃখের দিন কেটে যাবে।

চন্দ্রভান বিদায় গ্রহণ করবার পর বহুক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে রইল মোতি। ঋজুদেহ, শুক্লকেশ, শুভ্রবেশ গুরুজী'র সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যায় যেন বিদায় নিয়ে গেল মোতির জীবন থেকে। মোতি জানে আর তার পুনরাবৃত্তি হবে না।

মোতির স্মরণে এল পুরানো দিনের সব কথা। মনে পড়ল তার দুঃখ দেখে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে গুরুজী তার কাছে একদিন তাঁরই জীবনের এক লুপ্ত অধ্যায়ের ইতিহাস বিবৃত করেছিলেন। সেদিন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মোতি। শৈশব থেকে সে

গুরুজীকে দেখেছে—স্বল্পভাষী, গম্ভীর ও ঈষৎ গর্বিত। তারপর বড় হয়েছে মোতি, কিন্তু আচারে ব্যবহারে মেলামেশায়, একটা দূরত্ব চিরদিনই রেখে চলেছেন চন্দ্রভান। মোতিও কোনদিন সে সীমানা লঙ্ঘন করেনি। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যখন চন্দ্রভান তার কাছে তাঁর অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃত করেছিলেন তখন তাঁর ব্যবহারে কোন দূরত্ব ছিল না। বয়সের ব্যবধানের কথাও যেন মনে ছিল না তাঁর। নিজের জীবনের কথা বলে বন্ধুর মতোই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন চন্দ্রভান। অবাক হয়ে শুনেছিল মোতি। চন্দ্রভানের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা সরে গিয়েছিল এক বিস্মৃত যুগের ওপর থেকে। সে পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা :

তখন চন্দ্রভান সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। কোন এক রাজোয়াড়া মেত্রী ঘরের একজন উত্তরাধিকারী তিনি। সঙ্গীত শিক্ষার নেশা পেয়ে বসেছিল তাঁকে কৈশোরেই। রামপুরের মুস্তাক হামিদ আহ্‌মদের শিষ্য হলেন তিনি। রাজোয়াড়া ঘরের ছেলে হয়ে চন্দ্রভান যে সঙ্গীতকে নেশার থেকে পেশায় তুলে নিলেন তাতে বড় আনন্দ পেয়েছিলেন সেই বৃদ্ধ ওস্তাদজী। একবার পান্নার দরবারে কুঁয়ার সাহেবকে গান শেখাবার আমন্ত্রণ এল তাঁর কাছে। সেই সূত্রেই তিনিই চন্দ্রভানকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন।

কুঁয়ার সাহেবের গদিতে বসার উপলক্ষ্যে তাঁর সম্মানে একদিন এক জলসার আয়োজন হয়েছিল। কুঁয়ার সাহেবের বৈমাত্রেয় বোন দময়ন্তী। দময়ন্তীর রূপের খ্যাতি ছিল আশপাশের দরবারে। সেই জলসাতেই প্রথম দময়ন্তীকে দেখেন চন্দ্রভান!

তারপর?

তারপর জলমহলের চবুতরায় দময়ন্তীর সঙ্গে যেদিন তাঁর নিভৃতে পরিচয় হলো? প্রথম পরিচয়ের সেই রোমাঞ্চ? শরীরের শিরায় শিরায় সেই প্রথম মিলনের আবেগ-সঞ্চার…

কিন্তু পরে বুঝেছিলেন চন্দ্রভান সে-পরিচয় সেদিন না হলেই বুঝি ভালো হোত! কারণ শেষপর্যন্ত অগ্নি আর পতঙ্গের সেই চিরন্তন খেলায় চন্দ্রভানের বুঝি ছিল কেবল পতঙ্গেরই ভূমিকা! তাই দময়ন্তীর প্রেম তাঁকে স্নিগ্ধ করলো না, তৃপ্তি দিলো না, শুধু

পিপাসা আর জ্বালাই বাড়িয়ে দিল। দিনের পর দিন চন্দ্রভান শুধু নিজেকে আহুতিই দিয়ে গেলেন সেই মদির-যৌবনার রূপের আগুনে। তিনি নিঃস্ব হলেন, ক্ষত-বিক্ষত হলেন—তবু এতটুকু উন্মনা হলো না দময়ন্তী। তার স্বভাব ছিল অধিকার-লোলুপ, প্রভুত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার রক্তে রক্তে; তাই চন্দ্রভানের জীবনের সেই প্রথম প্রেম সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েই ফিরে এল।

চন্দ্রভান অনেক অনুনয় করেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন—তুমি আমার সঙ্গে চল দময়ন্তী—আমরা কোথাও চলে যাই—

দময়ন্তী উত্তরে শুধু হেসেছিল। সে হাসিতে তাচ্ছিল্যও লুকোনো ছিল বোধ হয়। বলেছিল—আমি বেওকুফ নই, চন্দ্রভান, তোমার সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে আমার জওয়ানী বরবাদ করতে রাজী নই—

চন্দ্রভান অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি তোমার জওয়ানী বরবাদ করে দেব? বলছো কি তুমি?

দময়ন্তী হেসেছিল আবার। বলেছিল—তুমি যে আমার ভার নেবে, তোমার আছে কী?

চন্দ্রভান বলেছিলেন—কেন, আমার গান আছে—

দময়ন্তী বলেছিলো—তোমার গান তোমার থাক, তোমার গানের লোভে আমি আমার আখের নষ্ট করবো তা মনে করো না।

চন্দ্রভান চলে আসবার আগে শুধু বলেছিলেন—এই কি তোমার শেষ কথা দময়ন্তী?

দময়ন্তী বলেছিল—আমাকে আর প্রশ্ন করো না চন্দ্রভান—

চন্দ্রভান তবুও বুঝতে পারেন নি। বোধহয় একটু ক্ষীণ আশা ছিল তখনও। বলেছিলেন—কেন?

দময়ন্তী বলেছিল—তুমি ফিরে যাও চন্দ্রভান—ও-কথার উত্তর আমি দেবো না—

চন্দ্রভানজী শেষ পর্যন্ত ফিরেই এসেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসবার আগে শুধু বলে এসেছিলেন—আজ আমি ফিরেই যাচ্ছি দময়ন্তী, কিন্তু মনে রেখো আর কখনও ডাকলেও তোমার কাছে ফিরে আসবো না—

সেই শেষ। ভেবেছিলেন হয়ত দময়ন্তী তাঁকে একদিন ডেকে

পাঠাবে। হয়ত দময়ন্তী তার ভুল একদিন বুঝতে পারবে। সেই আশাতেই তিনি উদগ্রীব হয়ে কতদিন প্রতীক্ষাও করলেন। কিন্তু না, দময়ন্তী ডাকেনি তাঁকে আর। দময়ন্তীর মত মেয়েরা হয়ত শুধু প্রেম নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না! তারা চায় আশ্বাস, তারা চায় আশ্রয়, তারা চায় নির্ভরতা—সে কি চন্দ্রভানজী তাকে দিতে পারতেন? কিন্তু তার প্রমাণ দেবার তার পরীক্ষা দেবার সুযোগও তো তাঁকে দিলো না দময়ন্তী! সে-ও কি চন্দ্রভানজীর কম দুঃখ!

এই মুক্তার চন্দ্রটিকা! এ তিনি একদা কত কষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন দময়ন্তীকে দেবেন বলে। কিন্তু সে সুযোগ তাঁর আর মিললো না।

তারপর থেকে বাঁধন ছেঁড়া নৌকার মতো এখানে সেখানে উদ্দেশ্যহীন ও বেপরোয়াভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটালেন চন্দ্রভান। এলোমেলো আর ছন্নছাড়া হয়ে গেল জীবনটা। কাশীর রৌশন তাঁকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। বাঁধতে চেয়েছিল তাঁকে প্রেম ও বিশ্বাস দিয়ে। কিন্তু আবার নতুন করে মায়া জড়াবার সাহস ছিল না চন্দ্রভানের। তাই তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এতদিন এ-চন্দ্রটিকা কোথায় কোন পেটির কোণায় অবহেলিত হয়ে পড়েছিল কে জানে, আজ বিদায়কালে মোতিকে দিয়ে গেলেন তিনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুরুজী'র উদ্দেশ্যে পুনর্বার প্রণতি জানাল মোতি। পুব থেকে পশ্চিমে না এলে যেমন সূর্যের আবর্তন সম্পূর্ণ হয় না, তেমনই এক একটা মানুষের জীবনেও পূর্ণতা আসবার জন্য বুঝি যোগ্য লগ্নের প্রয়োজন হয়। তার গুরুজী'র জীবনের সূর্য তো পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে। তাই সন্ধ্যার লগ্নেই প্রস্তুত হতে হবে। তারপরে যে গভীর অজানা অন্ধকারে তরী ভাসাতে হবে তার জন্য চাই মানসিক প্রস্তুতি। সম্ভবতঃ সেই তাগিদই অনুভব করেছেন চন্দ্রভান, তাই চলে গেলেন তিনি। এই চরম লগ্নে আর কোন লুকোচুরি খেলবার সময় নেই। সমুদয় গ্লানির বোঝা সরিয়ে বিশুদ্ধ নিরহঙ্কার চিত্তে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়াতে এসেছিলেন শুধু নিজেকে নিয়ে। আজ আবার

জীবনের নাটে হাসি কান্নার খেলা শোধ বোধ করে দিয়ে সেই নিজেকেই টেনে নিয়ে চলে যেতে হবে। দেহ জরাজীর্ণ হয়েছে হোক, মন তো শুদ্ধ হওয়া চাই।

মোতি বুঝল সেই আখেরী এত্তেলা পৌঁছে গিয়েছে আজ। তাই বুঝি এমন করে চলে গেলেন চন্দ্রভান।

গুরুজী'র যদি সময় হয়ে গিয়ে থাকে তো মোতিরও কী সময় হয়নি? সেদিন ঘোসকে কি কি বলেছিল, মোতি স্মরণ করল। তাহলে আর দেরি করে কি হবে? এমনিতেই তো কত সময় বয়ে গিয়েছে! যৌবনের খরস্রোতে পাখামেলে কত দিন, কত রাত, কত প্রহর বয়ে গিয়েছে। মনে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার রক্তকণিকায় ঝড় তুলে চলেছে। যে সব গ্রন্থিতে বাঁধা ছিল তার জীবন, তারা একটি একটি করে আপনা থেকেই খসে পড়ে তাকে মুক্তি দিয়ে গেল। রাজাসাহেব গেলেন, গুরুজীও চললেন। তারপরে সেও চলে যেতে পারতো, কিন্তু আর একজন? সে তো স্বেচ্ছায় যায়নি, মোতিই তাকে জোর করে গৃহছাড়া করেছে। সেইজন্যেই তার যাবার হুকুম নেই। সে অনুমতি না দিলে তো মোতি যেতে পারে না।

তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই যেন তার জীবনের ব্রত উদযাপনের অন্তরায়। তাই যদি হয় তো সেই বাধাকে মোতি বিদায় দিতে পারবে অতি সহজে। কত অল্পদিন, তবু জীবনের বাসনা কামনা সবই যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। তার ঘরের কাঠের বড় বড় পালঙ্ক, টেবিল, আয়না, ঝাড়, দেয়ালগিরি, আলনা, দোলনা, ঘরে ঘরে কত গালিচা, পর্দা, দামী বিছানা, কুর্সিতে কুর্সিতে গদী, হরিণ, ময়ুর, পায়রা, শুকসারী—সবাই তিলে তিলে তাকে নানা বাঁধনে জড়িয়েছিল! আজ সেই সবই অবহেলে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল মোতি।

জুহী তিরস্কার করল। বললো—একেবারে যোগিয়া তো নও তুমি?

স্মিতহাস্যে নিরুত্তর রইল মোতি। না, সে যোগিনী নয়। তার সঙ্গীত সাধনার ঘর রইল আগের মতন, আর থাকল জীবন

ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় কয়টি আসবাব। বললো—যোগিয়া হতে চাইলেই কি পারব জুহী? আমার সে সুকৃতি কোথায়!

পেটিতে পেটিতে ছিল কত পোষাক! চন্দেরী, কিংখাব, মস্‌লিন, চিকণ ও বেনারসীর ঘাগ্‌রা, গাঢ়ারা, চোলি, আঙিয়া, ওড়নী, শালওয়ার ও কুর্তা। এক এক পোষাকের সঙ্গে এক একদিনের স্মৃতি বিজড়িত। ছাড়তে চাইলেই কি ছাড়া যায়? ঘননীল ঘাগ্‌রী, সোনালী ওড়নী ও লাল চোলি, এই সব ছিল তার রাধিকার বেশে নাচবার পোষাক। এই পোষাকেই তাকে প্রথম দেখে মুগ্ধ হয়েছিল খুদাবক্স। না, না, প্রথম নয়—চাঁপাফুল রঙের এই রেশমের পেশোয়াজ, আঙিয়া আর ওড়নীতেই সেই প্রভাতের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হাল্কা নরম সবুজ চন্দেরীর সর্বাঙ্গে গোয়ালিয়র ও চন্দেরীর কারিগরের সূঁচে উৎকীর্ণ সব জরির ময়ূর। এই শাড়ি পরেছে মোতি বনবাসিনী শকুন্তলা সেজে। মনে পড়ে একবার আগ্রা থেকে আনিয়ে একখানা আস্‌লামা চিকণ তাকে ইনাম করেছিলেন রাজাসাহেব। তা দিয়ে সে একটি গাঢ়ারা ও কুর্তা বানিয়েছিল। কর্পূরে সুবাসিত এই সেই শুভ্র পোষাক। কখনো রাজার হুকুমে মহলে গান শোনাবার সময়ে মোতি তার নিজের দেশীয় শালওয়ার বা গাঢ়ারা পরেছে। তখন তার চেয়ে বেশি জাঁকজমক করবার রেওয়াজও ছিল না।

হাতির দাঁতের পেটিতে আছে মুক্তোর কণ্ঠি, চুণী ও সোনার ঝুলান্‌দা, ঝাপ্‌টা, বাঁশ্‌লী ও কোমরের নায়ের। পায়ের জিঞ্জিরা আছে কত ছাঁদের। তা ছাড়া তুলোর আবরণে ঢাকা বহুমূল্য জুঁই, চামেলী, গোলাপ ও খস্‌-এর আতর। কতরকম সুর্মা, কতরঙের টিপ, কত ছাঁদের চুলের গহনা, কাশ্মীরের রূপোর গহনা, রাজস্থানের রূপা ও পিতলের গহনাও আছে কিছু। আর ঐ সাদা পাথরের তাজমহল আঁকা বাক্সে রয়েছে সাঁচ্চাজরির আটদশ জোড়া নাগরা।

শুধু আহরণ করেছে, সংগ্রহ করেছে, ভাণ্ডার ভরেছে সঞ্চয়ে! অথচ বিলাসের শৃঙ্খলেও বাঁধা পড়ল না মন!

গহনার বাক্স সীল মোহর করে ঘোসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলো

মোতি। আসবাব পত্র বিলিয়ে দিয়ে, একান্ত স্মৃতি-সিঞ্চিত পোষাক কয়টি রাখল শুধু। তওয়ায়েফ নাচের বহুমূল্য পেশোয়াজ, ওড়নী, ঘাগ্‌রী, বেনারসী, সব দান করল সখীদের। অযাচিত দান পেয়ে তাকে আশীর্বাদ জানিয়ে গেল কত কাঙালী ও ভিখারী।

ভারমুক্ত হতে পারলেই তার এবং দয়িতের মধ্যে ব্যবধান ঘুচবে, এই বিশ্বাস করে মোতি। মনে প্রাণে সাধনা করে এক চিত্তে। গানে গানে বলে—

'পিয়া মোহি' আরত তেরী হো,
আরত তেরে নামকি মোহি' সাঁঝ সবেরী—

'হে প্রিয় আমার জীবন তোমার আরতি। তোমার নামের আরতি আমার জীবনে সকাল সন্ধ্যা হোক—' মীরার ভজন গাইতে গিয়ে আবার কখনও মনে মনে প্রিয় আগমনের পদধ্বনি শোনে। মত্তদাত্বরী ডাকে, পাপিয়ার বোল্‌ কানে আসে। কখনো বলে, তোমার কারণে সব সুখ ছাড়লাম, তবু কেন আমাকে তৃষিত করো, হে প্রভু! ফুলের মতোই মোতির চরিত্রের বিকশিত সৌরভে মোহিত হয় তার পরিচিতজন।

এমনি সময় একদিন দরজায় ঘা পড়ল। দূত এসেছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। এত্তেলা আছে স্কীন সাহেবের পেস্কারের। ছাউনিতে তয়ফানাচের এক আসর ডেকেছেন বড়সাহেব। অনেকদিন কোন গান বাজনার আসর হয়নি। রমজানী তয়ফাদের নাচ অনেক দেখেছেন সাহেব। মোতির নাম শুনেই তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন। পঞ্চাশ টাকা মুজরা। বিকালে যেতে হবে।

পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনে মোতি অপমানে জ্বলে উঠল। বৈরাগ্যের সাধনায় ব্যস্ত থাকল এতদিন তবু ক্ষমা এল না, এল না সহিষ্ণুতা। দর্পিতা ফণিনীর মতো জবাব দিলো—ম্যয় নহী' যাউঙ্গী। বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ দূত বললো—লেকিন্‌ ইয়ে ছাউনিকা এত্তেলা হ্যায়!

—তাতে কি হয়েছে? তুমি নিশ্চয় অন্য দেশের মানুষ, তাই আমাকে বলতে সাহস করেছ। তুমি যাও, তোমার সাহেবকে বলো, আমি মুজরা ফিরিয়ে দিয়েছি।

—তওয়ায়েফ—!

—হাঁ্যা জরুর, মগর ম্যয়ঁ তুম্‌হারা সরকারকা তওয়ায়েফ নহী হুঁ, ন ম্যয়ঁ কিসিকা অধিন্।

দূত চলে গেল ছাউনিতে। সাধারণ এক নর্তকীর এতো স্পর্ধা! শুনে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন ক্যাপ্টেন স্কীন। ডেকে পাঠালেন কেল্লার খাজাঞ্চি জ্বালানাথ পণ্ডিতকে। কানে কলম গুঁজে রূপোর চশমা আঁটতে আঁটতে ছুটে এলেন পণ্ডিতজী। সব শুনে করজোড়ে নিবেদন করলেন,—এ কথা সত্যি যে, মোতি সাধারণ তওয়ায়েফ নয়, রাজা তাকে সাধারণ নাচওয়ালীর মতো রাখেননি। তাকে কখনো সহরে যেখানে-সেখানে জলসায় মুজরা গ্রহণ করতেও দেখা যায়নি।

—তার জীবিকা অর্জনের প্রশ্ন নেই? টাকার দরকার নেই?

—সে কথার জবাব আমার কাছে নেই সরকার, কিন্তু এও আমি জানি যে, এই সেদিন সে কয়েকহাজার টাকার জিনিষ খয়রাত্‌-জকাত্‌ করেছে, আর এ-ও জানি যে, সে নিজের বাড়িতেই বাস করে—যার দামও খুব কম হবে না সাহেব।

শুনে আশ্চর্য হলেন স্কীন। চুপ করে গেলেন। বুঝলেন, এই সামান্য প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু এ-খবর মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ল শহরে। মোতি ফৌজের এত্তেলা ফিরিয়ে দিয়েছে, সাহেবের দূতকে বড় তেজের সঙ্গে জবাব দিয়েছে। এই কথা নিয়ে নিচুগলায় জোর আলোচনা চলে। আর কি জানি কেমন করে এ খবর পৌঁছে গেল রাণীমহালে। শুনে ঈষৎ কৌতূহলী হলেন রাণী। মোতির গান শুনেছেন বলে মনে পড়ে, আর এ-ও স্মরণ হয় যে, বড় রূপসী সেই নর্তকী। রাজা তাকে খুবই স্নেহ করতেন। অর্থ ও ভূমি, বাস করবার বাড়ি সবই দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কী কারণে সে এমন দর্পিত আচরণ করলো, কোথা থেকে এল তার সাহস? কোন উৎস থেকে এল তার প্রতিবাদ? জানতে কৌতূহল হয় তাঁর। রাণী মোতিকে ডেকে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে পাঠান যে, শোকে তাপে দুঃসহ তাঁর অবসর, যদি আপত্তি না থাকে তবে কি একবার আসবে মোতি?

খবর পেয়ে এতটুকু ভাবে না মোতি। চাদর জড়িয়ে, তাঞ্জামে গিয়ে ওঠে।

অনেক দরবারী আদব কায়দাই এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। মহলে ঢুকে কোথাও আর সেই রাজোয়ারী হাবভাব দেখে না মোতি। অপেক্ষমান দাসীদের সেলাম স্বীকার করতে হয় না, অনেক কৌতূহলী চোখকে এড়িয়ে দ্রুত চলতে হয় না। পরিত্যক্ত ঘর, নির্জন মহল, শ্লথ দরবারী কায়দা কানুন। শয়নকক্ষের বারান্দায় বালক পুত্রকে কোলে নিয়ে পাথরের চৌকিতে বসে ছিলেন রাণী। বৈধব্যের রিক্ততায় একটি কঠোর শুচিতা প্রকাশ পায় তাঁর ঈষৎ কৃশ মুখে, শুভ্রবসনে, রুক্ষ কেশরাশির শিথিল গ্রন্থিতে, আর ললাটে চন্দনের ত্রিবলী রেখাঙ্কনে। বিলাসব্যসনের সুসজ্জিত পটভূমিকায় তাঁকে যেন কেমন একান্তই নিরাভরণা বোধ হয়।

বিস্ময় ও বেদনা শুধু মোতির চোখেই ফোটে না, রাণীও চেয়ে দেখেন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে। সেই যৌবনোচ্ছল মঞ্জরিত সুষমার মূর্তি স্বরূপা নর্তকীকে আর দেখতে পান না রাণী। তার অঙ্গে নেই অলঙ্কার, পরিধানে শুভ্রপরিচ্ছদ, মুখে নির্মল তপস্যার প্রসন্নতা। করনির্দেশে বসতে বলেন তাকে।

তাঁকে অভিবাদন করে মোতি। পুত্র ক্রোড়ে অদূরবর্তী রাণীকে দেখে মোতি হৃদয়ঙ্গম করে যে, রাজাসাহেবের মৃত্যুতে কোনখানে প্রকৃত দুর্ভাগ্য নেমেছে। মনে হয় একেবারে শূন্য করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। সমবেদনা ও রাজাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায়, মোতির চোখে জল আসে। বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আনত আঁখিপল্লব থেকে। সেই শ্যামবর্ণ স্থূলকায় ব্রাহ্মণ শাসককে সে শুধু দেখেছে একটি মাত্র রূপে—স্বেচ্ছাচারী ও খেয়ালী শাসকের ব্যক্তিত্বে। কিন্তু মোতি এখন অনুভব করে সে পরিচয়ই তাঁর সব ছিল না। তিনি স্বামী ছিলেন, পিতা ছিলেন, আর একটি রাজ্যের গুরুভার ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর। এই সব মনে করে মোতি এই বিধবা রমণীর দুঃখ ও দুর্ভাবনার গভীরতার যেন কিছুটা আন্দাজ পায়।

মোতির গভীর সহানুভূতি ও নীরব শোক রাণীকেও যেন স্পর্শ করলো। তাঁর চোখও সিক্ত হয়ে ওঠে।

কয়েকটি মন্থর মুহূর্ত কাটলো। তারপর মোতিকে গান করতে অনুরোধ করলেন রাণী।

মোতি রাণীর ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে—কুমার সাহেব, তুমি আমাকে ফরমায়েশ করো আজ। এখন তুমিই তো আমার মালিক।

বালক মা'র কানে কানে কি যেন প্রশ্ন করে। রাণী বলেন—হ্যাঁ, সব শুনবে। মোতিকে বলেন—তুমি ওর কথা শুনবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছেন কুমার।

মোতি মধুর হেসে বলে—আমি তোমার হুকুমের অপেক্ষায় আছি কুমার সাহেব।

তারপর রাণীর চোখের ইঙ্গিত পেয়ে গান শুরু করে মোতি। তুলসীদাসজী'র রামায়ণ থেকে গান করে। বালক রামের প্রতি কৌশল্যার স্নেহ বর্ণনা করে। তারপর রাম-বনবাসের করুণ পরিচ্ছেদে এসে গান শেষ করে।

মোতির ললিত কণ্ঠে গানের মাধুরীতে আকৃষ্ট হয়ে একে একে সেখানে এসে জড়ো হয়েছিলেন পুরবাসিনীরা। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনছিলেন।

রাণীর প্রশংসা যেন আর শেষ হতে চায় না। বলেন—আরো শোনাও মোতি, শ্রবণকে তুমি পিপাসিত করেছ।

স্মিত হাসিতে নতি স্বীকার করে মোতি। তারপর শুরু করে তার প্রিয় গান—

যোগান্ বন্ যাউ॥

কোন এক দুঃখের কথাই বয়ান করছে মোতি। রাণী তা জানেন না। তবু মনে হয়, কোনও গভীর বেদনার গোপন উৎস থেকে সতত সঞ্চারিত না হলে এই আকুতি ও মাধুরী গানে আসতে পারে না। গানের অরমাঁ এমন করে মূর্ত হতে পারে না।

গান শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বালককে কক্ষান্তরে নিয়ে যায় দাসী। তারপর আত্মীয় পরিজনরাও যে-যার নিজের নিজের কাজে একসময় অপসৃত হয়। সন্ধ্যার শান্ত বিষণ্ণ ছায়া নেমে এসে মধুর কোমল এক পরিবেশ রচনা করে। কোন্ সমব্যথী

হৃদয়ের আশ্বাস পায় মোতি, কে বলবে? মনে হয়, আজ এই লগ্নে আর কোন শুভ কাজ নেই। শুধুমাত্র আছে মধুময় এক জাগর প্রতীক্ষা।

গান থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাণীর খেয়াল নেই। মোতির মনও উধাও। গৃহদেবতার মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা শুনে ত্রস্তে বিদায় নেয় মোতি। সিঁড়ি ধরে সে চত্বরে নামে। রাণীও একটু এগিয়ে আসেন। বিদায়ের প্রাক্কালে হঠাৎ মোতি ফিরে তাকায়, তারপর খানিকটা অযাচিতভাবেই বলে—জানেন বাঈসাহেব, জীবনটা যেমন করে চেয়েছিলাম, ঠিক তেমন যেন হলো না। কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল। কোন মানে খুঁজে পেলাম না। তবু এই জীবনটাকে তো ফেলে দিতে পারি না। আমার এক্তিয়ার ছাড়া হয়ে গিয়েছে সব!—জীবনের মালিকানা বিকিয়ে গিয়েছে। তবু বাঁচতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে। হিসেবটা যতদিন না দাবীদারের কাছে পেশ করে শোধ বোধ করতে পারবো, ততদিন তো ছুটিও নেই!

সাগর মাপা যায়, তবু বুঝি মানুষের মনের খেই মেলে না। তাই মোতির কথার কোন উত্তর নেই। আশ্বাস দিতে গিয়ে সমবেদনায় রাণী হয় তো নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন মোতিকে শুনিয়ে—কভি কভি য়্যায়সা হোতা।

প নে রো

দিন চলে যায়। রুক্ষ দেশ, তবু সেখানেও মহাসমারোহে ঋতুর পরিবর্তন হয়। বসন্ত আনে বেদনা ও আকুলতা। পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও কেঁদফুল ফুটে ওঠে উত্তাপ লেগে। চঞ্চল পবন আনে মন উদাস করা মধ্যাহ্ন। পূর্ণিমানিশীথে বিরহী পাপিয়া ডেকে ডেকে রাত জাগে। বকুল ফুটে ওঠে। কোন নূপুর শিঞ্জিত চরণ আঘাত করে না তবু অশোকের মঞ্জরী বসন্তকে অভিনন্দন জানায়। বাগানে বকুলকে আলিঙ্গন করে জুঁইয়ের

লতা বৃথাই একটি দুটি শুভ্র কোরকে সুবাস ছড়ায়। ঝরা-আমের মুকুল গালিচা বিছিয়ে কোমল করে বনপথ। কিন্তু মোতি আর যাবে না সেখানে। ঝুলা দুলিয়ে সখীদের সঙ্গে খেলা করবার দিন চলে গিয়েছে। অনেক সুন্দর দিনের মুকুলিত সম্ভাবনাকে নিজেই বিদায় দিয়েছে মোতি।

তবুও তো ফাল্গুন আসে! তবু আজও হোলিতে উৎসব হয়। সে উৎসবের দিনে মোতি গৃহকোণে একান্তে দিন যাপন করে। কোনও প্রিয়স্মৃতির স্মরণে তারও অন্তরে হোলি খেলা হয়—

হোলি খেল মনা রে,
বিন করতাল পখাওজ বাজে,
অনহদ কী ঝঙ্কার রে।

গভীর নিশীথে সুদূর চাঁদের দিকে চেয়ে যখন পাপিয়া ডেকে ওঠে তখন মোতির মনে হয় পাপিয়াও কি তার শত্রু? যখন নিশুত আকাশে সে পিউ কঁহা পিউ কঁহা পুকার ভাসিয়ে দেয় সে কি তখন জানে না যে আরো একটি নিরালা হৃদয় একান্তে সেই কথাই ধ্যান করছে

ঘোসের কাছে লেখা খুদাবক্সের চিঠিখানা বারবার করে পড়ে মোতি। অপেক্ষা করতে লিখেছে সে, ধৈর্য ধরতে বলেছে। বারবার পড়ে চিঠিখানা জীর্ণ হয়ে উঠেছিল। রেশমের খণ্ডে জুড়ে মোতি সেই চিঠিখানা একটি শ্বেতপাথরের বাক্সে রেখেছে কর্পূর ও চন্দনের মালা দিয়ে ঘিরে।

গ্রীষ্মের তাপদাহনের পর ঘনঘটা করে বর্ষা আসে। দিগন্তের শেষ প্রান্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ উঠে আসে। কালো আকাশের পটভূমিতে বীণা কোলে নিয়ে মোতি ছাদে বসে। অযত্ন কবরীতে বাঁধা পড়ে চুল, পরিধানে লঘুনীল চিকণের শাড়ি।

সুনি ম্যয় হরি আবন্ কি আওয়াজ,
মহলান চঢ়ি চঢ়ি জোউঁ মোরী সজনী,
কব আয়ে মহারাজ—

গান তারই মনের কথা বলে।

তারপর সহসা কোন নিশীথে শুরু হয় প্রথম বর্ষণ। ঘুম ভেঙে যায়। খোলা জানলা দিয়ে জলের ছাঁট আসে। ভেজা

মাটিতে একটা আশ্চর্য গন্ধ। বিদ্যুৎ চমকে চোখে পড়ে আরাম করে ভিজছে গাছগুলো। জলের গুঁড়ো বয়ে এনে ঠাণ্ডা বাতাস জুড়িয়ে দেয় কপাল। মত্ত বাদলের এই উৎসবে তার দয়িতের কোন খবর মেলে কি ?—

মতবারো বাদল আয়ো রে
পিয়াকা সন্দেশ কুছ ন লায়োরে
কারিয়া আঁধার বিজরী চমকত বিরহিন অতি ডর পায়ো রে।

প্রভাতে বর্ষণ স্নাত ধরণী শ্যাম সজ্জায় ঝলমল করে। প্রকৃতির চোখে লাগে নীল অঞ্জনের ছায়া। সবুজ তৃণাঙ্কুরের আস্তরণ বিছিয়ে দেয় মাটিতে। পরিপূর্ণ দুর্যোগে ভরা বরষায় শূন্য মন্দিরে গান গায় মোতি। অস্থির বিদ্যুতের পত্রলিপি দেখে মন চঞ্চল। প্রবাসে প্রিয়তম, বিরহী অন্তর, মনপ্রাণ পিপাসিত। এমনি রাতে মন চলে যায় অভিসারে। নিজে তো যেতে পারে না মোতি, তাই মনকে সাজায় নীলাম্বর বসনে, ফুল্লমল্লিকার মালায়। কোনও দুরতিক্রম্য কুঞ্জপথ ধরে তার মন চলে যায়। এই অভিসারের শেষ কোথায় তা তো মোতি জানে না। তাই শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ আঁধার জেনেও তার অভিসারিণী মন চলে গানের চরণ ধরে—

পিয়া কো মিলন কী আশ।

শরতের প্রসন্ন দিনে বুন্দেলা মেয়েরা পদ্মফুল আহরণ করে ডালি সাজিয়ে ফেরি করে পথে। মন্দিরে মন্দিরে মাঙ্গলিক পূজার আয়োজন হয়। বিষ্ণু-আলয় ও মুরলীধর মন্দির থেকে শুভ শারদীয়া ব্রতপূজার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে।

মোতি কেমন লঘু প্রসন্নতা বোধ করে অন্তরে। সে যেন আর নিজের মধ্যে নেই। বড় মধুর, কোমল আর মমতাময় হয়ে গিয়েছে মোতি। চোখে তার ক্ষমা আর সহানুভূতির গভীর আবেদন। এই চোখে কোনদিন লাস্যের বিদ্যুৎ খেলতো বলে মনে পড়ে না। প্রেমের বেদনা সঞ্জাত একটি গভীর শুচি শুদ্ধ ভাব সঞ্চারিত হয়েছে মোতির চরিত্রে। মানুষকে দেখবার চোখটা তার বদলে গিয়েছে। পরিচিত জনের অন্তরে পৌঁছবার এক ছাড়পত্রের খোঁজ মিলেছে। আগে সে ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার রূপ, তার সঙ্গীত,

ঐশ্বর্য, সব যেন এক বৃত্ত রচনা করে সাধারণের থেকে তাকে অন্তরালে রেখেছিল। সেই গণ্ডি আজ আর নেই। আজকের মোতিকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে তার পরিচিতজন। সর্ব সাধারণের এই সহানুভূতি অনুভব করে মোতি মনে মনে আশ্বাস পায়, বড় ভালো লাগে তার।

পৃথিবীতে আসে রিক্ততার ঋতু, বৈরাগী শীত। রুক্ষ কেশ, সাধারণ বেশ, নরম একখানি তুলোর চাদরে শীত নিবারণ করে মোতি প্রতি বিকালে মহালে যায় দাসীর সঙ্গে। দেখে পথচারীর চোখে সংবেদন ও শ্রদ্ধা ফুটে ওঠে।

সোৎসুক আগ্রহে বসে থাকেন রাণী এই সময়টির পথ চেয়ে।

সেদিন মোতি গাইছিল—

> জো তুম তোড়ো পিয়া ম্যয়ঁ নহী তোড়ুঁ—
> তোরী প্রীত তোডি কিন সংগ জোড়ুঁ ॥
> তুম ভয়ে সরোবর ম্যয়ঁ তেরী মছিয়াঁ।
> তুম ভয়ে তরুবর ময়ঁ ভঈ পখিয়াঁ। ॥
> তুম ভয়ে মোতি প্রভু হম ভয়ে ধাগা।
> তুম ভয়ে সোনা হম ভয়ে সুহাগা ॥

তীক্ষ্ম চোখে চেয়েছিলেন রাণী। বললেন—সেই দরশ বিনা, গাও তো মোতি ?

'দরশ বিনা দুখন লাগে নৈনা' ; তোমার দর্শন বিনা আমার নয়ন ব্যথিত, এই কথা বলে নয়নে আপনিই অশ্রু সঞ্চারিত হলো, থেমে গেল মোতি।

রাণী বললেন—কার জন্যে তুমি গান গাও মোতি ? শুধু আমার শ্রবণের জন্য তো নয় ?

প্রশ্নই যেন প্রশংসা, স্মিত হাসিতে অভিবাদন জানাল মোতি। বললো—ঔর গানাকে লিয়ে।

আপনার জন্যে তো নিশ্চয়, এই কথা উহ্য রেখেই মোতি বললো—আর গানের জন্যে।

রাণী সে প্রসঙ্গ পরিহার করলেন। বললেন—মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তোমাকে কিছু দিই। কিন্তু অলঙ্কার বস্ত্রে তো তোমার আসক্তি নেই মোতি, বলো কি দেবো ?

বয়ঃকনিষ্ঠা, তবু শ্রদ্ধেয়া রাণী। পুনর্বার অভিবাদন জানাল মোতি। কাশীর সহযোগিতায় একটি ছোট ঘোড়াকে বশ মানাবার চেষ্টায়, বালক রাজপুত্র অঙ্গনে ছুটোছুটি করছিল। তারদিকে চেয়ে সস্নেহ হাসল মোতি। বললো—সরকার, আপনি স্মরণে রাখবেন, কখনো দূরে সরিয়ে দেবেন না আমাকে। সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার আর কিছু কামনা করি না।

রাণীর আদেশে দাসী একটি ছোট সাজি ভরে গোলাপফুল এনে দিল। সানন্দে নতশিরে গ্রহণ করল মোতি।

চলে যেতে গিয়েও একবার ফিরে তাকালো মোতি। রাণীর জন্যে মনটা কেমন করুণ হয়ে ওঠে তার। আজই কানে এসেছে ইংরেজের ফৌজ নাকি শহর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল। অপেক্ষমান শিবিকা যে রাণীরই তা জেনেও তারা সরে যায়নি। হয়তো ঔদ্ধত্য নয়, হয়তো ফৌজী কানুন। তবু এরই মধ্যে এমনি ঘটনা আরো যতগুলো ঘটেছে, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখলে শঙ্কাই মনে জাগে। এ যেন কোন একটা ছবির প্রাথমিক রেখাঙ্কন মাত্র। একপাশে রঙও পড়েছে। বাকিটা অস্পষ্ট, তবু মনে হয় ভয়াবহ।

অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ দিন। কে জানে কোন ভবিষ্যৎকে এগিয়ে আনছে এই বর্তমান।

ষো ল

নতুন খবরের দূত আসে দশদিক থেকে। শাহীসড়ক ধরে যে ক্লান্ত ফৌজের অক্লান্ত মিছিল চলে, তারা মুঠো মুঠো খবর ছড়িয়ে যায়। উৎকর্ণ হয়ে শোনে চূনারকি রিসালা হল্ট। আর খুদাবক্স বার্তাবহ হয়ে নিকটবর্তী ছাউনিতে ছাউনিতে তা পৌঁছে দেয়।

সাসারামের জায়গীরদারের ছেলে আফঘান বাদশা শেরশাহ বাংলা থেকে পেশোয়ার জুড়ে দিলেন নবাবী সড়ক বানিয়ে।

তখন কি তিনি ভেবেছিলেন এই পথ একদিন মস্ত এক ভূমিকা গ্রহণ করবে হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ?

কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলে। এই পথকে মাঝখানে রেখে ধমনীর শিরা উপশিরার মতো কত শত সহস্র পথ এসে মিশেছে! দিন যেমন এগিয়ে চলেছে, তেমনি সাড়া জাগছে এই সব ঘুমন্ত পথে। প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে পথ। মানুষ ফিরছে এখান থেকে ওখানে পদব্রজে, ঘোড়ায় চড়ে, উটের পিঠে। প্রাণের সাড়া ছড়িয়ে পড়ছে পথে পথে মহামেঘমন্দ্রে। আর বেহুঁশ জনপদের তন্দ্রা টুটছে, ঘুম ভাঙছে।

একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হিন্দুস্থানের সর্বত্র। বাদশাহী আমলের খোশগল্পের লীলাভূমি আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ কোথাও এই কাহিনীর ব্যতিক্রম নেই। দেখা যায় গ্রামে গ্রামে নানাজাতের মানুষ বাস করে। তাদের জাত, ধর্ম ও আহারবিহার আলাদা। কিন্তু যে কাস্তেখানা হাতে ধরে তারা মাঠে নামে, সেই লোহার তো কোন জাতিভেদ নেই। তাই দিয়েই তারা সকলে ফসল কাটে। আর ফসল কেটে সেই ফসলই তুলে দিতে হয় অন্যের গোলায়। অথচ সে ফসলে তাদের কোন অধিকার নেই। তাই অভাব অনটন কিষাণের নিত্যসাথী, আর তা মেটাবার প্রয়াসেই কিষাণকে আজ যেতে হবে ফৌজে।

চল চল ফৌজে চল। রুজি রোজগারের আর কোন পথ নেই। ফৌজী জীবন সুখের জীবন। ফৌজী জীবনে আসবে ইজ্জত, অর্থ ও নিরাপত্তা। সিপাহী হয়ে ঢুকবে সুবেদার হয়ে বেরুবে।

সিপাহী থেকে সুবেদার, সওয়ার থেকে রিসালাদার—দুর্ভাগা কিষাণের কপালে এই সত্যিও মিথ্যে হয়ে যায়!

মাসে মাসে হাতে করে মাইনে মেলে চার পয়সা, ছয় পয়সা, এক টাকা, দুই টাকা। খাদ্য মেলে এক ডাল আর রুটি। তরি-তরকারি, সে তো বিলাসিতার নামান্তর। বাট্টা কম, ভাতা নেই। টাকার কথা তো বানচাল হয়ে গিয়েছে আগেই। আর ইজ্জত—সাহেব মালিকের চাবুকের মুখে ইজ্জত বাড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে

মাটিতে। লঘুপাপে গুরুদণ্ড—কোর্টমার্শাল আর ঠাণ্ডিঘর তো আছেই। বিদ্রোহ করতে চাও যদি তো স্মরণ রেখো সেই মূর্খদের কথা, যারা ফাঁসিতে ঝুলেছে, কামানের মুখে উড়ে গিয়েছে ধুলো হয়ে। প্রতিবাদ করো না, মুখ তুলে কথা বলো না। সাহেব মালিক, তার কমাণ্ড শুনে খালিপায়ে মার্চ করো। মার্চ করো আফগানিস্থান, মাদ্রাজ, আসাম। দরকার-মাফিক জাহাজ-ভরতি চলে যাও বর্মা। মার্চ করো···

কদম কদম। পায়ে পায়ে কদম বেড়ে চলে পথে পথে। এ চলার বিরাম নেই। হাজারে হাজারে সওয়ার ও সিপাহী মার্চ করে চলে উত্তর ও মধ্যভারতের বুক দিয়ে। ছাউনি থেকে ছাউনি, ব্যারাক থেকে ব্যারাক, ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ক্যাণ্টনমেণ্ট—দূরত্ব নেই কোথাও। সব দূরত্ব এক করে দিয়েছে ফৌজের অক্লান্ত কাওয়াজ। লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট। পায়ে, চুলে, ভুরুতে ধুলো, গলা তেষ্টায় কাঠ, প্রাণ কণ্ঠাগত, তবু চলো। থেমো না কোথাও। থামবার হুকুম নেই।

এই মার্চের তালে তালে ঘুম ভাঙে সুপ্তজনপদের প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে সিপাহী ও সওয়ারের চোখে। বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে ছাউনিতে ছাউনিতে। অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে সিপাহীরা। দূতের মুখে মুখে খবর চলে যায় এদিকে ওদিকে। নতুন খবরের দূতরা অনবরত চলাফেরা করে। ভারতের ভাগ্য নতুন করে গড়বার মহলা চলে।

রাতের পর রাত হল্টের ওপর কোঠায় লণ্ঠন জ্বলে। বসে কথা কয় কতরকমের মানুষ। মাঝরাতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়। চিঠিপত্র মুসাবিদা হয়। ফৌজী ছাউনি থেকে খবরাখবর আদান প্রদান চলে।

কানাঘুষা হয় ছাউনিতে যাওয়া আসা নিয়ে সাহেবরা বড় কড়াকড়ি করছে।

খুদাবক্সকে চেনে সবাই। বিন্দ্‌কীর রিসালা মেজর সাহেবকে ভেট লাগিয়ে খুদাবক্স তাঁর সঙ্গে তুটো গল্পগুজব করে। রঘুনাথ

সিংয়ের চোখে একটা সন্দেহের ছায়া নামে। খুদাবক্সকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন—

—কেন এই কাজ নিয়েছ?

—কিছু তো করতেই হবে মেজর সাহেব!

—ছাউনি থেকে ছাউনি ঘোরো, কোন খোঁজ খবর পাও না?

—কি খবর পাবো বলুন?

নিরীখ করে দেখে রঘুনাথ হাসেন আর বলেন—বড় হুঁশিয়ার মানুষ হে তুমি খাঁ-সাহেব। খুব খেয়াল রেখে কথা কও।

খুদাবক্সও হাসে। বলে—কিছু ডাক আছে? হামীরপুরে কোন খবর পৌঁছে দিতে হবে?

—রিসালাতে খোঁজ নিয়ে যাও। রিসালা তো খুদাবক্সের বন্ধু। খুদাবক্সকে এগিয়ে দিতে দিতে চম্মন ও জৌনা খাঁ নিচু গলায় জানায়—হ্যাঁ, জানিয়ে দিতে পারো চৌথা রিসালায় যে, আমাদের এখানে নিশানার খবর পৌঁছে গিয়েছে।

—কি নিশানা?

—চাপাটি আর লালকমল।

—এমনি চাপাটি?

—হ্যাঁ। কেননা এই নিশানার সঙ্গে কিষাণরা খুব পরিচিত। পঙ্গপাল পড়লে বা ফসলের কোন মৌত লাগলে পরে কিষাণরা এই নিশানা ছড়িয়ে দিয়ে জানায় যে, কোন দুর্যোগ আসছে।

—কারা পাঠালে এই খবর?

—জানা নেই। তবে এ ফৌজী ছাউনির খবর।

খবর নিয়ে খুদাবক্স গাছতলায় বিশ্রাম করতে বসে। ঘোড়ীর সহিসরা চাপাটি সেঁকে। দেখতে দেখতে কি যে বিস্ময় মানে খুদাবক্সের মন! একখানা রুটি যা ঘরে ঘরে কত মানুষের জন্য নিত্য তৈরি হচ্ছে, তাই না কি আবার নিশানা! কার নিশানা? কি আছে এর মধ্যে? সবচেয়ে ব্যস্ততা ফৌজী ছাউনিতেই বা কেন?

চৌথা রিসালায় ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা খায় একটা। তল্লাশ না করে কাউকে ছাড়ছে না শান্ত্রী। সাহেবের কড়া হুকুম। খুদাবক্সকে দেখেই ছোকরা সহকারী কমাণ্ড্যান্ট মেলেন্সবি এগিয়ে

আসে। তার ফরমায়েশ ছিল একটা বাদামী রঙের আরবী ঘোড়ীর। শান্ত্রীকে হাত নেড়ে সে হুকুম জানায়। ঢুকতে গিয়ে শান্ত্রীর পকেটে খুদাবক্স একটা টাকা ফেলে দেয়!

চমৎকার ঘোড়ী। বাদামী রঙের কোমল লোমে ঢাকা চিকণ গা, খুরের ওপর শাদা দাগ। মেলেন্সবি তারিফ না করে পারে না। বলে—কিছু শিখিয়েছ কি?

—হ্যাঁ সাহেব, ট্রেণ্ড ঘোড়ী।

—কে ট্রেনিং দিয়েছে?

—আমি।

—কেমন তালিম দিয়েছ?

—যাতে আপনি খুশি হবেন।

—দাম কত চাইছ?

—পাঁচশ'।

শুনে একটা শীষ দেয় মেলেন্সবি। ডাকে রিসালা মেজরকে। নহলসিং সত্তাল ধীর পদক্ষেপে আসেন। বড় গোঁফ ও দাড়ির প্রান্ত সুকৌশলে মুচড়ে তুলে কানের পাশে উঠে গিয়েছে। বড় কায়দায় পাষাণ দিয়ে মুরেঠা বাঁধা। শৌখীন লোক মেজর সাহেব। যোধপুরীর ওপরের ফৌজী কুর্তার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ঘোড়ীকে দেখেন। তারপর বলেন—ঠিক আছে। বেশি চায়নি।

মেলেন্সবি আশ্বস্ত হয়। হাল্কা পায়ে চলে যায় টাকা আনতে।

চোখে চোখে তাকিয়ে রিসালা মেজর খুদাবক্সকে বলেন—যাবার সময়ে ডাক নিয়ে যাবে আমার ঘর থেকে।

মেলেন্সবি গুণে গুণে টাকা দেয়। থলিটা পকেটে রেখে খুদাবক্স ঘোড়ীর পাশে দাঁড়ায়। লাগামটা বাতাসে আস্ফালন করে হুকুম করে—সেলাম লাগাও! খেলওয়ালার ঘোড়ার মতো ভঙ্গীতে ঘোড়ী সামনের পা দু'খানা উঠিয়ে সেলাম জানায়। বড় খুশি হয় মেলেন্সবি।

রিসালা মেজর সাহেব খুদাবক্সকে ডেকে বসতে বলেন চৌকিতে। বলেন—ফয়জাবাদ থেকে কুচ্ আসছে। তাদের তুমি পাবে চারগম্বুজ মসজিদ ছাড়িয়ে। সেখানে রিসালাদার সাহেব স্বরূপ-

সিংকে এই চিঠি দেবে। এ-ও খেয়াল রাখবে যে, চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

—আমাকে আপনি বিশ্বাস করছেন?

বিশ্বাস করবার ভরসা অন্য লোকের কাছ থেকে পেয়েছি। বিশ্বাস ভাঙলে তুমিই বোকা বনে যাবে। এ চিঠিতে গোলমাল কিছু নেই। পড়ে দেখো।

খুদাবক্স পড়ে—প্রাথমিক শিষ্টাচার অন্তে—স্বরূপ ভাই, যে মেলা বসাবার কথা ছিল, তার কিছু কিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। পুরা বন্দোবস্ত কায়েম হলে পরে তারিখ জানতে পারবো। একটা জলুস বেরোবে তুমি জানো। সে জন্যে চারটি হাতি, দু'শ' ঘোড়া আর পাঁচশ' পাল্কি আমরাই যোগাড় করবো। তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে অন্তত সাতটা হাতি যোগাড় করবে।

চিঠিখানা পড়ে পকেটে রাখে খুদাবক্স। বলে—মেলা খুব জমবে বলে মনে হচ্ছে।

—আশা করছি।

—তবে আমি চলি।

—কারবার খতম?

—না হুজুর, আবার আসতে হবে।

—বিন্দকীর খবর কি?

—রঘুনাথজী খুব ছবি আঁকছেন।

—কি রকম?

—দেখাচ্ছি।

লালচে তুলোট কাগজের ওপর লালকালি দিয়ে একটা ছবি আঁকে খুদাবক্স। একটা গোলচক্র, তার মাঝখানে একটা ডাঁটার ওপর আধফোটা পদ্মফুল, চক্রটার পাশে উর্দুতে লেখে 'চাপাটি'।

নিরীখ করে দেখেন নহলসিং। কিছুক্ষণ দু'জনে দু'জনকে দেখেন। তারপর খুদাবক্স কাগজটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে নাগরা দিয়ে ঠুকে ঠুকে বসিয়ে দেয়। নহলসিং তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। বলেন—ফুলটা শাদা না লাল? কি এঁকেছিলেন রঘুনাথজী?

—খেয়াল হয়, লালকমল।

দু'জনে দু'জনকে চোখে চোখে দেখেন। খুদাবক্সকে নহলসিং বিদায় জানান। নহলসিং পুনরায় বলেন—আমি আসছে মাসে ছুটিতে যাবো। তখন তোমার সঙ্গে ছোট রিসালাদার সাহেব দেখা করবেন।

—জী।

বেরিয়ে আসবার সময় কমাণ্ড্যাণ্ট সাহেবকে দেখে খুদাবক্স সেলাম জানায়। সাহেব বলেন—তুমি মেলেন্সবিকে ঘোড়ী দিয়েছ?

—হ্যাঁ সাহেব।

—আমাকে একটি এনে দিতে পারো?

—খোঁজ করবো।

—চেষ্টা করো। মেলেন্সবির ঘোড়ী আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

রুটি আর কমলের নিশানা ছড়িয়ে পড়ে—ফৌজ থেকে ফৌজে, ছাউনি থেকে ছাউনিতে। একখানা হাতে গড়া চাপাটি এনে ছাউনিতে পৌঁছে দেয় কোন অজানা বাহক। চাপাটিখানা হাতে হাতে ফেরে। সাহেব অবাক হয়ে জানতে চান, কার হাতে এই চাপাটি এল? কি হবে এ দিয়ে?

চূনারকি রিসালা হল্টে খবর আসে, আজ হাট আছে যমুনার ওপারে। মঙ্গলবার হাট বসবে রাধাপুরা গ্রামের তালুকদারের মাঠে। রবিবার একটা জমায়েত হবার কথা আছে কর্তার সিং নেহালের ময়দানে।

খুদাবক্স ও পরন্তপ কম্বল, পিতলের মুখ আঁটা জলের সোহ্‌রাই আর কিছু টাকা নিয়ে ঘোড়া চড়ে বেরিয়ে পড়ে।

এক একটা হাটে কম করে দশখানা গাঁয়ের লোক একত্র হয়ে কেনাবেচা করে। কাছাকাছি কোন ছাউনি থাকলে সেখান থেকে বাজার মুৎসুদ্দিও আসেন। রসদ যোগাড় করে নিয়ে যান।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে পরে ভাঙা হাটের চালাঘরে জড়ো হতে থাকে জমায়েত।

আর ওদিকে ছাউনিতে ছাউনিতে সাহেবরা প্যারেড ময়দানে এসে ফৌজ ও রিসালার কাছে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেয়। মাথা নিচু করে থাকে ফৌজ।

বিন্দ্কীর সন্নিকটে বিখ্যাত বৈশাখী পূর্ণিমার হাট। বিকেল নাগাদ পৌঁছয় খুদাবক্স ও পরন্তপ। বৈশাখের তুরন্ত গরম। তৃষিত মাটি চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অদূরে গাছের ছায়ায় আখ পিষে রস পরিবেশন করছে একটি আখওয়ালী দম্পতী। মাটির ভাঁড় করে রস তুলে দেয়। চুমুক দিয়ে খুদাবক্সের গলাটা জুড়িয়ে যায়।

হাটের পুব কোণে এক বিরাট চত্তরে হাতি কেনা বেচা চলেছে। চাদরের নিচে হাত রেখে আঙুল ধরে হাতির দামদস্তুর করে ক্রেতা ও বিক্রেতা। তিন আঙুল তো তিনশ' টাকা, তুই আঙুল খাড়া, এক আঙুল ভাঙা তো বুঝতে হবে আড়াইশ' টাকা।

কেনাবেচার গোলমাল, কাঠের দরজা পাল্লা বিক্রেতাদের টিন বাজিয়ে ক্রেতা আকর্ষণের জন্য চেঁচামিচি, বাঁশির শব্দ, ঘোড়ার ডাক—এ-সব ছাপিয়ে এক বিশাল গোলমাল এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়। কৌতূহলী খুদাবক্স ও পরন্তপ এগিয়ে যায়।

তিনজন অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে। তারা কি যেন বলছে আর জনসমুদ্র থেকে একটা কোলাহলের ঢেউ ফুঁসে উঠছে। এগিয়ে যায় পরন্তপ। ভীড় ঠেলে সামনে যেতে চেষ্টা করে। অশ্বারোহী ঘোড়ার রেকাবে পা দিয়ে দাঁড়ায়। উচ্চৈস্বরে বলে—মীরাট!......তার বক্তব্য সেই হাজার হাজার মানুষের মাথার কালো তরঙ্গের ওপর দিয়ে টক্কর খেতে খেতে আছড়ে পড়ে—মীরাটে ক্ষেপে গিয়েছে ফৌজ। ছাউনি জ্বলে গিয়েছে, খুন হয়ে গিয়েছে ইংরেজ অফিসার! ক্যান্টনমেন্ট থেকে ক্যান্টনমেন্ট এই খবর ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো।

উত্তেজিত জনতার চিৎকার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ঝড়ের মুখে ঢেউয়ের মতো এলোপাতাড়ি এদিক ওদিক বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে কোলাহল।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে খুদাবক্স ও পরন্তপ ঘোড়ায় উঠে বসতেই 'হায় হায়' করে ওঠে আখের রস বিক্রেতা। ঘোড়া তার আখের আঁটিতে মুখ দিয়েছে। একটা টাকা ফেলে দেয়

পরন্তপ। বিস্মিত দোকানীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার শোনবার অপেক্ষা না করেই তারা ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

বার্তাবাহী ঘোড়সওয়ার তিনজন দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়।

স তে রো

মোকাবিলা করবার অধীর প্রতীক্ষার অবসানের পর যখন লড়াই-এর মৌকা সত্যিই এসে পড়লো, তখন টালমাটাল হয়ে গেল সব।

মীরাটের পরেই দিল্লীতে বাহাদুরশাহী কায়েম করতে চলেছিল ফৌজ। খুদাবক্স ও পরন্তপ মিশে পড়েছিল সেই মিছিলে।

আতঙ্কিত ইংরাজ নরনারী শিশু দিল্লী ছেড়ে পালাচ্ছিল। তাদের হত্যা করাকে যুদ্ধ বলে মনে করেনি তারা। তাই পথিমধ্যে তারা পলায়নপর ইংরেজদের গাড়ি আটক করে শুধু দেখেশুনে ছেড়ে দিতো। একদিন এক ছোকরা সাহেব বন্দুক উঁচিয়ে রুখে উঠেছিল। বন্দুকটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খুদাবক্স বলেছিল—বন্দুক চালিয়ে একজনকে খতম করেছ কি, তোমাদের একজনেরও জান্ বাঁচবে না। খুব সাবধানে চলে যাবে। আর জবান্ সামলাতে চেষ্টা করবে। সবাই আমার মতো ঠাণ্ডা মাথা না-ও হতে পারে। আতঙ্কিত ইংরেজ মহিলা যাত্রীরা মিনতি করে সেই উদ্ধত ছোকরা সাহেবের হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তখন পরন্তপ বলেছিল—হিন্দুস্থানের মানুষ তোমাদের পুরুষদের মতো মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করবে না। জানের মায়া থাকে তো হাঁটু-ভেঙে বসে দয়া চাইতে চেষ্টা করো, বেঁচে যাবে।

ছোকরা সাহেব কিন্তু এতবড় ঔদ্ধত্যের কথা সহ্য করতে পারেনি। ইতর গালাগালি দিয়েছিল পরন্তপকে। উত্তরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মুখের ওপর চাবুক মেরেছিল খুদাবক্স। আর বলেছিল—যদি এই দিন কাবার করতে পারো সাহেব, আয়নায়

মুখ দেখে খেয়াল করো কথা কি ভাবে বলতে হয়! মেজাজ ছুটে গেলেই আয়নায় মুখ দেখে নিও।

এদিকে দিল্লীতে নতুন শাহীর কর্মচারীরা, ঘোড়া চড়ে টগবগিয়ে দিল্লীর পাথর বাঁধানো পথে পথে টহল দেয়। সন্ধ্যার পর চাঁদনী চৌক, কোতোয়ালি আর কেল্লার ময়দানে, ফৌজ ও জনতার জমায়েত হয়। মনের আনন্দে লোকের মুখে মুখে গান ফেরে—

'দরিয়া মেঁ তুফান
বড়ি দূর ইংলিস্তান
জলদি যাও জলদি যাও
ফিরিঙ্গী বেইমান।'

এ সব গানে সুর ও কথার কারুকাজ নেই। সময়ের প্রয়োজনে ও প্রাণের তাগিদে এই সব গানের সৃষ্টি। প্রাণ দেওয়া নেওয়া খেলার যাদু আছে এই গানে :—

'হাণ্টার গোলী খুব চলায়া একশ'ও সাল পুরা
চুহাকে তরাহ্ কেঁও ছুপ্ ছুপ্ ভাগে পল্টনবালা গোরা॥
যিত্তা পরেড চাহে লগাও লণ্ডন পেঁ মৈদান
হমারা মুলুক হাম্‌কো ছোড়ো ফিরিঙ্গী বেইমান॥'

লড়াই-এর তুফানে পড়ে খুদাবক্স যতবারই চেষ্টা করল ঝাঁসীর পথে পা বাড়াতে ততবারই ব্যর্থকাম হলো। লক্ষ্ণৌ-এর প্রান্তে মুখোমুখি সংঘর্ষে যখন তারা পরাজিত হয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল তখন ফিল্ড সাহেব হাল্কা তলোয়ারের নিপুণ চালনায় খুদাবক্সকে কাবু করে এনে চিৎকার দিয়ে বলেছিল—এই শয়তানটাকে সর্বাগ্রে ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু ফতেপুরের পাঁচনম্বর রিসালা এসে পড়ায় ইংরেজরা পলায়ন করাতে সে-যাত্রা তারা রক্ষা পেয়েছিল।

তারপর লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়ে কানপুরের দিকে অগ্রসর হবার পথে যারা এসে জুটলো, তাদের মধ্যে ছিল চম্মনলাল। ছোটখাটো চেহারা, ছিপছিপে গড়ন, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো পরন্তপ। কারণ এদিককার পথ, ঘাট, ক্ষেত, জলাশয়, সবই তার নখদর্পণে। পথ প্রদর্শক হলো চম্মনলাল।

ওদিকে [illegible]বঘরের খুনজখমের প্রতিশোধ নিতে ইংরেজ

এগিয়ে আসছে, তাই সাবধান হয়ে পথ চলবার প্রয়োজন। খুদাবক্সের দলে তখন আড়াইশ' সিপাহী, চল্লিশজন রিসালা— সকলেই পুরানো পল্টনওয়ালা। তাদের সঙ্গে বন্দুকও ছিল দু'শ'র ওপর।

কানপুরের এগারো মাইল দূরে যখন বিশ্রাম করছিল খুদাবক্সদের দল, তখন চম্মনলালকে ডেকে পরন্তপ বললো—আমার ইচ্ছা তুমি একটু এগিয়ে যাও। খেয়াল করে দেখো সামনের পথ পরিষ্কার আছে কি না, আমাদের এগিয়ে যাওয়া চলবে কি না!

চম্মনলাল রওনা হতেই তার পিছু নিলো পরন্তপ। রাম নেহাল আর ব্রিজলাল গাছের ওপর উঠে নজর রাখলো দূরে।

দুইঘণ্টা বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল চম্মনলাল। বললো—সব ঠিক আছে। এখন যাওয়া চলে।

খুদাবক্স বললো—দাঁড়াও পরন্তপকে আসতে দাও। তুমি এইখানে বসো চম্মন। খুব থকে গিয়েছ। এত পরেশান হয়ে পড়েছ যে চলবে কি করে?

—চলবে না! বলে হঠাৎ আঁধার থেকে বেরিয়ে এল পরন্তপ। চম্মনলালের ঘাড়ে তার থাবার মতো হাতখানা রাখলো। বললো—তোমাকে আমরা দুইদিন ধরে নজরে রেখেছি চম্মন। বড় চাল দিয়েছিলে, কিন্তু বাজীমাৎ করতে পারলে না। কতদিন থেকে ইংরেজের নিমক খাচ্ছ শয়তান?

চম্মনলালের মুখখানা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। পরন্তপের পায়ের ওপর পড়ে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। প্রাণের ভয়ে চম্মনলাল কুঁকড়ে, ভেঙে পড়ে কেমন যেন একটা অন্য মানুষ হয়ে গেল। পরন্তপ খুদাবক্সকে একখানা চিঠি দিলো। খুদাবক্স জোরে জোরে সকলকে পড়ে শোনালো—

লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রফোর্ড সাহেবের মুৎসুদ্দি ভবানীচরণের কাছে দাসানুদাস গুল্‌জারী, ওরফে মোফাজ্জল, ওরফে চম্মনলালের নিবেদন। আজ সন্ধ্যায় যে দু'শ' তিপ্পান্ন জন সিপাহী, চল্লিশজন রিসালা···তাদের সঙ্গে দু'শ' তিন খানা বন্দুক···

চরম নীরবতা। চারদিকের মানুষগুলোর অবিন্যস্ত চুল, ধুলো

মাখা ময়লা পরিচ্ছদ, ক্ষত বিক্ষত পা। তাদের প্রত্যেকের চোখে ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা জ্বলে ওঠে। জামার গলাটা ধরে বেইমানকে ঝাঁকায় খুদাবক্স। বলে—বল্, কতদূরে দুশমনের ফৌজ?

—আড়াই মাইল।

—কতজন তারা?

—দেড়শ' সওয়ার।

শুকনো ঠোঁটটা চাটে চম্মনলাল। প্রবীণ সৈনিক সরযূপ্রসাদ বলে—এই ইঁদুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে কতক্ষণ সময় কাটাবে চৌহানজী? দুশমন আসছে, তৈরি হয়ে নাও।

—হাঁ ভাই, বলে পরন্তপ চম্মনের হাত দুইখানা পেছনে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। তারপর বলে—খুদাবক্স এটাকে নিয়ে যাও!

প্রাণভিক্ষা চাইতে গিয়ে ভয়ে গলার স্বর চিরে যায় চম্মনলালের, তবু প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে—ভাইসব···আমার বিবি আছে, বাচ্চা আছে···

কথা শেষ করতে দেয় না খুদাবক্স। ঠেলতে ঠেলতে তাকে নিয়ে যায় ওদিকে।···হায় পরমেশ্বর···চম্মনলালের গলার বিকৃত আর্তনাদটা মাঝপথেই থেমে যায়। গুলীর শব্দ হয় পরপর দু'বার।

গাছের উপরের চৌকি থেকে নেমে আসে রাম নেহাল ও ব্রিজলাল। খবর দেয় যে, দুই মাইল পুব থেকে অংরেজের ফৌজ দ্রুত এগিয়ে আসছে!

পশ্চিম দিকে পালানো সমীচীন হবে না। কারণ গাছপালা বা বাগানের আড়াল সেদিকে মিলবে না। সেদিকে শুধু নদীর চর, খোলা ময়দান আর রাস্তা। সেদিকে যাওয়া মানেই শত্রুর হাতে ভাগ্য সঁপে দেওয়া। তারচেয়ে এই আমবাগানই অনেকটা নিরাপদ। ছড়িয়ে পড়ে খুদাবক্সদের দল।

ইংরেজ সৈন্যদের ঘোড়ার পায়ের শব্দ ঝড়ের মতো এগিয়ে আসে। একঝাঁক গুলী উড়ে এসে ফেটে পড়ে। ইংরেজ ফৌজ ঢুকে পড়ে আমবাগানে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এত কাছাকাছি আলো আঁধারিতে বন্দুকে বন্দুকে লড়াই চলে না। উভয় পক্ষের তলোয়ার ঝল্কে ওঠে।

দাঁতে ঠোঁট কাম্‌ড়ে লড়ে খুদাবক্স। বলিষ্ঠ হাতের নিপুণ আঘাত একটাও ব্যর্থ হয় না। একটার ওপর আর একটা ঘা মারে খুদাবক্স আর উত্তেজনায় গালি দিতে থাকে। সাহেবের ঘোড়া ভয়ে দুই পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ওঠে, সাহেব উল্টে পড়ে যায় আর তাকে আঘাত করে খুদাবক্স। এমনি সময় হঠাৎ অন্যদিক থেকে একটা গুলী এসে বেঁধে তার কাঁধে। ঘুরে পড়ে যায় খুদাবক্স। চোখের সামনে নামে হাজারো রঙের একটা ঝলক। তারপর সব আঁধার!

জ্ঞান ফিরে আসতে খুদাবক্স ডান কাঁধে যন্ত্রণা বোধ করছিল। চারদিকে চেয়ে তার মনে হলো যেন একটা ভাঙা শিবমন্দিরের মধ্যে শুয়ে আছে সে। তারপর তার নজরে পড়ে পাশেই বসে আছে পরন্তপ। তার চোখ লাল, রুক্ষ চুল আর পরিধানে জীর্ণ বাস। খুদাবক্সের চেতনা ফিরেছে দেখে পরন্তপের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আমি তো আর ভাবিনি যে, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারবো। দশটা দিন একদম বেহুঁশ হয়ে ছিলে ভাই। বাঁচবে তা-ও তো ভাবিনি।

ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে মুখখানা যন্ত্রণায় কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে যায় খুদাবক্সের। চেষ্টা করে একটু হাসে। বলে—তোমার এ কি চেহারা হয়েছে পরন্তপ? তারপর একটু থেমে আবার বলে—আমরা কোথায় রয়েছি পরন্তপ?

পরন্তপ বলে—এ খুব নিরাপদ জায়গা। যমুনার কিনারে একটা শিবমন্দির। এখানে আর দুইদিন থাকবো। তারপর চলবো ঝাঁসী। পথে লাল্‌তাগড় হল্ট-এ ক'টা দিন থেকে যাবো।

—ঝাঁসী?

—হ্যাঁ,—আর সব জায়গায় লড়াই খতম হয়ে গিয়েছে খুদাবক্স। শুনেছি একমাত্র সেখানেই বড় জোশের সঙ্গে জমে উঠেছে লড়াই। কানপুরে আর লড়াই হবে না। কানপুর অংরেজের হাতে চলে গিয়েছে। কাল্পীতে চুরাশগম্বুজে তাঁতিয়া মস্ত ছাউনি ফেলেছে বটে কিন্তু সেখানে কেন যাবো খুদাবক্স? লড়তে চেয়েছি অথচ চোখের সামনে লড়াই ভেঙেচুরে যাচ্ছে সর্বত্র। তাই যেখানে লড়াইয়ের সত্যিকার মৌকা মিলবে সেখানেই যাবো ভাবছি।

ঝাঁসীর, কথা কানে যেতেই খুদাবক্স কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। বললে—ঝাঁসীর খবর আরো বলো পরন্তপ।

পরন্তপ বলে—ঝাঁসীতে এখন লড়াই-এর ইন্তেজাম জমেছে—পরন্তপের কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। কথা কয় কিন্তু হাত দু'খানা কাজ করে চলে। সযত্নে গরমজল দিয়ে খুদাবক্সের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সে। মলম লাগায় ধীরে ধীরে। বলে—ভাগ্যিস অজ্ঞান হয়েছিলে, নইলে কি আর কসাই-এর মতো ছোরা দিয়ে গুলীটা বের করে আনতে পারতাম! ঘোড়ার পিঠে করে তোমাকে যখন আনছিলাম, তখন আর মনে হয়নি তুমি বাঁচবে। জ্বরে শরীর পুড়ে গিয়েছে, কেবল জল খেয়েছ আর···

আর কী? তবে কি জ্বরের ঘোরে খুদাবক্স মোতির নাম ধরেই বারবার ডেকেছে! খুদাবক্স লজ্জা ও সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে পড়ে। পরন্তপের চোখ কৌতূহলে উদ্দীপ্ত! সে যেন এক নতুন খুদাবক্সকে দেখছে। কিন্তু খুদাবক্স কি কথা দিয়ে শুরু করবে ভেবে পায় না। বলে—সাত বছর আগে···

কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও মোতির কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না খুদাবক্স।

পরন্তপ বলে—তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ খুদাবক্স। তারপর ইচ্ছে করেই কথা ঘোরাবার জন্য বলে—কোন্ হাতে বন্দুক ধরবে তুমি?

—কেন, এই হাতে।

—খুব যে মরদ হয়েছ! এদিকে আমার জাতটা তো মেরে দিলে।

—তোমার আবার কোনও জাত ছিল না কি পরন্তপ?

—ছিল না? বলে গোঁফে চাড়া দেয় পরন্তপ আর বলে—

চব্বিশ বাঁশ, চল্লিশ গজ অঙ্গুল অষ্ট প্রমাণ।
মার মার মোটা তাওয়া মৎ চুকো রে চৌহান।

—আমি হলাম সেই চৌহান—শ্রেষ্ঠ রাজপুত। এমন দিন ছিল যখন চৌহান পায়ের আঙুল দিয়ে সর্দারদের গদীতে বসবার সময়ে টিকা পরাতো কপালে। জাত নেই তোমার। তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনি একরোখা। তারপর আবার বলে—একবার ঝাঁসীতে নিয়ে ফেলতে পারি তো তুমি দেখবে।

—কি করবে?

—কোনও আওরতের সঙ্গে সাদি দিয়ে দেবো। বাঁধা পড়লে পরে তবে যদি তোমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়!

বলে আর জোরে জোরে মালিশ করে খুদাবক্সের কাঁধ। বড় অধৈর্য হয়ে গিয়েছে পরন্তপ। বলে—বসে বসে আমার রক্ত ক্ষেপে গিয়েছে। আর সহ্য হচ্ছে না।

খুদাবক্স বলে—তাহলে ডন বৈঠকী মারো আর ছুটে বেড়াও।

চটে যায় পরন্তপ। বলে—তোমাকে দেখে দেখে মনে হয় তুমি ঘোড়া হলে মানাতো ভালো। কী মোটা বুদ্ধি, আর কি বোকার মতো কথা!

রাস্তায় চলতে চলতে পরন্তপ বলে—এই আমাদের হয়তো শেষ সফর খুদাবক্স—

খুদাবক্স বলে—শেষ সফর, কেন?

পরন্তপ কোনও উত্তর দেয় না। খুদাবক্সেরও মনে হয় হয়তো পরন্তপের কথাই ঠিক। এই তাদের শেষ সফর। এই সফরে যোগ দেয় আরো অনেক মানুষ। হিন্দুস্থানের বাঘী সিপাহী, জঙ্গী রিসালা আসে ফাঁসির দড়ি থেকে কোন মতে বেঁচে। ইংরেজের হাতে তাদের মৃত্যু ছাড়া অন্য বিচার মিলবে না। মরতেই যদি হয়, তো শেষ মৌকা নেবার চেষ্টা করতে বাধা নেই। তাই তারা ঝাঁসী চলেছে। হত্যা ও লুঠতরাজের বিভীষিকা পেছনে রয়েছে, আর সামনে রয়েছে শেষ আশ্রয়স্থল। খুদাবক্স, পরন্তপ ও তাদের সঙ্গীদের সবারই চোখে একই কথা লেখা। জীবন-পণ করে লড়াইয়ে নেমেছে। সেই লড়াই ভেঙে-চূরে যাচ্ছে। কাজেই শেষ লড়াই-এর জন্যে চলেছে তারা। এই উপলব্ধিটাই যেন সখাওতের রাখী। পরস্পরের সঙ্গে একটা দৃঢ়বন্ধন আজ অনুভব করে সবাই। কেউ আহত, কারো ঘোড়া জখম, কারো বা পোষাক ছেঁড়া। আবার কারোকারো ঘরবাড়ি আত্মীয় স্বজনের ও কোন ঠিকানা নেই। কেউ খবর পেয়েছে ফাঁসিতে ঝুলে মরেছে তার বাপ ভাই। কারো বা ঘরবাড়ি হাতি দিয়ে মাড়িয়ে মাটির সঙ্গে সমান করে দিয়েছে ইংরেজ।

তবু কেউ হতাশা বা দুঃখের কথা বলে না। খুব হাসি ঠাট্টা চলে। মৃত্যুকেই শুধু ভয় ছিল। কিন্তু মৃত্যু কি তা-ও তাদের যখন জানা হয়ে গিয়েছে তখন বাকী জীবনটুকু হাসি দিয়ে ভরে দেবে না কেন?

ধীরে ধীরে কাছে আসে বড়োয়াসাগর। দৃশ্যপটে আসে লুঠতরাজের ছাপ। খাদ্যসংগ্রহ করতে মুস্কিল হয়। পয়সা দিলেও জিনিষ মেলে না। ইংরেজ এদিকে আসেনি তবু এমনি ধারা অত্যাচারের স্বাক্ষর কেন সর্বত্র? জানতে চায় তারা। গ্রামবাসীরা জানায়—মৌকা বুঝে, পুরনোদিনের ভূঁইয়াওয়াতী পরোয়ার সর্দাররা কয়জন মিলে আবার লুঠতরাজ কায়েম করেছে। সানুনয়ে তারা দিন দুই থেকে যাবার জন্য তাদের অনুরোধ করে। তারা আশা করছে দুই একদিনের মধ্যেই হয়তো ঝাঁসী থেকে কিছু ফৌজ এসে পড়বে।

পরন্তপ খুদাবক্সকে বলে—দিন দুই থেকে গেলে হয় না? চাই কি কিছু পুরনো দোস্তের সঙ্গে মোলাকাত হলেও হতে পারে। কি খুদাবক্স, মনে পড়ে কি দশ বছর আগেকার কথা?

—নিশ্চয়। গর্জন সিংহের সঙ্গে দেখা হয় তো বদলাটা নিয়ে নিই।

—বদলা ছাড়া অন্য কথা মনে হয় না? পরন্তপ আবার বলে—পুরনো দোস্ত, তার সঙ্গে দেখা হলে আমোদ আহ্লাদ করবে, একটু ফুর্তি করবে, তা নয়, শুধু খুন, জখম! ছো ছো, তোমার মতো দোস্তের সঙ্গে মিশে আমার জীবনটা ও মিছে হয়ে গেল!

খুদাবক্স হেসে ফেলে। বলে—তোমার সঙ্গে থেকে আমার জীবনটাও আর কিছু সাঁচ্চা হয়ে ওঠেনি।

তারপর ঠিক হয় বড়োয়াসাগরেই তারা দু'দিন থাকবে। বাঈসাহেবের রাজত্বে লুঠপাট হচ্ছে। দেখবে এই অত্যাচার তারা বন্ধ করতে পারে কি না।

গ্রামের কাছারিতে থাকবার বন্দোবস্ত হয়। এখনো তেমন গরম পড়েনি। গ্রামের প্রান্তে বড়োয়া নদীর একটি শাখা। সেখানে স্নান করে শ্রান্ত সৈনিকরা। উন্মুক্ত আঙিনায় আগুন জ্বেলে রান্নার যোগাড় করে।

তহশীলদারের তৎপরতায় ভালো চাল আর ঘি মিলেছে। একটা খাসিও পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে একজন। মস্ত এক ভোজ! গাঁয়ের কয়েকজনকেও নিমন্ত্রণ করেছে পরন্তপ।

খুদাবক্স চলে যায় স্নান করতে। শাদা বালির বুকে ঝিরঝিরে জলের ধারা। স্বল্প জলের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে খুদাবক্স আকাশের তারা দেখে। অদূরে গাঁ থেকে ছোটছেলের কান্না শোনা যায় আর সেই সঙ্গে কোন ছোটমেয়ের গলায় ভাইকে ঘুমপাড়ানী গানের সুরও কানে আসে! চোখে না দেখেও খুদাবক্স মনে মনে আঁচ করে মেয়েটার পরনে ধূলিমলিন লাল কাপড়ের ঘাগরা। গায়ে সেই কাপড়েরই আঙিয়া। পায়ে তার মল, নাকে রূপোর লবঙ্গ ফুল।

শান্ত পরিবেশ। তারার ছায়া পড়েছে জলে। বাতাসে নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ। অনেক কথাই মনের মধ্যে এসে ভিড় করে। একদিন সে কথা দিয়েছিল সময় হলেই আসবে। তবে কি সে-লগ্ন মিলেছে আজ!

রাত্রিবেলা হঠাৎ কীসের সোরগোল উঠলো যেন। হানাদারদের কোলাহলের মতন মনে হয়! খুদাবক্সের দল তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ ঝড়ের মতো দুর্বার বেগে এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো। সতর্ক হয়ে যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে। অস্ত্র হাতে নিয়ে অপেক্ষা করে সারবন্দী দাঁড়িয়ে। শত্রু, না মিত্র, না হানাদার, বিশ্বাস কি? আঁধারে দেখা যায় না।

ঘোড়সওয়াররা সংখ্যায় কতজন হবে ঠাহর আসে না। বেতোয়ার অপর তীরে এসে তারা দাঁড়ায় নিঃশব্দে। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন আসে—কৌন্?

—বাঈসাহেবকী ফৌজ।

—তব্ ঠাহ্ রো।

স্বল্পজল পেরিয়ে তারা এগিয়ে আসে। পুরোধা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় খুদাবক্সের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। পুনর্বার আদেশ আসে: লাইনে দাঁড়াও, দেখবো।.....নাম কি?

খুদাবক্স ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে যায়। বলে—শমসের পেশ করতে হুকুম দিন ওস্তাদ, আমি খুদাবক্স।

—খুদাবক্স, কোন খুদাবক্স?

—আপনার খুদাবক্স!

ঘোস ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। খুদাবক্সও নামে। কাঁধে থাবা দিয়ে তাকে সামনে টেনে আনেন ঘোস। নাগরার টক্করে ধুনীর মধ্যে কাঠ ঠেলে দেন। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন।

কথা কইতে গিয়ে রুদ্ধ হয়ে আসে স্বর। ঘোস বলেন—খুদাবক্স!

—ওস্তাদ!

দু'জনে দু'জনকে উচ্ছ্বসিত আবেগে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন। খুদাবক্সের কপালে মুখে চোখে হাত বুলিয়ে মুবারক করেন ঘোস।

এগিয়ে আসে পরন্তপ। এতক্ষণ সে নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে রাঙাআলু খাচ্ছিল। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—খাঁ-সাহেব, আমি পরন্তপ চৌহান। আমার শমসেরও পেশ করতে হুকুম দিন। এতদিনে এই বেওকুফ না-লায়েক খুদাবক্সকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এবার আমার ছুটি হয়ে গেল।

সাগ্রহে তার সঙ্গে কোলাকুলি করেন ঘোস। বলেন—চৌহান সাহেব, ছুটি আমি মঞ্জুর করবো না। এতদিনে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন আপনি। এখানে আপনি যথার্থ কদর পাবেন।

অপেক্ষমান সওয়াররা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে আসে। একটু সঙ্কোচ আর আনন্দের সঙ্গে বাহ্‌রাম, সাগর, দুলীচাঁদ আর ছোট জওহরকে সম্ভাষণ করে খুদাবক্স। গভীর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে হৃদয়।

বন্ধুজনের এই প্রীতি সম্মেলনকে আরও জমিয়ে তোলে পরন্তপ। বালির চড়া থেকে তরমুজ তুলে আনে। নদীর ধারে বসে সবাই সেই তরমুজ কেটে খায়। ঘোস ও খুদাবক্সের মধ্যে কথাবার্তা চলে। মাঝে মাঝে পরন্তপের সঙ্গেও গল্প গুজব হয়। এক সময়ে ঘোস বলেন—সমানে ডাকু লুঠেরার উপদ্রব হচ্ছে দেখে বাঈসাহেব

নিজে একবার এসেছিলেন। তখন বর্ষাকাল, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বেতোয়া স্ফীত। গর্জন সিং আর ভানুকে ফাঁসি দিয়ে গেলেন। কয়েকজনকে কয়েদ রাখা হয়েছে। এখন লুঠেরা ঠেকাতে কয়েকজন রিসালাকে এখানে রেখে যাবো ভাবছি। কিছু ফৌজের আসবার কথা ছিল। তাদের মানা করে দিলাম। চন্দেরীতে কয়েকখানা চিঠি পাঠালাম। আজই কিন্তু আমাদের ফিরতে হবে।

ঘৌসের কথায় প্রবীণ যোদ্ধার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য পরিস্ফুট। পরিধানে চমৎকার মানানসই গাঢ় নীল পোষাক। মুরেঠায় লালপত্তাকা উৎকীর্ণ ছোট্ট একটা সোনার তারা ঝক্‌ঝক্ করছে। রিসালার সাজ পোযাকও চমৎকার।

ঘৌস বুঝে বুঝে নানা জনের নানা প্রশ্নের জবাব দেন—হ্যাঁ, ফৌজ সবশুদ্ধ এগারোহাজার। পঁয়ত্রিশটা কামান। বাইশটা তো আমাদেরই ছিল, ইংরেজদের খুন করে বাঘী পল্টন আর দুটো কামান এনেছিল, নয়টি কামান মিলেছে অরছার নথে খাঁ'র কাছ থেকে আর বাণপুরের রাজা দিয়েছেন দুইটি। রসদ, টাকা, তোফাখানা, কায়েম বন্দোবস্ত। ফৌজ যে খুব তৈরি তা নয়, তবু মন্দ নয়। রিসালাটা খুব ভালো। কমজোরী হয়েছে আমার তোফাখানা। রিসালাতে বাঈসাহেব নিজে আছেন। তোফাখানাতে কিছু বহিনকে মিলেছে।

পরন্তপ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তাহলে সত্যি সত্যি মেয়েরাও লড়াই করতে নেমেছে!

ভোররাতে তারা ঝাঁসীর পথ ধরে। পরন্তপ, ঘৌস আর খুদাবক্স পাশাপাশি চলেন। খুদাবক্সকে দেখে অবাক মানেন ঘৌস। মনে হয় এই লোকটি যেন তাঁর একান্তই অপরিচিত। যে খুদাবক্স ঝাঁসী ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে ছিল এক তরুণ যুবক। আজকের খুদাবক্সের সঙ্গে তার অনেক তফাত। খুদাবক্সের রং অনেক জ্বলে গিয়েছে, শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রা দেহটাকে পিটিয়ে তৈরি করে দিয়েছে। কপালে রেখা পড়েছে। দৃষ্টিতে অনুমান হয় যেন অনেক স্থির ও একাগ্র হয়েছে খুদাবক্স।

বিকেলের আলো যখন প্রান্তরের ওপর দিয়ে বেঁকে পড়েছে, তখন দূরে আকাশের কোলে কালো রেখায় ফুটে ওঠে ঝাঁসীর

কেল্লা। মনে হয় যেন কোন নিপুণ পটুয়া তুলি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে একখানা।

একদৃষ্টে ঝাঁসীর দিকে চেয়ে থাকে খুদাবক্স। বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। কপালে ফুটে ওঠে স্বেদবিন্দু। ঘোড়ার পায়ের তালে তালে দূরত্বও যেমন কমতে থাকে, দুর্গের আকারও স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকে।

কাছাকাছি আসতেই ঘৌস বাহ্‌রামকে ডেকে একান্তে নিয়ে বলেন—খুদাবক্সের আসার খবরটা তুমি মোতির কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আর তাকে বলো সে যেন কেল্লা থেকে ঘরে চলে যায়।

ঘৌসের দলকে আসতে দেখেই শহর থেকে দূত সংবাদ বয়ে আনে। তার সঙ্গে কথাবার্তার পর ঘৌস সবাইকে ডেকে বলেন যে, উনাও গেট দিয়ে তারা নগরে প্রবেশ করবে।

শহরে পৌঁছেই ঘৌস খুদাবক্সকে বলেন—চলো আগে রাণীকে ভেট করি।

পরন্তপকে নিয়ে সঙ্গীরা চলে যায় কেল্লার দিকে; আর খুদাবক্সকে নিয়ে রাণীমহালে প্রবেশ করেন ঘৌস। চারিদিকের অভিবাদন মৃদু হাস্যে স্বীকার করতে করতে চলেন ঘৌস। তাদের দেখে দুজন তরুণী এগিয়ে আসে। তাদের পরিধানে পাঠানী পোশাক, কোমরে তলোয়ার।

ঘৌসের আগমনের সংবাদ পেয়ে দরবার কক্ষ থেকে দ্রুত পদে বেরিয়ে আসেন পাঠান যুবকের সাজে সজ্জিতা রাণী। ঘৌসকে দেখে বড় আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। ঘরের মেঝেতে মস্ত একটা তেলের বাতি জ্বলছে। এক পাশে হাতে আঁকা খসড়া মানচিত্র আর কিছু চিঠিপত্র পড়ে আছে। অভিবাদন জানান ঘৌস। বলেন—সরকার, সঁইয়ার দরোজায় অর্জুন কামান চালাবার লোক পেয়ে গিয়েছি।

এগিয়ে এসে তলোয়ার পেশ করে খুদাবক্স। রাণী এই শালপ্রাংশু বীরদেহ যুবকের উদার ললাট ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে বিস্মিত হন। ভালো লাগে তাঁর। তারপর কথা প্রসঙ্গে বলেন—বহুৎ 'আচ্ছা, কিন্তু এঁকে কি বড়োয়াসাগরে পেলেন?

—জী সরকার।...এখন একে বিশ্রাম করতে হুকুম দিন। আমি এর সম্পর্কে আপনাকে সব কথা বলছি।

স্মিত মুখে রাণী খুদাবক্সকে বিদায় দেন। খুদাবক্স চলে যেতেই ঘোস বলেন—সরকার, বাবাসাহেবের কাছে একদিন এর জান্ চেয়ে নিয়েছিলাম, আজ আবার আপনার কাছে সেই জান্ পেশ করলাম।

সব শুনে রাণী সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন—ঠিক আছে খাঁ-সাহেব। আপনার বিশ্বাস থাকলেই হলো।...এদিককার খবর জানেন কিছু? জানেন কি যে, চন্দন সিং গুপ্তচর, সেই খবর প্রকাশ হয়ে পড়েছে? ওর চিঠি ধরা পড়েছে। কোন্ পহেলা ব্রিগেডওয়ালা স্টুয়ার্টকে ও খবর দিচ্ছে আমার বন্দোবস্তি সম্বন্ধে। চিঠি বাজেয়াপ্ত করে তাকে কয়েদখানায় রেখেছি। বড় হুঁশিয়ারির প্রয়োজন এখন।

তারপর দু'জনে দু'দিকে ঝুঁকে পড়ে মানচিত্রখানাতে ইংরেজ সৈন্যের অগ্রগতি অনুসরণ করেন।

যাত্রা সমাপ্ত হয়েছে। পথ দিয়ে চলতে চলতে পথকেই অভিনন্দন জানায় খুদাবক্স। পাথরের বুকে ঘোড়ার খুরের প্রতিধ্বনি বাজে। একহাতে লাগাম ধরে বসে খুদাবক্স, অপর হাত চিবুক ছুঁয়ে থাকে। তীক্ষ্ণ চোখ ধূসর হয়ে আসে কোমল মমতায়।

পথে পথে সর্বত্রই সংগ্রামের প্রস্তুতির সাড়া। কর্মব্যস্ত নগরী, আলো, কোলাহল, কিছুই যেন চোখে পড়ে না খুদাবক্সের। মনে হয় সমস্তই স্বপ্ন। যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চলেছে সে। সত্যি মনে হয় শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ, আর ক্রমক্ষীয়মান ব্যবধান।

বাঁক ঘুরতেই চোখে পড়ে সেই অতি পরিচিত নিচু দোতলা বাড়িখানা। সদর দরোজা খোলা। পাশে কুলুঙ্গিতে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

ঘোড়া থেকে নামে খুদাবক্স। কিন্তু পা ভারী ও অবশ বোধ হয়। ঘোড়া বাইরে রেখে বাগানের মধ্যে পায়ে-চলা পথটুকু

পেরিয়ে দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। বড় দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কানপুরে যখন তার কাঁধে ইংরেজের গুলী লেগেছিল মুহূর্তের জন্য বুঝি সে মৃত্যুকেই দেখেছিল। কিন্তু তখনও তো তার এরকম বোধ হয়নি!

নিস্তব্ধ বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজের জুতোর শব্দটাই শুধু কানে বাজে। ঘরে ঘরে একটি করে শামাদান। আলো-আঁধারিতে সুন্দর একটা স্বপ্নময় পরিবেশ রচিত হয়েছে।

নিরাভরণ কক্ষগুলি পেরিয়ে সে যে ঘরে প্রবেশ করে তার মেঝেতে গালিচা পাতা। সেই গালিচায় পায়ের শব্দ ডুবে যায়। এগোতে গিয়ে চরণ থেমে যায়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খুদাবক্স।

আবছা আলোতে তার বিভ্রম হলো। মনে হলো—চিত্রার্পিতা এক রমণী যেন দাঁড়িয়ে আছে। স্নিগ্ধ আলো দিয়েই বুঝি গড়া তার দেহ। শুভ্র বসন, রুক্ষ বেণী, নিরাভরণ দেহ। শুধু কথা কয় দুটি ভ্রমর নয়ন। কথা কইতে গিয়ে থরথর কাঁপে ঠোঁট।

খুদাবক্সের কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হয় শুধু একটি কথা—মোতি!

বিশ্বাসঘাতকতা করে মোতির চরণ। টলে পড়ে যেতে চায়। বলিষ্ঠ দুই হাতে তাকে টেনে নেয় খুদাবক্স। বুকের কাছে ধরে ক্ষুধিত পিপাসায় বলে—মোতি, মোতি, মোতি। তারপর তার তৃষিত ওষ্ঠাধর এসে বিলীন হয়ে যায় মোতির তপ্ত অধরে।

জগৎ সংসারের দিশা ঠিকানা সব তার হারিয়ে যায়। অভিমান, অভিযোগ, এতদিনের তিলে তিলে রচিত কত স্বপ্ন, কত অভিমান আর কল্পনা সবই মিথ্যা হয়ে যায় মোতির। শুধু চরম সত্যি হয়ে ওঠে তাদের দু'জনের অস্তিত্ব।

মোতি নিজেকে সংবরণ করে। তারপর সমাদর করে খুদাবক্সকে খাটে বসালো। গানে গানে কতবারই তো সে এই আসন রচনা করেছে। মাটিতে নতজানু হয়ে বসে মোতি। পায়ের থেকে উন্মোচন করে নাগরা। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে খুদাবক্সের কোলে মাথা রেখে আকুল হয়ে কাঁদে। পুষ্পিত লতার মতো তনু দেহ

কেঁপে কেঁপে ওঠে। তাকে বাধা দেয় না খুদাবক্স। মোতির মধ্যে তার মা এবং আরো অনেককে যেন চিনতে পারে খুদাবক্স।

মোতিকে তুলে ধরে খুদাবক্স। .বসায় তার পাশে। সযত্নে চোখের জল মুছে দেয়।

কোন কথা হয় না। শুধু চেয়ে দেখে অনিমিখ। সেই ললাট, সেই ঈষৎ উন্নীত গ্রীবা, সেই ওষ্ঠ, সেই অধর, সেই চোখ। অযত্ন-বেণী-সংবদ্ধ কেশ, নিরাভরণ দেহ, আর অনামিকায় একটি প্রবালের অঙ্গুরীয়। মনে পড়ে এই অঙ্গুরীয়তে সে একদিন অধর স্পর্শ করেছিল।

অভিমানিনীকে আড়াল করে আছে নয়নপল্লব। শরমে সম্ভ্রমে আকুলতায় ঋজু তনুদেহ আরো থরো থরো। কথা কইতে গিয়ে কাঁটা বেঁধে গলায়। তারপর অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে মোতি বলে—কত দেরী করে এসেছো বলো তো?

অধীর হয়ে ওঠে খুদাবক্স। যার মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি, ভালোবেসে তাকে সে আজ কাঁদায় কোন্ সাহসে? কাছে টেনে সান্ত্বনা দেয় খুদাবক্স। বলে—খত্ পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—লিখেছিলাম তো সময় হলেই আসবো মোতি।

—লিখেছিলে, কিন্তু আর চলে যাবে না তো তুমি?

খানিকপরে খুদাবক্স বলে—একটা জিনিষ কবে থেকে যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি মোতি!—এক দুখিয়ারীর জিনিষ। তোমার নাম করে দিয়ে গিয়েছে।

—কী?

হাসি মুখে খুদাবক্স কুর্তার ভেতরের পকেট থেকে বার করে আনে একটা ময়লা রুমাল। রুমালের বাঁধন খুলতেই বেরিয়ে এল লবঙ্গ ফুলের ছাঁদে গড়া একজোড়া সোনার কানফুল। মাঝখানে একটু লাল মীনার কাজ। সঙ্গে সরু সোনার চেন।

পরম শ্রদ্ধায় কানফুলটা মোতির হাতে তুলে দিয়ে খুদাবক্স বলে—মা দিয়ে গিয়েছেন তোমাকে।

সামান্য জিনিষ, তবু মাথায় করে রাখবার মতো।

মোতি কানফুল জোড়া নিয়ে মাথায় ঠেকালো।

তারপর অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা ভালো করে দেখে। দেখে আর ভাবে, মানুষটাও না জানি কত সুন্দর ছিল! মাথাটা ঈষৎ হেলিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে দু'হাতে কানে ফুল পরে মোতি। তারপর ঋজু হয়ে দাঁড়ায় খুদাবক্সের সামনে। একটুখানি আভরণ অথচ তাতেই মানায় রাজকন্যার মতন। খুদাবক্স বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রিয়ার মুখের পানে। মুহূর্তের জন্য মোতির মুখখানাকে আড়াল করে খুদাবক্সের চোখে ভেসে ওঠে আর একখানি প্রিয় মুখের ছবি। সেই মুখ ঈষৎ শীর্ণ ও পাণ্ডুর, কপালে একটা উল্কির টিপ, চুলগুলি রুক্ষ ও পিঙ্গল। এই কানফুল পরা সেই মুখ বুকে আঁকা হয়ে রয়েছে খুদাবক্সের। খুদাবক্স কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে মোতির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সেই মুখ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় মোতির শ্রীমুখে। আরও সুন্দরতর করে তাকে।

মোতি বলে—কি দেখছো ?

—কিছু না, প্রশ্ন এড়িয়ে মোতির হাতখানা ধরে জানলায় গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায় খুদাবক্স।

নিচে রাজপথ। কর্মব্যস্ত মানুষের ত্রস্ত আনাগোনা সেখানে। কিন্তু খুদাবক্সের মন রাস্তার নিশানা ধরে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে উধাও হয়ে যায়।

মোতি বুঝতে পারে খুদাবক্সের মন। গভীর মমতায় হাতে হাত রেখে প্রশ্ন করে—কি হলো খুদাবক্স ?

খুদাবক্স উত্তর দেয় না। উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চোখ শুধু মোতির চোখে তুলে ধরে। হারিয়ে গিয়েছিল সমস্ত কিছু, খুঁজতে খুঁজতে আবার সব ফিরে পায় সে মোতির চোখে। বলে—জানো মোতি, মা থাকলে আজ বড় খুশি হতেন। দু'জনেই দু'জনের চোখে ভাষাহারা হয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। সেই মধুর ও করুণ নীরবতার ওপর নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলোকধারা যেন অ-দেহী আত্মার কল্যাণ কামনা হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে।

হঠাৎ রুদ্ধ দুয়ারে সাড়া কাড়ার মতো কার আভাস পাওয়া যায়। বন্ধু বাহ্‌রাম এসেছে। অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই সে হৈ হৈ করে এসে হাজির হয়।

একটু লাজুক হাসে মোতি। সপ্রতিভ বাহ্‌রাম যেন কিছুই দেখেনি, কিছুই বোঝেনি, এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি করে বুক পকেট থেকে একখানা খত্ মোতির দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, জোরে জোরে পড়ো বহিন্। খুদাবক্সও শুনুক।

ফৌজী কাজের কথাই হবে হয় তো। মোতির হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে খুদাবক্স। ঘৌস লিখেছেন: মোতি, যে বেওকুফ না-লায়েককে তোমার কাছে পাঠিয়েছি, তাকে আজ রাতে আর কেল্লায় আসতে হবে না। কয়েদ রেখো।

সুবাসিত উষ্ণজলে স্নান করে ক্লান্তি ধুয়ে যায় খুদাবক্সের। বেশ ঝরঝরে লাগে শরীর। তারপর সাদা চিপা আর লম্বা কুর্তা পরে খুদাবক্স খাস পাঠানী কায়দায়—গলার পাশে জরীর ঘুনসি বসানো। পায়ে কিছু পরে না। হাল্কা লাল রঙা চন্দেরীর মুরেঠা বাঁধে মাথায় খুব কায়দা করে। দেখতে হয় রাজার মতো।

ওদিকে পাশের ঘরে স্তূপাকার সাজপোষাকের মাঝখানে বসে নিজের পোষাক খুঁজে পায় না মোতি। রঙ, জরি, রেশম, কিছুই তার আর পছন্দ হয় না আজ। তারপর এটা সেটা করে বেছে নেয় চাঁপাফুল রং-এর পেশোয়াজ ও ওড়নী। আয়না সামনে ধরে বেণী বাঁধে পাকে পাকে। মুখখানা ঘসে ঘসে লাল করে তোলে। সুর্মা টানে দীঘল চোখে, যেন কালো ভ্রমর। ওড়নী টানে দেহ বেড়ে। মুখখানা হাজার বার করে দেখে আর্সিতে।

দেখাবে বলেই যেন শুধু নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখে মোতি। তাই কখন যে খুদাবক্স এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে মোতির খেয়ালই হয় না। হঠাৎ মোতির নজরে পড়ে দীর্ঘ সুঠাম তরুণকান্তি এক পাঠান। খুদাবক্সের দিকে ঘুরে তাকিয়ে সে নিজেই লজ্জা পেয়ে যায়। সত্যি বড় বেশরমের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে মোতি খুদাবক্সের বুকে মুখ লুকোয়।

এই বুক ছাড়া আর লুকোবারও ঠাঁই নেই মোতির—আত্মশ্লাঘায় হাসে খুদাবক্স সম্রাটের মতো। মোতির মাথায় চিবুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে সোহাগ জানায় ছোট ছোট শব্দ করে! তারপর

হঠাৎ দু'হাতে মুখখানা পুষ্পাঞ্জলির মতো তুলে ধরে সূর্যের মতো চেয়ে থাকে পলকহীন। চূর্ণ-কুন্তল ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেয় কপালে ও গালে। ওড়নীটা মাথায় তুলে দেয়। একটু কৌতুক আর অনেকখানি একাগ্রতা ফুটে ওঠে খুদাবক্সের মুখে চোখে।

মোতি ঈষৎ অস্ফুটস্বরে বলে—মনে পড়ে খুদাবক্স? সেই যেদিন···

—সব মনে পড়ে মোতি।

দু'জনের চোখে ভেসে ওঠে সেই হোলির দিন। প্রথম সাক্ষাতের শুভলগ্ন—যেদিন আকাশ বাতাস পলাশ, শিমূল আকুল হয়ে রচনা করেছিল বসন্তের উৎসব। সে ছিল যৌবনের প্রথম উন্মেষ। সে-দিনের ফুলওয়ারীর ডালার চাঁপাফুলের গন্ধটা অবধি এখনও অনুভবে আসে খুদাবক্সের। এই পোষাক বুঝি সে দিনও পরেছিল মোতি।

খুদাবক্স বলে,—সে দিন কিন্তু চুল খোলা ছিল তোমার আর গলায় ছিল মুক্তার হার। মনে আছে?

তার একাগ্র দৃষ্টির সামনে মোতি যেন গলে গলে যায়। ভ্রমর এসে বসে উড়ে চলে গেলে যেমন কাঁপে গোলাপ, তেমনি থর থর কাঁপে মোতি। বিভ্রান্ত হয়ে যায় দৃষ্টি। একটু হেসে আশ্বস্ত করে খুদাবক্স। বলে—আরো এক কথা বলি?

—বলো।

কৌতুকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ নীল চোখ। খুদাবক্স বলে—তোমার কি আরো এক কথা স্মরণ হয়?

—কোন্ কথা?

—যে এক নজরের আঘাতেই ঘায়েল করেছিলে? আর সেই দিন থেকেই তো বান্দা তোমার কয়েদী।

—জী, বলে মিষ্টি হেসে এই বন্দীকে স্বীকার করে নিলে মোতি। তারপর কারুকাজ করা কাশ্মীরি পেটি থেকে এনে দেয় লাল মখ্‌মলের ওপর সোনালী জরীর কল্কা বসানো একটি আঙিয়া। বলে—ছয়মাস ধরে এতে কাজ করেছি নিজের হাতে।

নিজের হাতে মোতি আঙিয়া পরিয়ে দেয় খুদাবক্সকে। দুই

চোখে তারিফ করে চপল হেসে। সত্যিই চমৎকার মানিয়েছে। মোতিকে কাছে টেনে আনে খুদাবক্স। আয়না থেকে জালিকাজের ঢাকনা তুলে দেয়। ছায়া পড়ে দু'জনের। যৌবন ও প্রেম— পাশাপাশি। সেই ছায়া বুকে ধরে বুঝি ধন্য হয় কাঁচের আয়না! দু'খানা মুখেই স্বপ্ন আজ যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। মোতি বলে— কাল এই সময় কোথায় ছিলে খুদাবক্স!

—কাল ছিলাম এতক্ষণ নদীর জলে, পাথরে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবছিলাম। তারপর একটু থেমে বলে— আর তুমি?

—আমি!—শয্যা পেতেছিলাম পাথরেই। কিন্তু নদী ছিল না, আকাশ ছিল না, কিছুই ছিল না!

মেঘ ঢেকে দেয় চাঁদ। মোতির মুখখানাকে আড়াল করে নামে খুদাবক্সের মুখ।

—মোতি!

—বলো খুদাবক্স!

—কালকের কথা থাক। তোমার ভালো লাগবে না।

—আর তোমার?

—আমারও না। আমি বুঝি বর্তমান,—এই এখন, এই তুমি আর আমি।

—আর কেউ নেই?

—কিছু নেই।

হৃৎপিণ্ড যেন কথা বলে কানে কানে। পাশের ঘরে যায় মোতি খুদাবক্সকে পথ দেখিয়ে।

গালিচার দু'পাশে দুটি মোমবাতি জ্বেলেছে মোতি। মাঝখানে রেখেছে সাদা রেশমী সুতোর জালিকাজের রুমালঢাকা কয়েকখানা রেকাবি। রূপোর সোরাইয়ে সরবৎ। চোখে তারিফ করে অবাক মানে খুদাবক্স। একটু হাসিও পায়। বলে,—গত ক'মাস আমরা কি খেয়েছি জানো? কিছু আলু মিলেছে কোনদিন তো খুব সৌভাগ্য মেনেছি। রুটির আটা মিলেছে তো আলু মেলেনি। শিকার মিলেছে তো রান্নার বাসন নেই। আবার তিনদিন বাদে প্রথম ক'টা রাঙাআলু যদি বা পাওয়া গেল তো খাবার ফুরসৎ

হলো না। দুশমণের ফৌজ আসছে শুনে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু এ কি করেছ মোতি? এত কি আয়োজন করেছ?

—কি আর করতে পেরেছি! মনে মনে মোতি ভাবে তোমার জন্যে আমার কোন আয়োজনই তো যথেষ্ট নয় খুদাবক্স। আমার আর কি ক্ষমতা? সমস্ত দুনিয়ার ভাণ্ডারও যদি এনে দেয় কেউ, তবু তো আমার মন মানবে না যে যথেষ্ট হয়েছে।

'বড় ভাগ সে সজন পাওয়ে',বড় ভাগ্য তার যে প্রিয় এসেছে ঘরে। তাই সযত্নে সেবা করে মোতি। ধীরে সরবৎ ঢেলে পেয়ালা এগিয়ে দেয়। ফল ও বাদামের রেকাবি থেকে ঢাকনা তুলে নেয়। গরমজলের বাটি এগিয়ে দেয় হাত ধোবার জন্যে। মোতিকে দেখে তার গ্রামের ঘরে সামান্য আয়োজন নিয়ে সেবা-নিরত মায়ের কথা মনে পড়ে খুদাবক্সের। মোতি তাকে এমনি করে যত্ন করবে জানলে কত নিশ্চিন্ত হতে পারতো তার মা সেই কথাই ভাবে সে। গভীর মমতা জাগে মনে, ভাবে কত কষ্ট করে এই দুঃসময়ে এই সব সংগ্রহ করেছে মোতি।

ঘরের জানলা খুলে দিতে হু হু করে পাহাড় প্রান্তর ধোয়া চৈতালী বাতাস আসে। বাতি নিভে যায় শামাদানে। ভাগ্যিস আকাশে ক্ষীণ লেখায় চাঁদ ছিল, তাই ঘরের অন্ধকারটা তরল হয়ে আবছায়া রচনা করে।

নিচু জানলার পাশেই শয্যা। নিচু পালঙ্কে কোমল আস্তরণ। কারুকার্য খচিত রেশমী উপাধান। ক্লান্ত দেহটাকে টান করে খুদাবক্স। তার পাশেই বসে পড়ে মোতি। বাতাসের স্পর্শে মোতির চুল ও পোশাক থেকে আতরের সুবাস আসে।

নরমগলায় অনুমতি চায় মোতি—একটু আরাম করে দেবো খুদাবক্স—পায়ে হাত বুলিয়ে দিই?

বারণ করে খুদাবক্স। একটু পরে মোতি বলে—একটা কথা বলবো?

—বলো।

সকরুণ মিনতি মোতির কণ্ঠে—আজ যদি না বলি তো আর কোনওদিন হয়তো বলাই হবে না।

—বলো।

—তুমি আমায় মাপ করেছ তো? খুদাবক্সের পায়ের ওপর হাতখানা রাখে মোতি। কণ্ঠস্বরে মনে হয় অশ্রুর আভাস আছে নয়নে।

খুদাবক্স বলে—এদিকে তাকাও তো মোতি।

মোতি তাকায়। স্বল্প জ্যোৎস্নার আলোতে মোতির আঁখি-পল্লবে অশ্রুর ছোঁয়া দেখা যায়। ধীর, গম্ভীর অথচ কোমল মমতা-ভরা কণ্ঠে খুদাবক্স বলে—তোমাকেও আমার কিছু বলবার আছে মোতি। তুমি কি বিশ্বাস করো আমি সেই কথা মনে করে রেখেছি? তবে হ্যাঁ, তখন বড় আঘাত লেগেছিল, মনে হয়েছিল সহ্য করতে পারবো না। কিন্তু তোমাকে তো আমার বাবার কথা অনেক বলেছি। আর জানো তো আমি কিষাণ। জমি যখন বছরের পর বছর মুখ ফিরিয়ে থাকে তখন তাকে স্নিগ্ধ করি, সে ফৈলাদ করে, ফুলফল দেয়, নয়তো ছাড়ি না। আঘাত দিয়েছিলে তবু তো তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না আমি। ওস্তাদের প্রথম খত্ মিলবার আগেই আমার মন তৈরি হয়েছিল মোতি। আর কাউকে তোমার জায়গায় বসাতে পারতাম না। তোমাকে একবার ভালোবেসে সেই মন নিয়ে কোন খেলাও করতে পারতাম না। অনেক কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারি না মোতি, তুমি জানো। তবুও সবসময় আমি জানতাম তুমি আমাকে ঠিক বুঝবে, ক্ষমা করবে, অপেক্ষা করবে। কোথা থেকে পেলাম সে বিশ্বাস বলো! তুমিই তো দিয়েছিলে। বড় অদ্ভুত মন আমার মোতি, একবারই ভালোবাসতে পারি। আর সেই কথাই ধেয়ান হয়ে থাকে। তাই নিয়েই তো জীবন কেটে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুদাবক্স আবার বলে—মোতি, তুমি নিশ্চয়ই ভাবো আমি কালকের কথা ভাবি না। হ্যাঁ, সত্যি কোন্ ভবিষ্যৎ ভাববো বলো! গত কয়বছরে কত মৃত্যু, কত দুঃখ, কত শোক দেখলাম। নিজের জীবনেই দেখলাম কত চড়াই উতরাই। হিসেব করে বাঁচলাম যখন, তখনই সব বে-হিসেব হয়ে উড়ে গেল আঁধির মুখে। যেখানে কোন প্রত্যাশাই ছিল না, সেখানেই সব আশা ছাপিয়ে

সৌভাগ্যের পেয়ালা উপ্‌ছে ভরে উঠলো। আর তাই দেখে মনে হয়, সবই জীবনের মুবারক, সবই সকৃতজ্ঞ হয়ে নিতে হবে।

খুদাবক্সের কথার মধ্যে তার সমস্ত জীবনের জিজ্ঞাসা যেন খুঁজে পায় মোতি। মরমেও তো সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনে। খুদাবক্স আরো কথা বলে। ব্যাকুলতা ভরা তার কণ্ঠ। যেন এই কথাগুলি আজ রাতেই বলতে হবে। সেইজন্যেই বুঝি চাঁদ উঠেছে মেঘের ওড়নীর অবগুণ্ঠন সরিয়ে, আর তাই ঝড়ো বাতাস মুঠো মুঠো জুঁইফুলের গন্ধ এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

খুদাবক্স বলে—আজ রাতে যে ইংরেজ ফৌজ কুড়ি মাইল দূরে আছে, কালই হয়তো সে এসে পড়বে কেল্লার সামনে। তখন তো এইসব কথা বলবার সময় পাবো না মোতি। তাই বলি, তুমি আর সে-সব পুরনো কথা বলো না।

—আচ্ছা খুদাবক্স, তুমি অংরেজ ফৌজ নিশ্চয় দেখেছ।

একটু হাসে খুদাবক্স। বলে—একবার তো দেখেছিলাম ছোটবেলায়।

তার মুখে হাত চাপা দেয় মোতি। বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে তার। মোতির হাতখানা টেনে নিয়ে ডান কাঁধের ওপর রাখে খুদাবক্স। বলে—আঁধারে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু এইখানে একটা ক্ষত চিহ্ন আছে—কানপুরে গুলী খেয়েছিলাম।

কোমল মমতায় হাত বুলিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স বলে—যাক, সে কথা থাক মোতি, এখন কি সেই কথা শোনবার সময়?

খুদাবক্সের বাহুতে হেলান দেয় মোতি। মোতিকে বাহুতে বন্দী করে খুদাবক্স। একেবারে বক্ষলীন করে তার হৃৎস্পন্দন শোনে। এর বুকের দোলা লেগে ওর হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হয়। কেল্লা থেকে কামানের পাল্লা ঠিক করবার ফাঁকা আওয়াজ আসে। রাতের ঘন্টিতে যারা চৌকি দেবে সেই সব রিসালা, সিপাহী ও তোফাখানার লোকেরা চলাচল করে সদর রাস্তা দিয়ে। ঘণ্টা বেজে ঘোষণা করে রাত দুটো।

বাইরের দুনিয়াটাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। বুকের ভেতর মহা বুভুক্ষায় তরঙ্গায়িত হয় প্রেম। হাজারটা

ঢেউয়ে খুদাবক্সের বুকে আঘাত করে। অভূতপূর্ব্ব বেদনা ও আবেগের এক মিশ্রতরঙ্গে হৃদয় উদ্বেল হয়। রক্ত হয়ে ওঠে চঞ্চল। তার বহুদিনের প্রতীক্ষা এই চরম বেদনা ও আনন্দের মুহূর্তে সার্থক হয়। আসন্ন যুদ্ধের পটভূমিকায় প্রিয়াকে আপন করে নিতে চায় পুরুষ। এক পরম সময়। চরম শুভলগ্ন। দুরন্ত আবেগে খুদাবক্স বলে—মোতি, মোতি, মোতি!

একগাছি ফুলের মালার মতোই বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে মোতি। কথা বলে না।

ভাষাহারা হয়ে যায় রাত।

ঈষৎ হেলে পড়ে চাঁদ। বড় যত্নে খুদাবক্সের কপাল থেকে চূর্ণকুন্তল সরিয়ে দেয় মোতি। খুদাবক্স সপ্রেম দৃষ্টিতে চায়। বলে—কি ভাবছো?

—কিছু নয় তো!

—মোতি!

—কি?

—তুমি গান গাইতে?

—হ্যাঁ।

—কোন্ গান?

—আমি বলতে পারি না, লজ্জা করে।

—আমি শুনতে চাই।

—বড় না-ছোড় তুমি খুদাবক্স, বড় তোমার জেদ।

—হ্যাঁ জী, কমজেদী হলে তো তোমার সঙ্গে পারতাম না। কিন্তু তুমিই কি কম? একটু হাসে মোতি। হাসিতে অপরূপ লাবণ্য। সত্যিই যেন মুক্তা ঝরে পড়ে। আবছা চাঁদের আলো। রাজকন্যার মতোই দেখায় মোতিকে। হাতের বাঁধনের মধ্যেই রয়েছে তবু মনে হয় স্বপ্নলোকের কন্যা। খুদাবক্স বলে—গান শোনাও মোতি।

—তোমার স্মরণে আসে খুদাবক্স?

—নিশ্চয়।

—সেই গান গাই?

—না মোতি।

—তবে চন্দ্রভানজীর উপহার সেই গান গাইবো ?

—সেই অন্ধমেয়ের গান ? যাকে ইনাম করেছিলে ?

—কেমন করে জানলে ?

—ওস্তাদ বলেছেন। বড় অন্যায় করেছি মোতি, আর একবার মাপ চেয়েছিলাম মনে পড়ে ? সেই চাঁদনী রাত, সেই হোলিতে হল্লা হচ্ছে ?

সব মনে পড়ে মোতির। শুধু মানুষটাই কাছে ছিল না। কিন্তু প্রিয়-স্মৃতিগুলিকে বিনিসূতোর মালায় গেঁথে বিরহের দিনে তস্‌বি'র মতো করে পরেছে মোতি। উত্তর দেয় না মোতি। গুরুজীকে স্মরণ করে গান ধরে—তেরে কারণ ম্যয় সজন্ যোগান্ বন জাউ। মনে হয় স্মিত নয়নে তাকে আশীর্বাদ করছেন গুরু চন্দ্রভান।

খুদাবক্স শোনে একমনে। বলে—এই গান তুমি গাইতে মোতি ?

সম্মতি জানায় মোতি। ব্যথা পায় খুদাবক্স। সস্নেহে মোতির কপালের চুল সরিয়ে দেয়। স্বেদাক্ত কপাল মুছে দেয়। বলে—যোগান্ কেন হবে মোতি ? আমি তো তোমারই ছিলাম, একদিনের জন্যেও তোমাকে বিস্মৃত হইনি।

বিশ্বাস করে মোতি পরমসুখে চুপ করে থাকে। খুদাবক্স বলে—একটু ঘুমোও তো মোতি।

বাধ্য মেয়ের মতো চোখ বোঁজে মোতি। জানলায় এসে দাঁড়ায় খুদাবক্স। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা মুখে চোখে নিতে নিতে কৃতজ্ঞতা জানায় পরম করুণাময়ের কাছে।

এতক্ষণে ঘুমিয়েছে মোতি। নিঃশ্বাস পড়ছে সমতালে। নির্মল সুন্দর মুখে জেগে আছে প্রশান্তি। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় খুদাবক্স। কানে কানে বলে—মোতি, এবার রিসালা হল্ট ছেড়ে আমার গাঁয়ে চলে যাবো। সেখানে তোমাকে ঘর দেবো আমি আর ভালোবাসবো অনেক দিন ধরে।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলো মোতি। বুঝি সাড়াও দিলো একটু। তারপর তার পাশেই শুয়ে পড়লো খুদাবক্স।

হঠাৎ মোতির ঘুম ভেঙে গিয়েছে। পাশে খুদাবক্সকে ডাকলে—শুনছো, খুদাবক্স—খুদাবক্স—

খুদাবক্স ধড়ফড় করে উঠে বসলো। বললে—আমায় ডাকছো—

মোতি বললে—কে ডাকছে না?

—কই?

খুদাবক্স কান পেতে রইল। বাইরে কে যেন ডাকছে তার নাম ধরে।

খুদাবক্স উঠে দরজা খুলে দিলে।

সামনে দাঁড়িয়ে বাহ্‌রাম।

খুদাবক্স বললে—কী খবর বাহ্‌রাম?

বাহ্‌রাম বললে—সব বেহিসেব হয়ে গেল ভাই, ঘোস এই খত্ পাঠিয়েছেন—

খুদাবক্স খত্‌টা নিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু একটুখানি পড়েই বিচলিত হয়ে উঠলো।

মোতি অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বললে—কী খবর খুদাবক্স? কোনও খারাপ খবর কিছু নেই তো!

খুদাবক্সের তখন আর কথা বলবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি কুর্তাটা গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিলে।

বললে—মোতি, তুমিও তৈরি হয়ে নাও! ইংরেজের কামান আমাদের ওপর গোলা ছুঁড়বার জন্য তৈরি হয়েছে। তাদের আক্রমণ করবার তোড়-জোড় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—ঘোস ক্ষমা চেয়ে শিগগির যেতে চিঠি লিখেছে—আমাদের ছুটি না-মঞ্জুর হয়েছে—

বাহ্‌রাম ততক্ষণে চলে গিয়েছে। খুদাবক্সও চলে যাচ্ছিল।

মোতি ডাকলো—খুদাবক্স—

খুদাবক্স একবার পিছন ফিরলো। বললে—এখন আর কথা বলবার সময় নেই মোতি—

মোতি আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু খুদাবক্স তখন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। মোতি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিজের বিছানার কাছে ফিরে এল। তারপর কী ভেবে সেই বিছানাতেই মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

বুরুজে দাঁড়িয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছেন ঘোস, সঙ্গে

রঘুনাথ সিং এবং লালাভাও। খুদাবক্স খালি চোখেই, কপালে হাত রেখে নজর করবার চেষ্টা করে। জোকানবাগের পেছনে নজর চলে না। উঁচু নিচু জমি। ক্যাণ্টনমেণ্ট ও দগ্ধ স্টারফোর্ট ছাড়িয়ে, অনেকদূর এগিয়ে আসছে ইংরাজ ফৌজ। উঁচু নিচু জমিতে কখনো তাদের দেখা যাচ্ছে, কখনো যাচ্ছে না। পুতুলের মতো ছোট ছোট দেখাচ্ছে। বন্দুকের মাথার সঙ্গীন ঝলকে উঠেছে। রঘুনাথ সিং খুদাবক্সকে দূরবীনটা দেন। নজর করে দেখে সে-ও। ঘৌস বলেন—মাঝখানে যে বুড়ো মতন এক সাহেবকে দেখছো তিনিই সার হিউরোজ। তাঁর হাতেও দূরবীন রয়েছে, দেখেছো? খুব নজর করছেন কেল্লার দিকে। দেখতে চেষ্টা করছেন।

দূরবীন নামিয়ে ঘৌস বলেন—ঝাণ্ডা উঁচা করো!

টকটকে লাল রেশমের ঝাণ্ডা উঁচু করে বাঁধা হয়। সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে সেই ঝাণ্ডা উড়তে থাকে নীল আকাশে। ঘৌস বলেন—দেখতে হয় তো ভালো করে দেখুক।

—ফৌজ কত হবে ওস্তাদজী?

হঠাৎ চমকে ওঠে সকলে। কখন সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়েছেন রাণী! প্রভাতে পূজা অন্তে, লাল রেশমের পাড়বিহীন শাড়ি পরেছেন মরাঠি পদ্ধতিতে। সিক্ত কেশ কবরীবদ্ধ, কপালে চন্দন, কণ্ঠে মুক্তার একাবলী, হাতে হীরার কঙ্কণ, পায়ে সাদা নাগরা। দূরবীনখানা নিয়ে নজর করেন। বলেন—কত হবে বলে মনে করেন?

ঘৌস বলেন—রোজের সঙ্গে আসছে দু'নম্বর ব্রিগেড। এক-নম্বর ব্রিগেড আসছে চন্দেরী ঘুরে। ভূপালের বেগম সিকান্দারের সাতশ' ধরলে পুরা ফৌজ নয়হাজারের কাছাকাছি যাবে।

—আমারও তাই আন্দাজ। কিন্তু কি জানেন ঘৌস, আমি যেমন ওদের খবর পাচ্ছি, ওরাও তো আমাদের পুরা খবর পেয়ে গিয়েছে?

—এ আফসোসের কিনারা কোথায় সরকার! গোপাল রাওকে তাহলে কয়েদ করতে হয়।

—জরুর। বাণপুরওয়ালা রাজার সঙ্গে দেখা না হলে তো গোপালরাওয়ের খবরগুলোর ঠিক বেঠিক যাচাই করতে পারবো না।

—আর চন্দন সিং ?

—তার কিনারা তো এখনই করবো। লড়াই সামনে নিয়েও যে ফিরিঙ্গীর জন্যে এইরকম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তার এক ফোঁটা খুনও মাটিতে না ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। পারবেন ?

ঘৌস বললেন—জো হুকুম সরকার ?

রাণী আরও বললেন—সেই খুন যেখানে পড়বে, সেখানে মাটি অবধি বেইমান হয়ে যাবে। ধরতীর গা জ্বলে যাবে। ঘৃণা ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে রাণীর মুখ।

সবাই চুপ করে থাকে। আবার সামনের দিকে তাকান রাণী। দেখতে পান ইংরেজ ফৌজ তখন কেল্লার প্রায় তিনমাইল দূরে থেমে ছাউনি ফেলছে। ইংরেজ অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে তত্ত্বাবধান করছেন। চমৎকার শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজকর্ম চলেছে।

প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে বেলা গড়িয়ে যায়। তিনটের সময় প্রথম গর্জন করে ওঠে ইংরেজ কামান। কেল্লা থেকে জবাব দেন ঘৌস।

দক্ষিণবুরুজের ভার কারো ওপর ছাড়েন না ঘৌস। 'ঘনগর্জ'-এর পাল্লা ঠিক করতে একটু দেরি হয়েছিল সত্য। তারপর বড় নৈপুণ্যে কামান চালনা করেন তিনি। মোতি তাঁকে বারুদ আর গোলা যুগিয়ে দেয়। সঁইয়ার গেটে রয়েছে খুদাবক্স। সেই দিকে চেয়ে ঘৌস সহসা বললেন—অনেক জায়গায় লড়ে এসেছে ও, জান্ বাঁচিয়ে ঠিক লড়তে পারবে।

সঁইয়ার গেটেই বসেছিল খুদাবক্স। কিন্তু ইংরেজ ব্যাটারী পড়লো সাগর দরোজার সামনে। অগত্যা বিকেলে সাগর দরোজাতেই চলে যায় খুদাবক্স।

সন্ধ্যা সমাসন্ন। পথের ধারের বাতিদানে জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিয়ে চলে যায় আসাবরদার। লড়াই চলবে রাতভোর। সন্ধ্যার সময়ে চৌকিতে চৌকিতে যুদ্ধরত সৈনিক ও গোলন্দাজদের জন্য খাবার আসে কেল্লা থেকে। ভারীরা বাঁকে খাবার বয়ে আনে।

ইংরেজ ব্যাটারীতে বাতি নেই। তাই নিশানা ঠিক করবার

সুবিধে হয় না। চৌকিতে বসে চৌখুপি দিয়ে দেখে খুদাবক্স। প্রতিপক্ষ নীরব। বুঝি তৈরি হচ্ছে আগামী সকালের জন্যে।

আকাশ কথা কয় তারার ভাষায়। লুকোচুরি খেলে মেঘে আর চাঁদে। সাগর দরোজার ব্যাটারীতে বসে খুদাবক্স ভাবে। কোথায় কোন লগ্নে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল এক বন-বিহগীর সঙ্গে, আজ যখন সে আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় এ-কোন্ দুর্যোগ! আকাশের দিকে চোখ মেলে স্থির হয়ে বসে থাকে খুদাবক্স। তার যেন কোনও চেতনা নেই। সে যেন এই ক'দিনেই স্থবির হয়ে গিয়েছে। কবে লড়াই ফতে হবে, কবে আবার জিন্দিগী সফল হবে, কবে মোতিকে কাছে রেখে দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দেবে—কে জানে! এবার আর এখানে নয়, এবার চলে যাবে নিজের গাঁয়ে। একটা ছোট কুঁড়ে ঘর, একটা ছোট ক্ষেত—আর কেবল সে আর মোতি। সেখানে আর কেউ নেই, আর কোনও কিছু নেই!

মনে পড়ে বহুদিন আগে মোতি বলেছিল—একদিন আমায় হয়তো ভুলে যাবে খুদাবক্স—

মোতিকে ভোলা কি অত সহজ! যদি ভুলতে পারতো! জওয়ানীর দিনগুলো বৃথাই চলে গিয়েছে খুদাবক্সের। কিন্তু খুদাবক্সের আছে কি! মোতির তুলনায় তার তো কিছুই নেই। তবু মোতি তার মধ্যে কী পেয়েছে!

রাত্রে মোতি জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কোনও আফসোস নেই তো খুদাবক্স—

খুদাবক্স বলেছিল—আফসোস! আফসোস শুধু এই যে, তোমাকে সুখী করতে পারলাম না—

মোতি বলেছিল—আমার সুখের এখন শেষ নেই খুদাবক্স—

বলতে বলতে চোখ দুটো ছল ছল করে' উঠলো মোতির।

একটু পরে আবার বলেছিল—বড় ভালো লাগছে খুদাবক্স বাঁচতে—

খুদাবক্স বলেছিল—এমন সময় আর হয়তো আসবে না জীবনে।

মোতি বলেছিল—ও কথা বলো না—

খুদাবক্স বলেছিল—কেন?

—আমার অনেক দিনের আশা আজ মিটেছে—অনেক দুঃখের আজ অবসান হয়েছে—আমি যে বেঁচে থাকতে চাই—

—বেঁচেই থাকবে তুমি মোতি, আর কখনো বিচ্ছেদ হবে না আমাদের, আমার মধ্যে তুমি রইলে, আর তোমার মধ্যেও আমি রইলাম—

—আরো কথা বলো খুদাবক্স, শুনতে ভালো লাগছে!

—তুমি বলো, আমি শুনি—

মোতি বলেছিল—তুম ভয়ে মোতি, ম্যঁয় ভয়ে ধাগা, তুম ভয়ে সোনা ম্যঁয় তো সুহাগা—

খুদাবক্স অনেকক্ষণ পরে বলেছিল—এবার তোমার নিজের কথা কিছু বলো মোতি—

মোতি বলেছিল—নিজের কথা সব ফুরিয়ে গিয়েছে আজ, তোমার মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি,—আমার আর কিছুই নেই নিজের বলতে···

অন্ধকার ঘর। অনিশ্চিত আগামীকাল। তবু সেই অন্ধকারেই তাদের প্রেম একান্ত মুখর হয়ে উঠেছিল। মোতিকে বুকের কাছে ধরে রেখেছিল খুদাবক্স অনেকক্ষণ। মোতির বুকের হৃৎস্পন্দন শুনেছিল, আর সেই সঙ্গে তার শরীরে এক অনাস্বাদিত পুলক ও রোমাঞ্চের শিহরণ জেগেছিল।

কেল্লার ওপাশ থেকে ইংরেজের ব্যাটারী বুঝি আবার গর্জন করে উঠলো।

প্রত্যূষ না হতেই পুনরায় দিকে দিকে কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়। সাগর গেটে নিজের চৌকিতে বসে খুদাবক্স চৌখুপি দিয়ে দেখে তার দরোজার অনতিদূরে সুউচ্চ এক ইংরেজ ব্যাটারী। যতদূর চোখে পড়ে কেবল ব্যাটারী ও মোর্চা। কাতারে কাতারে সু-সন্নিবেশিত ইংরেজ ফৌজ।

কামানের পাল্লা ঠিক করে খুদাবক্স। সারি সারি সৈন্য প্রাচীরের চৌখুপিগুলোতে বন্দুক সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভালো করে আলো না ফুটতেই কেল্লা থেকে ঘোসের হাতে গর্জে ওঠে ঘনগর্জ। সঙ্কেত মেনে খুদাবক্সও পলতেটায় অগ্নিসঞ্চার করে।

গর্জে ওঠে নুলদার। ইংরেজ ব্যাটারীর সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে সারাদিন ধরে। সন্ধ্যারমুখে থেমে যায় ইংরেজ ব্যাটারী।

বাঁ হাতখানা জখম হয়েছে খুদাবক্সের। অত্যন্ত পরিশ্রমে ডান কাঁধও যেন আবার ব্যথা করছে। আহত হাতখানা বেঁধে দেয় বাহ্‌রাম। অতর্কিতে গর্জন করে ওঠে শত্রুপক্ষের কামান। খুদাবক্স দৌড়ে নিজের চৌকিতে যায়। আগুনের মতো লাল গোলা এসে পড়ে শহরে। আগুন জ্বলে ওঠে। আহত নরনারীর আকুল আর্তনাদের সঙ্গে মেশে ঘোড়ার হ্রেষা রব। চৌকিটা খালি। তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে খুদাবক্সের সহকারী।

চৌকিতে বসে নিশানা ঠিক করে খুদাবক্স। স্থিরলক্ষ্য হয়ে মশাল জ্বালিয়ে কামানে অগ্নিসংযোগ করে। হাতে হাতে গোলা যুগিয়ে দেয় বাহ্‌রাম। সাগর গেটের কামানের হিম্মৎ দেখে লছ্‌মী ও সঁইয়ার গেটেরও সাময়িক বিভ্রান্তি কেটে যায়। কেল্লা থেকে ঘনগর্জ, গরনালা আর কড়কবিজলীর ভীমগর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপতে থাকে। ইংরেজ পক্ষের কামানের গোলা উড়ে এসে পড়ে। তারপর ক্রমে নিরুত্তর হয়ে আসে ইংরেজ ব্যাটারী। এই সুযোগ। খুদাবক্স হিংস্র একাগ্রতায় গোলা ছোঁড়ে একটার পর একটা। ওদিকে কেল্লা থেকে এল উল্লাসের চিৎকার। ঘোসের গোলার আঘাতে শঙ্কর মন্দিরের ইংরেজ ব্যাটারীও ধ্বংস হয়েছে। পিছু হটতে লাগল ইংরেজ ফৌজ।

তপ্ত কামান। ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। সেই রাতেও নিজের চৌকি ত্যাগ করলো না কেউ। চারিপাশে তাকিয়ে নিজেদের সামরিক দুর্বলতা ও অসুবিধার কথা বুঝলো খুদাবক্স। ইংরেজরা বাইরে; তারা ভেতরে। ঘনবসতিপূর্ণ পুরনো শহর। ওদের গোলাতে এ পক্ষে মানুষ মরছে যথেষ্ট, তার ওপর আগুন লেগেও ক্ষতি হয়েছে অনেক। ঘাসে আগুন লাগলেই বিপদ বেশি। তা ছাড়া জল সরবরাহের প্রশ্নও আছে। আর সুদক্ষ গোলন্দাজের যে কত অভাব তা নিজেই সে একান্তভাবে অনুভব করছে।

রাত বারোটার পর চৌকিতে চৌকিতে খাবার পৌঁছতে লাগল।

হঠাৎ একবার এক নিমেষের জন্যে যেন মোতিকে দেখা গেল।

বালক সেনানীর মতো আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে চলেছে। একবার মনে হলো ডাকবে নাকি মোতিকে। যেন কতকাল দেখা হয়নি। এমন করে এত তীব্রভাবে মোতির সান্নিধ্য আর কখনও যেন কামনা করেনি সে। কিন্তু ততক্ষণে মোতি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তারপর খুদাবক্স আস্তে আস্তে চলতে আরম্ভ করে সঁইয়ার গেটের দিকে। ততক্ষণে কেল্লা থেকে পুনঃ ঘনগর্জ-এর গম্ভীর নিনাদ আসছে, গরনালার তীব্র শীৎকার শোনা যাচ্ছে। এবার বিপক্ষের মর্টার ও হাউটজার গর্জন শুরু করলো।

কোথা দিয়ে যে এক সপ্তাহ কেটে গেল! এখন যেন বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের ফল কি হবে না-হবে।

জ্বলন্ত দেশপ্রেম, নরনারীর অপূর্ব আত্মত্যাগ, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে সৈনিকের প্রাণপণ যুদ্ধোত্যম সব কিছুই বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে। নগরীর পাষাণ প্রাকারে ফাটল ধরেছে। ঘনবসতি অঞ্চলের বাড়িগুলি জ্বলে গিয়েছে।

প্রভাতে স্নান সেরে গম্ভীর মুখে নিজের চৌকিতে এলেন ঘোস। তাঁর অপেক্ষাতেই বসে ছিল মোতি। এবার উঠে দাঁড়াল। তাকেও একবার ঘরে যেতে হবে। নিচে অপেক্ষা করছিল খুদাবক্স।

তু'জনে চলতে লাগল। পথ আজ শ্রী-হীন, বিধ্বস্ত। চতুর্দিকে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। প্রভাত, তবু পাখী ডাকছে না, শিশু কাঁদছে না, পরিত্যক্ত বিপণি, পথচারী সব চুপচাপ। রোদনস্ফীত আরক্ত মুখে কোন সত্যোবিধবা একমাত্র পুত্রকে কোমরবন্ধ্ বেঁধে দিচ্ছে—দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর তার। কোথাও কম্বলে মুড়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সৈনিকরা—রাস্তার পাথরে তাদের জুতোর খট্ খট্ শব্দ বুঝি নিদারুণ অমঙ্গলের পূর্বাভাষ ঘোষণা করছে। দগ্ধ গৃহের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে গৃহী—পত্নী ও পুত্র কন্যারা স্তূপ থেকে গৃহস্থালীর জিনিষপত্র বের করতে চেষ্টা করছে। কোথাও আহত অশ্ব মরে পড়ে আছে গলা বাড়িয়ে—তার নাগালের বাইরে কুয়োর পাড়ে জল জমে আছে, সম্ভবতঃ তৃষ্ণাতুর হয়েই সে এসেছিল। একপাশে সওয়াররা ঘোড়ার লাগাম ধরে জমায়েত্

হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ লৌহশিল্পী ঘোড়ার নাল ঠুকছে—ঠক্—ঠক্—ঠক্!

দেখতে দেখতে কুর্তার দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলে খুদাবক্স। একটা শঙ্কার বোধ যেন মনকে আচ্ছন্ন করছে। আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনায় বুঝি অবসন্ন হয়ে পড়েছে মন। অথচ মনের এ বিষণ্ণ ভাবটাও ভালো লাগে না। চেয়ে দেখলে মোতিকে। তারই মতো চিন্তায় ডুবে মাথা নামিয়ে পথ চলেছে মোতি।

ধীরে ধীরে তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো। ওপরে উঠতে একটা কুকুর ছুটে বেরিয়ে গেল। চমকে উঠলো মোতি!

ঘরে ঢুকে মোতি বললে—তুমি আগে স্নান করে এসো।

স্নান শেষ করে ধোপ-দুরস্ত সুন্দর সাদা ধব্ধবে পোষাক পরে খুদাবক্স। মোতির জন্যে বেছে রাখে সিঁদুরে লাল রঙের রেশমের ওপর সোনালী সুতোয় হংসমিথুন আঁকা একটি নতুন পোষাক।

জাফরির ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে। চিত্রবিচিত্র আলপনা ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়। ভাষার অতীত এক গভীর অনুভূতি নিবিড় করে তোলে পরিবেশ। নতুন পোষাকে মোতিকে অনিমিষে চেয়ে দেখে খুদাবক্স। বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম ঊষার মুহূর্তে, একদিন এক নারী আর এক পুরুষ এমনি করেই মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল—পরস্পরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে। কিছুক্ষণের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল দু'জনে।

খুদাবক্স আত্মস্থ হয়ে হেসে বলে—কথা বলছ না যে?

—কি বলবো! করুণ হয়ে যায় মোতির মুখ। অসহায় দেখায় তাকে।

খুদাবক্স জিজ্ঞেস করে—ভয় করছে?

আজ আর 'না' বলে না মোতি। চোখে স্বল্প অশ্রুর আভাস চিক্‌মিক করে। ঠোঁট একটু কাঁপে। খুদাবক্স বলে—আজ কি ভয় করবার দিন মোতি? কি শুভ লগ্ন বলো তো? আমার তো মনে হচ্ছে আর এক হোলির দিন পাঠিয়ে দিয়েছেন মালিক—যে-দিন তোমার আর আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, মনে নেই তোমার?

মোতির চোখ হতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু মুক্তার মতো ঝরে পড়ে। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে খুদাবক্সেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। তারপর অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে মুখে একটু হাসির আভাস এনে বলে—আর তো দেরি করা চলে না মোতি।

খুদাবক্সের কথায় মোতি মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে। তারপর দু'জনে কোমরবন্ধ্ বাঁধে। নাগরা পরে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মোতির মুরেঠা বেঁধে দেয় খুদাবক্স। খুদাবক্সের কোমরে পিস্তলের খাপটা লাগিয়ে দেয় মোতি। নাগরা জোড়া মুছে দেয়। সিঁড়ি দিয়ে নামে দু'জনে।

পথ যেখানে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে খুদাবক্স বলে—বিশ্বাস হারিয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না।

—কভি নহীঁ, বলে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে মাথা সোজা করে মোতি। তারপর ঘুরে গিয়ে কেল্লার পথ ধরে। একবারও পেছনে তাকায় না।

কিছুক্ষণ সে দিকে চেয়ে থেকে খুদাবক্স মাথা নিচু করে নিজের পথ ধরে।

আ ঠা রো

অনেকক্ষণ শত্রুপক্ষ বড় নীরব। তার মানেই হুঁশিয়ারির বিশেষ প্রয়োজন। বেশ তো! সে হুঁশিয়ারই আছে। খুদাবক্স জানে সঁইয়ার গেটের বাইরে ফাটল ধরেছে। মিস্ত্রীরা কাল রাতে বাইরের ফাটল সারাতে পারেনি।

খুব শান্ত মনে হচ্ছে তার নিজেকে। বেলা ক'টা হবে? দশটার বেশি নয়। কেল্লার দিকে একবারও তাকায় না খুদাবক্স। জানে মোতি তার চৌকিতে অবিচল থাকবে।

এইরকম সময়েই সেই হোলির সকালে লছ্‌মী দরোয়াজার সামনে মোতিকে প্রথম দেখেছিল খুদাবক্স। সে প্রথম দর্শনের মাধুর্য তো আজও এতটুকু কমেনি। কত কথা, কত গান, কত

কবিতা—কিছুই মনে পড়ে না আজ খুদাবক্সের। মনে জাগে শুধু দুই অক্ষরের একটি নাম—মোতি—দীর্ঘ বিচ্ছেদ অন্তে যে প্রিয়-নাম ধরে ডাকবার আশায় তার সর্বসত্তা অধীর প্রতীক্ষায় আকুল।

কোনও অবিচার কি সে করেছে মোতির ওপরে? কোন কষ্ট কি দিয়েছে তাকে? কষ্ট দিয়েছে যত, পেয়েছেও তো তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই সেখানেও কোন ঋণই তার নেই। মোতির কাছে ঋণ থাকলেও সে ঋণ কি দিয়ে শোধ করবে খুদাবক্স? হৃদয়মন দিয়ে? কিন্তু মোতি তো আলাদা নয় তার থেকে। তা হলে সেই হৃদয়মনের পুষ্পাঞ্জলি ফিরে এসে তো তার নিজের পায়েই পড়বে। সে কি কখনও হয়? নিজের কাছে কি ঋণ শোধ করে কেউ? ক্ষমা চায়? আর এত সব করবার অবসরই বা মিলবে কখন! তার চেয়ে কিছু অপরাধ তার থাকুকই না মোতির কাছে। ক্ষমা চাইবার একটা চির-অবকাশ রয়ে যাক—সেই ভালো।

মোতি, মোতি, আর মোতি—! ঈশ্বর, কত সুন্দর করেছো এই পৃথিবী, কত প্রেম দিয়েছ মানুষের মনে, শিশুকে দিয়েছ পবিত্র সৌন্দর্য, কত মাধুরীতে সঞ্জীবিত করেছ এই আকাশ, বাতাস, মাটি! তোমার নাম করেই তাঁকে কি নতি জানাবে খুদাবক্স! মানুষ মানুষকে বলে—ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার ওপর বর্ষিত হোক। সেই ঈশ্বরকে খুদাবক্স তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নতি স্বীকার পাঠালো। হে ঈশ্বর, তোমার দিনান্তের প্রাপ্য অর্ঘ ও নির্মাল্যের স্তূপে তাকেও তুমি চিনে নিও।

তার বাবা আর মা-র কথাও স্মরণে এল খুদাবক্সের। আজ, এই মুহূর্তে, মন যখন পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে, তখনই তো প্রিয়জনকে স্মরণে আসে! আনোয়ারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখের হাসি স্মরণ করলো খুদাবক্স। স্মরণ করলো তার পিতার শেষ কথা—ভুল্‌না মৎ! মায়ের মায়ামমতা মাখানো চোখের স্নেহ দৃষ্টি মনে করলো খুদাবক্স। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো এক গোছা রুক্ষচুল, যে-চুল কোন দিন বেণীর বাঁধন মানতো না।

তার মা বাবা তো দেখলো না মোতিকে। আরো দেখলো না

তাদের খুদাবক্সের যে-জীবনটার জন্যে তাদের ভাবনাচিন্তার অবধি ছিল না, সেই জীবনটাকেই ভালোবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, বেদনা দিয়ে কি করে একেবারে ভরে দিলো মোতি!

পিতার কাছে তার সেই শপথও তো সে ভোলেনি। সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে বলেই তো এই সুযোগ এসেছে তার জীবনে। এক জীবনে সে মোতিকে পেলো, আর আজাদীর লড়াইতে অংশ গ্রহণ করতে পেলো,—এমন করে কতজন পায়? দুই পাওয়াই এক হয়ে গেল। পরিপূর্ণ হয়ে গেল তার অন্তর। অমৃতের আস্বাদ জানলো সে।

বেলা বারোটা বাজে। এমনি সময়ই ভারতীয়রা স্নানে ও আহারে যাবে। এই হলো আক্রমণের উপযুক্ত সময়। দূরবীণ নামিয়ে রাখলেন লেফ্‌টেনান্ট স্ট্রাট। মেজর রোজের হুকুম পেলেই শুরু হবে গোলাবর্ষণ। গত একঘণ্টা ধরে স্ট্রাট নজর রাখছেন সঁইয়ার গেটে। চৌখুপির আড়াল দিয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ছে সেই গৌরবর্ণ ছেলেটা একাগ্র হয়ে নিশানা ঠিক করে বসে আছে। গত আটদিন ধরে বড় জ্বালিয়েছে ছোকরা। এই কামানটা, আর কেল্লার কামান ক'টা যদি বন্ধ করে দেওয়া যেত! একি মরিয়া জেদ ওদের—হার নিশ্চিত জেনেও আত্মসমর্পণ করবে না! দূরবীণ তুলে সঁইয়ার গেটের ফাটলগুলো আবার দেখলেন স্ট্রাট। ঐ ফাটলগুলোই তাঁদের পক্ষে মস্ত ভরসার কথা। টুকরো টুকরো করে ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া যাবে পাঁচিলটা। একবার প্রবেশ করতে পারলে, তারপর? ঝাঁসী সম্পর্কে মেজর রোজের হুকুম মনে পড়লো স্ট্রাটের—বেয়নেট, গুলী অথবা ফাঁসির দড়ি, এ ছাড়া ভারতীয়দের আর কিছু যেন না মেলে।

বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পক্ষের কামানগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠলো। দুপুরের রোদে তাকানো যায় না, চোখ ঝল্‌সে যায়। গোলা উড়ে এসে পড়তে লাগল সশব্দে। কামান গর্জনে কাঁপতে লাগল আকাশ। হাহাকার উঠলো নগরীর মধ্যে।

আশেপাশে গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পরছে মৃত্যু। এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না খুদাবক্স। গোলার

জবাবে গোলা ছোঁড়ে। গরম হয়ে উঠেছে কামানটা। বালির বস্তা ফেটে গিয়ে গরম বালি ছড়িয়ে পড়েছে।

সঁইয়ার গেটের গোলা চালনা দেখে কেল্লাতে ঘনগর্জ-এর পাশে দাঁড়িয়ে ঘোসের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মোতির দিকে সগর্বে তাকান তিনি। স্বীকৃতিতে মোতিও হাসে। ঘোস মহানন্দে কামান চালান আর বলেন—আমার বেটা কি-রকম নামওয়ারী করছে আমার, শুনেছ মোতি ?

—জী—

—এই তো ছেলের যোগ্য কাজ। বলে নিপুণ হাতে আবার স্থির লক্ষ্যে গোলা ছোঁড়েন ঘোস। তপ্তবাতাস আগুনের হল্‌কা ছড়ায়। ঘোসের গোলার আঘাতে ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ইংরেজের ব্যাটারী। বিপক্ষ দলের একটা অংশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা স্থান ত্যাগ করে অন্য ব্যাটারীতে চলে যায়। মহোল্লাসে পুনর্বার গোলাবর্ষণ করেন ঘোস। বিরামহীন যুদ্ধ চলে।

বিকেলের সূর্য হেলে পড়ে। প্রতিপক্ষ অমিত তেজে গোলা নিক্ষেপ করে চলেছে। খুদাবক্সের মনে হয় তার চারদিকেই যেন একাধিক কামানের গোলা এসে ফেটে পড়ছে। হঠাৎ চৌকির পঞ্চাশ হাত দক্ষিণে একটা চৌখুপিতে গোলা লাগে। চৌখুপিটা ভেঙে একটা ফাটল হয়ে যায়। সৈনিকরা তৎপর হয়ে উঠলো। মহল থেকে তারা তুটো হাল্কা কামান টেনে আনে। একটাকে টেনে তোলে ওপরে। কামান ধরে বসে বাহ্‌রাম। তারপর সৈনিকদের একজনকে পলতে জ্বালাতে বলে নিজে কামানে অগ্নি সংযোগ করে। কামান গর্জে ওঠে।

একজোড়া কামানের পাল্টা জবাবে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিপক্ষের কামান। থেমে যায় তারা। বারুদের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে বাহ্‌রাম ও খুদাবক্স পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে। ধোঁয়া ও কালিতে কালো হয়ে গিয়েছে তু'জনেরই মুখ। কি যেন বলে বাহ্‌রাম। কানে আঙুল দিয়ে দেখায় খুদাবক্স যে সে কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশ হয়ে উঠছে রক্তরাঙা। পেছনে বাড়িগুলো গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখা

উঠছে ওপরে। কাঠ ফাটছে সশব্দে। জ্বলন্ত বাড়ির ইট কাঠ পাথর ধ্বসে পড়ছে। সহসা অতর্কিতে একটা গোলা এসে পড়ে খুদাবক্সের পেছনে। ধোঁয়া কমে গেলে সে দেখে তার সহকারী ছোকরাদের মধ্যে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। তাজা গরম রক্ত লেগে লাল হয়ে যায় খুদাবক্সের পা। কিন্তু আর একজন সহকারী-ও তো ছিল! সে কোথায়? স্তম্ভিত খুদাবক্স দেখে সে নিচু হয়ে পাঁচিল ধরে ধরে পালিয়ে যাচ্ছে।

—বেওকুফ্! খুদাবক্সের ধমকে সে থমকে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে। চিৎকার করে বলে—আমি পারবো না···আমি পারবো না···

একে নতুন সৈনিক, তার ওপর বয়সে একেবারেই কিশোর। কিন্তু দয়া দেখাবার সময় এখন নয়। পিস্তল তুলে নিশানা করলো খুদাবক্স। ভয়ে ভয়ে ফিরে এল সে। কাঁদতে কাঁদতে কম্পিত হাতে বারুদ তুলতে লাগল। হঠাৎ মোতির ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল —হুঁশিয়ার খুদাবক্স। চমকিত খুদাবক্স চেয়ে দেখে মোতি ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে আর ঘোড়াটা আতঙ্কে উচ্চ চিৎকারে ফিরে যেতে চাইছে। মোতির বাকী কথাগুলো ডুবে গেল চারপাশের কলরোলে। শুধু শেষ কথা কানে এল—অরছা দরোজায় চলেছি।

—না, যেতে হবে না! খুদাবক্সের কণ্ঠে শাসনের সুর। বললো —এখানে উঠে এসো। আমার একজন ছোকরা মরে গিয়েছে। এ ভীষণ ভয় পেয়েছে। এর হাতেই বে-কায়দায় গোলা লেগে হয় তো খুন হয়ে যাবো। তুমি এর পাশে দাঁড়াও—জলদি করো!

খুদাবক্সের নির্দেশিত স্থানে এসে দাঁড়ায় মোতি। তারপর নিপুণ হাতে গোলা তুলে দেয়। গোলা ছুঁড়েই মাথা নিচু করে দু'জন। ও-দিকে ইংরেজের হাল্কা গোলা অব্যর্থ লক্ষ্যে এসে পড়ে একটা শুকনো ঘাসের স্তূপে। হা হা করে নেচে ওঠে আগুন। পাগলা বাতাস তাকে ছড়িয়ে দেয় মাতাল খুশিতে। বন্যার মতো দুর্নিবার হয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। আতঙ্কিত ঘোড়া নাক ফুলিয়ে হ্রেষা রবে ফেলে দিতে চেষ্টা করে আরোহীকে। রেকাবে পা বেধে গিয়ে মৃত সওয়ার পাথরের রাস্তায় ঠোক্কর খায়।

—ভয় করছে না তো মোতি?

—না খুদাবক্স।

আবার ফেটে পড়ে গোলা। ভিজে বালির বস্তায় পড়ে বিফল হয়ে যায়। আগুনের আভায় দীপ্ত দেখায় খুদাবক্সের মুখ। বলে—আর কখনো আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না মোতি।

বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আসে জ্বলন্ত ঘাস। আগুনের হা-হা-হা শব্দে কারা যেন মোতির হয়ে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জবাব দেয়—না-না-না!

তপ্ত কামানে গোলা ভরে মশাল লাগায় খুদাবক্স। পাণ্ডুর দেখায় তার মুখ। দুই পাশের প্রাচীর কাঁপে। গোলাগুলো অগ্নিপিণ্ডের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে যায়। ধোঁয়া ও ধুলোতে ধূসর আকাশ। টুকরো টুকরো পাথর উড়ে পড়ছে গোলার আঘাতে। ওপাশে অরছা দরোয়াজার চৌকি থেকে আহত গোলন্দাজকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় দু'জন সিপাহী। হিন্দু-মুসলিম সিপাহীর কণ্ঠ থেকে ধ্বনি ওঠে—হর হর! দীন দীন!

মহাকাশ আচ্ছন্ন করে নামে রক্ত-সন্ধ্যা। মনে হয় আজই পৃথিবীর অন্তিম দিবস। আগুনের ধিকি ধিকি আলোতে যেন প্রেতমূর্তির মতো মনে হয় সৈনিকদের।

উত্তপ্ত পাথর থেকে তাপ বেরুচ্ছে। খুদাবক্সকে দেখে মনে হয় সে যেন নেশা করেছে। মাতাল হয়ে উঠেছে কোন সর্বনাশা আনন্দের সুরা পান করে। গোলা ছুঁড়ে সে মোতির দিকে চেয়ে হাসে। বলে—বলো মোতি, এর চেয়েও কি ভালো সময় মিলতো?

—না।

—মনে করে নাও মোতি আখেরী দিনে এই আমাদের শাদী।

—হাঁ খুদাবক্স……জরুর!

অদ্ভুত নৈপুণ্যে লড়ে খুদাবক্স। বলিষ্ঠ হাত দু'খানা ফুলে ফুলে ওঠে কামান চালাতে গিয়ে। মোতি খুদাবক্সের নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তখন অত দেখারও সময় নেই তার। ত্রস্ত হাতে সে গোলা তুলে দেয়, আর বারুদ পাউডার তোলে কাঠের চামচ দিয়ে।

হঠাৎ ভীমনিনাদে সঁইয়ার গেটের খানিকটা প্রাচীর ধ্বসিয়ে যে গোলাটা এসে ফেটে পড়ে, তার গর্জনে ডুবে যায় খুদাবক্সের কণ্ঠ—মোতি! মোতি! মোতি

ধোঁয়া সরে যেতে মোতি দেখে সিঁড়িতে বসে পড়েছে খুদাবক্স। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার দেহ। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে খুদাবক্স বলে—চালিয়ে যাও মোতি, বন্ধ করো না।

অধর দংশন করে মোতি, পলতেয় আগুন দেয়। গর্জন করে কামান। ধোঁয়া আর মৃত্যু-কলরোলের ভেতর থেকে কে ছুটে আসে—পাশে বসে পড়ে বলে—খুদাবক্স! দোস্ত!

—বাহ্‌রাম!

—খুদাবক্স!

কামান ছেড়ে আসতে পারে না মোতি। অধীর উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করে—কোথায় লেগেছে খুদাবক্স, কোথায়?

যন্ত্রণায় পাংশু হয়ে গিয়েছে গৌর মুখ। নীল শিরাগুলো ফুটে উঠেছে কপালে। দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে নীল চোখ দুটো। খুদাবক্স বলে—ডান হাতে।

রক্তাক্ত ও ছিন্নভিন্ন ডান হাতখানা ঝুলছে। বাঁ হাতখানা কামড়ে খুদাবক্স একটা আর্তনাদ চাপবার চেষ্টা করে। অমানুষিক প্রচেষ্টায় উঠে দাঁড়ায় বাহ্‌রামকে ধরে। বলে—এ-ও শেষ চোট্‌ নয়—ফির লড়েঙ্গে।

মোতির হাত থেকে মশাল নেয় খুদাবক্স। বাঁ হাতে পলতেটায় আগুন দেয়—গর্জে ওঠে কামান। কামানের ওপর ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে খুদাবক্সের রক্ত।

বাহ্‌রাম বলে—আমি যাবো আর আসবো মোতি, কাউকে নিয়ে আসি। একলা কেমন করে ওকে কেল্লায় নিয়ে যাবো বলো? তুমি এখানে থাকতে পারবে তো?

—পারবো। যেন মোতির গলার স্বর ফোটে না। তবু নিপুণ হাতে আবার কামান চালাতে থাকে। সিঁড়িতে বসে পড়ে মাথাটা কামানের চাকার ওপর হেলিয়ে রাখে খুদাবক্স। অধর দংশন করে। ঠোঁটে ফুটে ওঠে রক্ত। অনেক কষ্টে হাসতে চেষ্টা করে। বলে—মোতি, ভুল্‌না মৎ!

—কভী নহীঁ।

মোতির কামানের জবাবে ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ মরীয়া হয়ে কামান দাগে। পরাজিত হচ্ছে অবরুদ্ধ নগরীর সংগ্রামী সৈনিকরা।

কেল্লার জলের আধার আজ দ্বিপ্রহরে উড়িয়ে দিয়েছে স্ট্রাট। এখনো কি এই ধৃষ্টতা সহ্য হয়? তাদের গোলা এসে ফেটে পড়ে পুনর্বার। ধোঁয়ায় ভরে যায় চারিদিক। খুদাবক্সের মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। জড়ানো গলায় বলে—জবাব দাও মোতি, লড়াই চালিয়ে যাও। অর্জুন!

কামানটাকেই সম্বোধন করে সে। বলে—অর্জুন, বোল্‌তি কিউঁ নহী? জবাব দে অর্জুন, জবাব দে।

পরন্তপকে সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে বাহ্‌রাম। তাদের দেখে খুদাবক্স কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

পরন্তপ তাকে কথা বলতে নিষেধ করে। তারপর অসীম মমতা ও বেদনার সঙ্গে বলে—খুদাবক্স—ভাই! এমন তো কথা ছিল না···

সযত্নে তুলে ধরে খুদাবক্সকে। যন্ত্রণায় আর্ত কণ্ঠ খুদাবক্সের। বলে—লড়তে রহো···

তারপর ধরাধরি করে খুদাবক্সকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বলিষ্ঠ হাতে জড়িয়ে ধরে পরন্তপ। ঝুঁকে পড়ে খুদাবক্সের মাথা। পাশের ঘোড়ায় বসে মোতি তার বাঁ হাতখানা ধরে। কথা কইতে তার বুক ভেঙে যায়। তবু বলে—খুদাবক্স!

—মোতি!

ঘোড়ার কদমে কদমে ঝাঁকুনি লাগে খুদাবক্সের। কথা বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে আসে। তবু নেশাচ্ছন্নের মতো বলে—মোতি—!

ব্যথার কথা বলে না খুদাবক্স—ভালোবাসার কথা বলে না—শুধু বলে—মোতি! বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরে যায় মোতির। মনে হয় তার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন লোহার আঙুল দিয়ে বজ্রমুঠিতে চেপে ধরেছে—কাঁদতে দেবে না তাকে। পরন্তপের আঙুল ছাপিয়ে খুদাবক্সের রক্ত ঝরে ঝরে খুদাবক্সেরই কোল ভিজে যায়। বাহ্‌রামের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে। তবু ব্যর্থ চেষ্টা করে খুদাবক্সের রক্ত বন্ধ করতে!

কেল্লায় তখন চূড়ান্ত কোলাহল ও বিভ্রান্তি। মশাল নাচিয়ে সিপাহীরা ছুটোছুটি করছে—কামানের শব্দে কাঁপছে পাষাণ কক্ষগুলো। সামনের কুঠরিটাতে খুদাবক্সকে এনে শুইয়ে দেয়

পরন্তপ ও বাহ্‌রাম। জল্ চাই, পাখা চাই···রক্ত বন্ধ করতে হবে···ছুটে চলে যায় বাহ্‌রাম।

রক্ত পড়ে পড়ে মাটি ভিজে গিয়েছে। যতবার মোছে মোতি, ততবারই ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠে। চট্‌চটে আঠার মতো জমাট বাঁধে পাথরের ওপর—এত রক্ত কোনখানে ছিল? মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মোতি। ডাকে—খুদাবক্স!

মরদেহের চেতনার শেষ প্রান্তে সেই আহ্বান বুঝি আর পৌঁছোতে পারে না। যন্ত্রণার আর কোন অনুভূতিও আসে না খুঁদাবক্সের চেতনায়। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে তার চেতনায় উদ্ভাসিত হয় এক মহা-অনুভূতি। এই তবে মৃত্যু?

সহসা তার মনে হয় তার পিতার কণ্ঠ···বদ্‌লা নিস্ বেটা, ভুল্‌না মৎ!

না সে ভোলেনি। প্রাণপণে লড়েছে। বদলা নিয়েছে তার পিতার হয়ে···তার সাধ্যমতো সে লড়েছে, এখন তার ছুটি।

···খুদাবক্স! কার কণ্ঠ তাকে বহুদূর থেকে ডাকছে? লড়াই পুরা না হতেই তার ছুটি মিলে গেল, এখন লড়বে অন্য মানুষ। তবে কেন তাকেই আবার ডাকছে? কে ডাকছে?

মোতি! বিদ্যুতের কশাঘাতে ফিরে এল চেতনা। বহু কষ্টে চোখ খুললো খুদাবক্স। মোতি কি তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়েছে? তাকেই কি দেখছে সে? দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসছে, আলো নিভে আসছে চারিপাশে—তবু মোতিকেই দেখতে লাগল খুদাবক্স। নিমীলিত চোখ অতিকষ্টে মেলে ধরে মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলে খুদাবক্স। কম্পিত বাঁ হাতখানা বাতাস ছুঁয়ে ফিরে এল। শোনা যায় না এমনই নিচুগলায় বললো—মোতি···পুরা হো গিয়া। সব পূর্ণ হয়ে গেল। মোতির আহ্বানেই আবার সাড়া দিলো খুদাবক্স, মোতিকে দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে গেল চেতনা। সমস্ত সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে গেল মোতি, আর এবারকার মতো পূর্ণ হয়ে গেল সব।

মোতি উঠে দাঁড়ালো। শেষ হয়ে গেল সব। আরো কিছু রইল কি? মাথার ভেতরটা অসম্ভব হাল্কা লাগছে তার। মনে হচ্ছে